
RIZON
মাসুদ রানা
শান্তিদূত ২
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা
প্রকাশনী
ANIK

সেবা প্রকাশনী

এক নজরে মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় * ভারত-নাট্যম * স্বর্ণমৃগ * দুঃসাহসিক
মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা * দুর্গম দুর্গ * শত্রু ভয়ঙ্কর * সাগর-সঙ্গম-১,২
রানা ! সাবধান ! ! * বিস্মরণ * রত্নদ্বীপ * নীল আতঙ্ক-১, ২
কায়রো * মৃত্যুপ্রহর * গুপ্তচক্র * মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র
রাত্রি অন্ধকার * জাল * অটল সিংহাসন * মৃত্যুর ঠিকানা
ক্ষ্যাপা নর্তক * শয়তানের দুত * এখনো ষড়যন্ত্র * প্রমাণ কই ?
বিপদজনক-১, ২ * রক্তের রঙ-১, ২ * অদৃশ্য শত্রু * পিশাচ দ্বীপ
বিদেশী গুপ্তচর-১, ২ * ব্ল্যাক স্পাইডার-১, ২ * গুপ্তহত্যা
তিনশত্রু * অকস্মাৎ সীমান্ত-১,২ * সতর্ক শয়তান * নীলছবি-১,২
প্রবেশ নিষেধ-১, ২ * পাগল বৈজ্ঞানিক * এসপিওনাজ-১, ২
লাল পাহাড় * হৃৎকম্পন * প্রতিহিংসা-১, ২ * হংকং সম্রাট-১,২
কুউউ ! * বিদায় রানা-১, ২, ৩ * প্রতিদ্বন্দ্বী-১, ২ * আক্রমণ-১,২
গ্রাস-১, ২ * স্বর্ণতরী-১, ২ * পপি * জিপসী-১, ২
আমিই রানা-১, ২ * সেই উ-সেন-১, ২ * হ্যালো, সোহানা-১,২
হাইজ্যাক-১, ২ * আই লাভ ইউ, ম্যান-১,২,৩ * সাগর কন্যা-১,২
পালাবে কোথায়-১,২ * টার্গেট নাইন-১,২ * বিষ নিঃশ্বাস-১,২
প্রেতাত্মা-১, ২ * বন্দী গগল * জিম্মি * তুষার যাত্রা-১, ২
স্বর্ণ-সংকট-১, ২ * সন্ন্যাসিনী * পাশের কামরা
নিরাপদ কারাগার-১, ২ * স্বর্গরাজ্য-১, ২ * উদ্ধার-১, ২
হামলা-১, ২ * প্রতিশোধ-১, ২ * মেজর রাহাত-১, ২
লেনিনগ্রাদ-১, ২ * অ্যামবুশ-১, ২ * আরেক বারমুডা-১,২
বেনামী বন্দর-১, ২ * নকল রানা-১, ২ * রিপোর্টার-১,২
মরুযাত্রা-১, ২ * বন্ধু * সংকেত-১, ২, ৩ * স্পর্ধা-১,২
চ্যালেঞ্জ * শত্রুপক্ষ * চারিদিকে শত্রু-১, ২ * অগ্নিপুরুষ-১,২
অন্ধকারে চিতা-১, ২ * মরণকামড়-১, ২ * মরণখেলা-১, ২
অপহরণ-১, ২ * আবার সেই দুঃস্বপ্ন-১, ২ * বিপর্যয়-১, ২

সেবা প্রকাশনী

শান্তিদূত-২

দুইখণ্ডে সমাপ্ত সম্পূর্ণ রোমাঞ্চ-উপন্যাস

সিরিজের অন্যান্য বই পড়া না থাকলেও বুঝতে পারবেন

কাজী আনোয়ার হোসেন

রানা-১৫০

প্রকাশক :

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী, ১৯৮৮

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : শরাফত খান

মুদ্রণে :

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেগুনবাগান প্রেস

২৪/৪ সেগুন বাগিচা,

ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা :

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

দুরালাপন ৪০৫৩৩২

জি. পি. ও. বক্স নং-৮৫০

শো-রুম :

সেবা প্রকাশনী

৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

SHANTIDOOT-2

By : Qazi Anwar Husain

Masud Rana-150

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউণ্টার ইণ্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে-কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ চির-নবীন যুবকটির সাথে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য প্রতীকী জগতে।
আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক জীবিত বা মৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই।

।। লেখক ।।

পূর্বাভাষ

ছোট্ট একটা ভুল থেকে ঘটনার সূত্রপাত, অনেকটা কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ার মতো। মস্কো পুলিশ গোপনসূত্রে খবর পেলো, গোর্কি স্ট্রীটের একটা বাড়িতে সন্দেহজনক এক লোক বাস করে, লোকটা নাকি ব্ল্যাকমার্কেট অপারেশনের সাথে জড়িত। একজন টেকনিশিয়ানকে পাঠানো হলো লোকটার টেলিফোনে আড়িপাতা যন্ত্র ফিট করার জন্যে। টেকনিশিয়ান যন্ত্র ফিট করলো ঠিকই, কিন্তু পাশের বিল্ডিঙের অন্য এক লাইনে। প্রথম এক হপ্তা কিছুই শোনা গেল না, তারপর একদিন পরপর দু'বার অদ্ভুত কিছু কথাবার্তা শোনা গেল। দু'বারই 'দাগী আসামী' নামটা উচ্চারণ করা হলো। পরের হপ্তার গোড়ার দিকে আরো কিছু কথা শোনা গেল, বেশির-ভাগই দুর্বোধ্য। পুলিশ কর্মকর্তারা বুঝলেন, সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করা হচ্ছে। সময় নষ্ট না করে গোটা ব্যাপারটা কে. জি. বি. সদর দফতরকে জানালেন তাঁরা।

জোসেফ স্ট্যালিনের যুগ অনেক আগেই গত হয়েছে। রাশিয়ার পরবর্তী নেতৃবৃন্দ তাঁকে ভ্রান্ত, নিষ্ঠুর, ক্ষমতালিপ্সু ইত্যাদি বলে নিন্দা করেছেন। শুধু তাই নয়, স্ট্যালিনপন্থী বা স্ট্যালিনের ভক্ত বলে পরিচিত যারা প্রশাসন, ইন্টেলিজেন্স, এবং সেনাবাহিনীতে

ছিলো তাদের সবাইকে সরিয়ে দেয়া হয়। স্ট্যালিনের দোসর ছিলো, এই অভিযোগে অনেক অফিসারকে সাজাও দেয়া হয়। কিন্তু তারপরও স্ট্যালিনপন্থীদের অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব হয়নি। গত কয়েক যুগ ধরে মাঝে মধ্যেই তারা বিদ্রোহ করার চেষ্টা করেছে, ফিরে পেতে চেয়েছে আগের সম্মানজনক পদ, কখনো বা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে দখল করতে চেয়েছে ক্ষমতা। কিন্তু প্রতিবারই তাদের বিদ্রোহ ব্যর্থ করে দেয়া হয়েছে। একটা করে বিদ্রোহ হয়, সেই সাথে কিছু স্ট্যালিনপন্থীর পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ে, এভাবে তাদের সংখ্যা দিনে দিনে কমতে থাকে। সংখ্যায় কম হলেও, এখনো তারা সবখানে আছে, আরেকটা বিদ্রোহ না হলে তাদের সনাক্ত করা প্রায় অসম্ভব। তবে কিছু কিছু লোককে স্ট্যালিনপন্থী বলে সন্দেহ করা হয়। তাদের মধ্যে একজন হলেন রেড আর্মি-র মার্শাল লিউ ওনায়েভ। রেড আর্মিতে তাঁর অসামান্য প্রভাব রয়েছে। স্ট্যালিনপন্থী বলে সন্দেহ করা হলেও, আজ পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ যোগাড় করা সম্ভব হয়নি। রেড আর্মির কিছু অফিসার তাঁর আড়ালে তাঁকে 'দাগী আসামী' বলে সম্বোধন করে থাকেন।

ব্যাপারটাকে খুব গুরুত্বের সাথে নিলো কে. জি. বি.। গোর্কি স্ট্রীটের টেলিফোন মালিক দিমিত্রি ট্রুশেনকো-কে গ্রেফতার করার জন্যে বাড়িটাকে ঘেরাও করা হলো। গ্রেফতার এড়াবার জন্যে কে. জি. বি. এজেন্টদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লো ট্রুশেনকো। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে মারা গেল একজন কর-পোরাল। গ্রেফতার হবার আগে সুইসাইড ক্যাপসুল খেয়ে আত্ম-হত্যার চেষ্টা করলো ট্রুশেনকো, কিন্তু তার সে চেষ্টা ব্যর্থ হলো।

তল্লাশী চালিয়ে তার কামরা থেকে পাওয়া গেল ছাব্বিশ হাজার রাউণ্ড অ্যামুনিশন, আঠারো বাক্স গ্রেনেড আর এক্সপ্লোসিভ, তিনজোড়া বাজুকা, আঠারোটা অটোমেটিক রাইফেল, নয়টা লেটেস্ট মডেল রেড আর্মি নাইপার রাইফেল—নাইট স্কোপ সহ।

কে. জি. বি.-র ডেপুটি ডিরেক্টর কর্নেল আনাতোলি বিকারেন ট্রুশেনকোকে নির্যাতন এড়িয়ে যাবার একটা সুযোগ দিলেন, কিন্তু মুখ খুলতে রাজি হলো না ট্রুশেনকো। অগত্যা ইন্টারোগেশন টিমের হাতে তুলে দেয়া হলো তাকে। একই সময় ট্রুশেনকোর পরিচয় পত্র সহ অন্যান্য কাগজ পাঠিয়ে দেয়া হলো ডকুমেন্টস এক্সপার্ট নিকোলাই ডালচিমস্কি-র কাছে, ওগুলো জাল কিনা পরীক্ষা করে দেখবে সে।

নিকোলাই ডালচিমস্কি আক্ষরিক অর্থেই একটা বদ চরিত্র। তার শরীরের কাঠামো চৌকো একটা দরজার মতো, ছয় ফিট লম্বা। ক্লেদাক্ত, নোংরা পারিবারিক পরিবেশে বাল্য এবং কৈশোর কেটেছে তার। বাপের দেখাদেখি সেই ছোটোবেলা থেকেই মেয়েদের ওপর নির্যাতন চালাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে সে। জ্ঞান হবার পর উপলব্ধি করে, তার ভেতর মানবিক গুণাবলী খুব কমই আছে, তাকে নিয়ন্ত্রণ করছে হিংস্র পশুশক্তি। সজ্ঞানে মূর্তিমান শয়তান হয়ে ওঠে ডালচিমস্কি। মেয়েরা তার শরীর আর চেহারা দেখে আকৃষ্ট হয়, নোংরা যৌন-বিকৃতি চরিতার্থের জন্যে তাদের ব্যবহার করে সে।

দিমিত্রি ট্রুশেনকোর কাগজ-পত্র পরীক্ষা করার দরকার ছিলো না, ডালচিমস্কি আগে থেকেই জানতো, ওগুলো সব জাল। স্ট্যালিনপন্থীরা সত্যি সত্যি একটা বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিচ্ছিলো, তাতে ডালচিমস্কিরও একটা ভূমিকা ছিলো। ট্রুশেনকো ধরা পড়ায়

সে বুঝতে পারে, তারও সুদিন ফুরিয়েছে। প্রাণে বাঁচতে হলে রাশিয়া ছেড়ে পালাতে হবে। আর গেলে মুক্তবিশ্বের স্বর্গ, অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই যেতে হয়। কিন্তু খালি হাতে যায় কি করে!

গুরুত্বপূর্ণ দুটো জিনিস সাথে করে নিয়ে গেল ডালচিমস্কি। ব্রাসেলস এ কে. জি. বি.-র একটা ব্যাংক আছে, ব্যাংকের সিকিউরিটি সিস্টেমের নকশা চুরি করলো সে। আর যেটা নিলো, সেটার সাহায্যে যে-কোনো লোক তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ বাধিয়ে দেয়ার ক্ষমতা রাখে। জিনিসটা তেমন কিছু নয়, ছোট্ট একটা নোটবুক। মাত্র কয়েক ব্যক্তি এই নোটবুকের কথা জানেন—রেড আর্মি-র চীফ অভ স্টাফ, প্রিমিয়ার, কে. জি. বি. ডিরেক্টর, কে. জি. বি. ডেপুটি ডিরেক্টর, মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স (গ্রু) চীফ এবং আরো দু'একজন। তাঁরা ওটাকে টেলি-বম বুক হিসেবে চেনেন।

দিমিত্রি ট্রুশেনকো একানব্বই ঘণ্টা নির্যাতন সহ্য করার পর মুখ খুললো। কর্নেল বিকারেন যেমন সন্দেহ করেছিলেন, স্ট্যালিনপন্থী-দের বড়সড় একটা সুশৃংখল দল ষড়যন্ত্র করেছিল। চারশোরও বেশি সরকারী এবং সশস্ত্রবাহিনীর লোক জড়িত। তাদের মধ্যে আবার অর্ধেকের কিছু কম কে. জি. বি.-র লোক—কেউ কেউ এই মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে বিদেশে রয়েছে। কিন্তু বন্দী ট্রুশেনকো সবার নাম জানে না। মাত্র তেরো জনের নাম বলেছে সে।

এই তেরো জনের মধ্যে নিকোলাই ডালচিমস্কির নামও রয়েছে। রয়েছে মার্শাল ওনায়েভের নাম। তেরো জনের একজন বাদে সবাই-কে পরবর্তী পাঁচ দিনের মধ্যে গ্রেফতার করা হলো, তাদের মধ্যে নেই শুধু নিকোলাই ডালচিমস্কি।

এরপর মাসখানেক গোটা সোভিয়েত রাশিয়া জুড়ে ব্যাপক ধর-

পাকড় চললো। শুধু দেশের মাটিতেই গ্রেফতার করা হলো তিনশো বিয়াল্লিশজনকে। নয় জন ধরা দিলো না, আত্মহত্যা করে হাত ফস্কে গেল। বিদেশ থেকে আটক করে দেশে পাঠানো হলো আঠারো জনকে, বাষট্টিজন নিখোঁজ থাকলো। এতো বড় সাফল্য সত্ত্বেও কে. জি. বি. কর্মকর্তারা খুশি হতে পারলেন না। খুশি অবশ্য না হবারই কথা তাঁদের। মুখে না বললেও, মনে মনে তাঁরা সবাই জানেন, কে. জি. বি. প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে।

গোপনে বিচার হলো অপরাধীদের। দোষ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করলো সবাই। বলাই বাহুল্য, একজনকেও ক্ষমা করা হলো না। জেরার মুখে এরাই স্বীকার করেছে, শতাধিক সিনিয়র সরকারী অফিসার, প্রিমিয়ার, এবং জেনারেল সেক্রেটারী, সেই সাথে নয় জন পলিটব্যুরো সদস্যকে খুন করার প্ল্যান করেছিল তারা।

মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করা হলো নিপুণ কৌশলে। এখানে বুদ্ধি, কল্পনাশক্তি, এবং দক্ষতার পরিচয় দিলেন কর্নেল বিকারেন। অফিশিয়াল গেজেটে প্রকাশ না পেলেও, সোভিয়েত ইউনিয়নের সবচেয়ে মূল্যবান খেতাবে ভূষিত করা হলো তাঁকে। পিঠ চাপড়ে দিয়ে জেনারেল কায়কোভস্কি, কে. জি. বি. ডিরেক্টর, তাঁর স্নেহভাজন ডেপুটিকে বললেন, 'ভাগ্যিস এ-ধরনের একটা ষড়যন্ত্র হয়েছিল! আমার পদটা পেতে তোমার সামনে আর কোনো বাধা থাকলো না।'

কিন্তু সদাহাস্যময় কর্নেলের চেহারা থেকে হাসি যেন চির বিদায় নিয়েছে। বিষণ্ণ চোখ তুলে তিনি শুধু বললেন, 'আমি যে কতোখানি ব্যর্থ, আপনার চেয়ে ভালো কেউ তা জানে না। কে. জি. বি.-র কাকে আমি বিশ্বাস করবো বলতে পারেন? কি করে জানবো কে

বেঈমান নয় ?'

ডেপুটিকে আলিঙ্গন করে জেনারেল কায়কোভস্কি বললেন, 'হ্যাঁ, কে. জি. বি.-কে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে আমাদের। অবসর নেয়ার আগে যতোটুকু পারি তোমাকে আমি সাহায্য করবো।'

মার্শাল ওনায়েভ সহ ষড়যন্ত্রকারীদের আরো এগারোজন সিনিয়র সদস্য নৌ-বাহিনীর একটা গানবোট বিস্ফোরণে কৃষ্ণ সাগরে মারা গেলেন। বাকিরা কেউ মারা গেল সড়ক দুর্ঘটনায় বা অগ্নিকাণ্ডে, কেউ হার্ট অ্যাটাকে। সবচেয়ে বেশি লোক মারা গেল ট্রেন দুর্ঘটনায়, ভেড়শোর মতো। দুর্ঘটনাগুলো রাশিয়ার বিভিন্ন জায়গায় ঘটলো, প্রচুর সময়ের ব্যবধানে, এবং সবগুলোর খবর সংবাদপত্রে প্রকাশও পেলো না।

কিন্তু মার্কিন সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিতে একটা আলোড়ন উঠলো। সি. আই. এ.-র একজন অ্যানালিস্ট. স্বর্ণকেশী এক মহিলা, কমপিউটর সায়েন্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছিলো, তার চোখে ব্যাপারটা ধরা পড়ে গেল। গত মাসে রাশিয়ার মৃত্যু হার এতো বেশি কেন, এই প্রশ্ন বিচলিত করে তুললো তাকে। তার নাম চারিটি উডস্টক, পাঁচ ফিট লম্বা, একহারা, সারা মুখে খয়েরি তিল। বিষয়টা নিয়ে রীতিমতো গবেষণা শুরু করে দিলো সে। এবং রিপোর্ট-টা তার বস কর্নেল জিল ক্যাসেলকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলো সি. আই. এ.-র সোভিয়েত অ্যাফেয়ার্স কমিটিতে।

এই সময় কে. জি. বি. সদর দফতরে খবর এলো, তাদের ব্রাসেলস ব্যাংকে ডাকাতি হয়েছে। কে বা কারা যেন ব্যাংকের ভেতর রাতের বেলা ঢুকে পড়ে, দু'জন গার্ডকে গুলি করে মারে, অ্যালার্ম সিস্টেম অকেজো করে দেয়, তারপর ডাকাতি করে নিয়ে

যায় তিন লাখ নিরানব্বই হাজার ডলার। আরো বড় অংকের ফ্রাঙ্ক, মার্ক, পাউণ্ড ছিলো, কিন্তু সে-সবে হাত দেয়া হয়নি।

কেন?

ব্যাপারটা নিয়ে জেনারেল কায়কোভস্কি তাঁর ডেপুটির সাথে আলাপ করার সুযোগ পেলেন না, কারণ কর্নেল বিকারেন তখন স্ট্যালিনপন্থী অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করার জন্যে কৃষ্ণ সাগরে রয়েছেন। পয়লা জুনের আগে তিনি ফিরবেন না।

পয়লা জুনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এলিস থেলার নামে এক লোক উন্মাদ হয়ে গেল। থেলার অটো রিপেয়ার কোম্পানী তার নিজের হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান। লোকটা নিরীহ, ভদ্র, ধার্মিক। নিয়মিত ট্যাক্স দেয়। গরীব মানুষদের সাহায্য করে। পাড়া-প্রতিবেশীরা সবাই তার প্রশংসায় পঞ্চ মুখ। সেই এলিস থেলার সেদিন কাঁটায় কাঁটায় দুটো পঁচিশ মিনিটে একটা ফোন কল পেলো, রিসিভার নামিয়ে রেখে কেমন যেনঘোলা চোখে চারদিকে একবার তাকালো, তারপর পুরনো একটা গ্যারেজ থেকে নীল ডজ প্যানেল-ট্রাক বের করে বেরিয়ে পড়লো—কোথায় যাচ্ছে মেকানিকদের কাউকে কিছু বললো না। এই ট্রাকটা অনেক দিন থেকে ছিলো গ্যারেজে, কাউকে ছুঁতে দিতো না থেলার, চাবিটা সব সময় নিজের কাছে রাখতো।

শহর থেকে ত্রিশ মাইল দূরে ইউ. এস. আর্মি কেমিক্যাল বেস, সরাসরি সেখানে চলে যায় থেলার। গেটে তাকে বাধা দেয়া হয়, পকেট থেকে সেভেন-মিলিমিটার পিস্তল বের করে সরাসরি সেন্ট্রির মাথায় গুলি করে সে। কয়েক সেকেণ্ড পর আরো দু'জন গার্ডকে খুন করে থেলার। এরপর সোজা রাস্তা ধরে দেড় মাইল ট্রাক চালিয়ে চলে আসে বিল্ডিং এম পর্যন্ত। চলন্ত গাড়ি থেকে লাফ

দিয়ে নামে সে। গাড়িটা সবেগে গিয়ে ধাক্কা খায় জানালাবিহীন ওয়্যারহাউসে। পরমুহূর্তে যে বিস্ফোরণ ঘটে তা থেকে আন্দাজ করা চলে ট্রাকটায় হাই এক্সপ্লোসিভ ঠাসা ছিলো। পালাতে চেষ্টা করে থেলার, কিন্তু শেষ মুহূর্তে মিলিটারী পুলিশ তাকে গুলি করে মেরে ফেলে। এম বিল্ডিং মাত্র তিন হপ্তা আগে পর্যন্ত ব্যাকটেরিয়াল এজেন্টের ডিপো ছিলো, কিন্তু সে-প্রসঙ্গে কেমিক্যাল করপোরেশনের প্রেস রিলিজে একটা শব্দও উচ্চারণ করা হলো না।

খবরটা পৌঁছে গেল মস্কোয়।

বিশ তারিখে আরো একটা ঘটনা ঘটলো। এ-ও আমেরিকায়। লিজা'স বুদের মালিক, লিজা আইভারসন, চল্লিশোর্ধ্ব এক মহিলা, হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে গেল। সে-ও একটা টেলিফোন কল পাবার পরপরই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। সোজা ব্যাংকে আসে মহিলা, সেফটি-ডিপোজিট বক্স থেকে একটা প্যাকেট বের করে। নিউ ইয়র্কে আসার পর থেকে ডিপোজিট বক্সটা ভাড়া নেয়া ছিলো তার, বারো বছর ধরে। এগারোটা পঞ্চাশ মিনিটে ব্যাংক থেকে বেরিয়ে যায় লিজা আইভারসন। তারপর তাকে আর কোথাও দেখা যায়নি।

সেদিনই ওই এলাকায় জেট ফাইটার বেসে আগুন লাগে। ফলে বেসের প্রায় সবটুকু ফুয়েল পুড়ে যায়। ভাগ্য ভালো বলতে হবে যে উত্তর-পুব আমেরিকার ওপর শত্রু বিমান হানা দেয়ার কোনো হুমকি সেদিন বা পরবর্তী তিন দিন ছিলো না। চার চারটে দিন আমেরিকার বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় সাময়িক একটা ফুটো তৈরি হয়েছিল—মহামূল্যবান ছাতায় সাময়িক ছোট্ট একটা ফুটো—তারপর চব্বিশ তারিখ বিকেলে ফুয়েল ট্রাক পৌঁছে গেলে সমস্ত উদ্বেগের অবসান ঘটে। জেট ফাইটার বেস থেকে খুব বেশি দূরে

নয়, সরু একটা গলিতে পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গেল লিজা আইভারসনের গাড়িটা। কিন্তু আগুন লাগার সাথে লিজা আইভারসনের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাটা কেউই এক করে দেখলো না।

স্যাবোটাজের তৃতীয় ঘটনাটা ঘটলো অগাস্টা থেকে কমবেশি দু'হাজার মাইল দূরে, লাক দু ফ্ল্যামবিউ-এ। সেই আমেরিকাতেই।

মস্কো থেকে নিকোলাই ডালচিমস্কি নিখোঁজ হবার পর ডকুমেণ্ট 'অডিট' করার নির্দেশ দিয়েছিলেন কর্নেল বিকারেন। সর্বশেষ আইটেমগুলোর সর্বশেষ তালিকা চেক করা হয়েছে। না, সব ডকুমেণ্ট পাওয়া যায়নি। ভল্টে বেশ ক'টা ডকুমেণ্ট নেই। তার মধ্যে একটা হলো টেলি-বম বুক।

আঁতকে উঠলেন কে. জি. বি. কর্মকর্তারা। আমেরিকায় স্যাবোটাজের যে ঘটনাগুলো ঘটছে তার তাৎপর্য পরিষ্কার হয়ে গেল। ডালচিমস্কি কি করতে চাইছে বুঝতে পেরে স্তম্ভিত বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়লেন তাঁরা। বুঝতে পারলেন, ডালচিমস্কি এখন দুনিয়ার সবচেয়ে বিপজ্জনক মানুষ। ইচ্ছে করলেই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়ে দিতে পারে সে।

কে. জি. বি. প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে এটা উপলব্ধি করেই বাংলাদেশ কাউণ্টার ইণ্টেলিজেন্স চীফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের সাথে প্রাথমিক আলাপটা সেরে রেখেছিলেন মেজর জেনারেল কায়কোভস্কি। বলেছিলেন, বি. সি. আই.-এর অন্যতম এজেণ্ট মাসুদ রানার সাহায্য তাদের দরকার হতে পারে। তবে বন্ধু কায়কোভস্কিকে রাহাত খান কোনো প্রতিশ্রুতি দেননি।

টেলি-বম বুক নিয়ে ডালচিমস্কি আমেরিকায় পালিয়ে গেছে, এবং একের পর এক মার্কিন সামরিক স্থাপনাগুলো ধ্বংস করে দিচ্ছে,

এটা পরিষ্কার হয়ে যাবার পর রাহাত খানের সাথে আবার যোগাযোগ করলেন জেনারেল কায়কোভস্কি। জানালেন, মাসুদ রানার সাহায্য সত্যি তাঁদের দরকার। কিন্তু রাহাত খান এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলেন। তখন জেনারেল কায়কোভস্কি রেগে গিয়ে এমন কিছু কথা বললেন, রাহাত খানের আর এড়িয়ে যাবার উপায় থাকলো না। কে. জি. বি. চীফ বললেন, 'ক'দিন আগে কে. জি. বি.-র মতো একই বিপদে পড়েছিল ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস, অনুরোধ পাবার সাথে সাথে তাদের তোমরা সাহায্য করেছো। আপদে-বিপদে সি. আই. এ.-কেও তোমরা সাহায্য করো। যতো ওজর-আপত্তি শুধু কে. জি. বি.-র বেলায়?' তারপর তিনি আবেগের সাথে জানতে চাইলেন, 'একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে কে তোমাদের সাহায্য করেছিল?'

রাহাত খানকে রাজি করাতে পারলেও জেনারেল কায়কোভস্কির সামনে আরো তুটো বাধা ছিলো। তিনি জানতেন কে. জি. বি.-র পদস্থ অফিসাররা রানার সাহায্য নিতে রাজি হবে না। ওদেরকে কৌশলে রাজি করাতে হবে। সে-কাজটাও তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সারলেন। শেষ বাধাটা ছিলো মাসুদ রানা স্বয়ং। ও কি সাহায্য করতে রাজি হবে?

রাহাত খানের নির্দেশে মস্কো এসে পৌঁছুলো রানা। জেনারেল কায়কোভস্কি এবং কর্নেল বিকারেন, তু'জন মিলে সমস্যাটা ব্যাখ্যা করলেন।

কাজটায় হাত দেয়া হয় আজ থেকে চোদ্দ বছর আগে। ধারণাটা অবশ্য আরো অনেক পুরনো। তখন মনে হয়েছিল আমেরিকার সাথে রাশিয়ার একটা যুদ্ধ বোধহয় কেউ ঠেকাতে পারবে না। আমেরিকার অস্ত্রসজ্জা আর উস্কানিমূলক কথাবার্তা শুনে মনে হতো,

যে-কোনো দিন রাশিয়া আক্রান্ত হতে পারে। ঠিক এই পরিস্থিতিতে একটা স্যাবোটাজ টিম গঠনের বুদ্ধি আসে কর্নেল বিকারেনের মাথায়। এমন একটা স্যাবোটাজ টিম, সদস্য সংখ্যা একশো থেকে দেড়শোর বেশি হবে না, কিন্তু নির্দেশ পেলে তারা গোটা আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ সামরিক স্থাপনাগুলো রাতারাতি ধ্বংস করে দেয়ার ক্ষমতা রাখবে। অবশ্যই তারা ডীপ-কাভার এজেন্ট হবে, কিন্তু তাদের পরিচয় ফাঁস হবার কোনো সুযোগই থাকবে না। এমনকি তারা নিজেরাও জানবে না যে তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের ডীপ-কাভার এজেন্ট। সব শুনে পুলকিত হলেন জেনারেল কায়কোভস্কি। সাথে সাথে তিনি উপলব্ধি করলেন আইডিয়াটা শুধু চমকপ্রদ নয়, নিশ্ছিদ্রও বটে। এরপর মাসের পর মাস ধরে চললো প্রজেক্টের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ। মনোচিকিৎসক, হিপনোটিস্টদের সাথে পরামর্শ করা হলো। ট্রেনিং দেয়ার জন্যে বাছাই করা হলো চারশো লোককে।

চালাচালি করে তাদের মধ্যে থেকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হলো একশো ছত্রিশজনকে। এরা কেউ ইংরেজী জানতো না, জীবনে কখনো আমেরিকায় যায়নি। প্রথম পর্যায়ের ট্রেনিঙে এদেরকে শেখানো হয়েছিল আন-আর্মড কমব্যাট, জুডো, কারাতে, গেরিলা ফাইটিং, স্যাবোটাজ কৌশল, ইত্যাদি। দ্বিতীয় পর্যায়ে চূড়ান্ত ট্রেনিঙের আগে একশো ছত্রিশজনকে সম্মোহিত করা হলো। হিপনোসিসের সাহায্যে তাদের জীবনযাপন পদ্ধতি, আচার-আচরণ, স্বভাব-চরিত্র, ব্যক্তিত্ব, জাতীয়তা, পরিচয়, নাম-ঠিকানা, পেশা, সব বদলে দেয়া হলো। নিজেদের তারা সত্যি সত্যি আমেরিকান নাগরিক বলে বিশ্বাস করলো, সমস্ত দিক থেকে হয়েও উঠলো নির্ভেজাল আমেরিকান। সম্মোহিত অবস্থাতেই একটা সংকেত গেঁথে দেয়া

হলো তাদের মগজে, টেলিফোনে সেই সংকেত পেলে কি করতে হবে তা-ও সুপ্ত অবস্থায় থাকলো মনের ভেতর।

এরপর একে একে আমেরিকায় অনুপ্রবেশ করলো তারা। এক একজন এক একটা রাজ্যের বিশেষ একটা এলাকায় ঠাঁই করে নিলো, এবং যে যার এলাকা ছেড়ে অন্য কোথাও গেল না। ধীরে ধীরে এলাকার একজন হয়ে উঠলো সে, চাকরি নিলো বা ব্যবসা শুরু করলো, বিয়েও করলো কেউ কেউ। সম্মোহিত অবস্থায় প্রত্যেকে আলাদা আলাদা পেশাগত ট্রেনিং পেয়েছিল, ফলে যে যার পেশায় দ্রুত উন্নতি করলো তারা। অতিরিক্ত মদ্য পান, লাম্পট্য, নীচ আচরণ, লোভ, স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা, রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ, ইত্যাদির বিরুদ্ধে সাজেশন দেয়া হয়েছিল, ফলে মানুষ হিসেবে যে যার এলাকায় সুনাম অর্জন করলো সবাই।

যে যার ঠাঁইয়ে পৌঁছে যাবার এক বছর পর ঠিকানা আর টেলিফোন নম্বর জানিয়ে প্রত্যেকে তারা মেক্সিকো আর কানাডার নির্দিষ্ট এক জায়গায় একটা করে ভিউকার্ড পাঠালো। এরপর ওদের প্রত্যেকের নামে একটা করে প্যাকেট এলো ওখান থেকে। এক্সপ্লোসিভ আর ডিটোনেটর। কিভাবে কি করতে হয়, সবই জানা আছে তাদের।

ওদের নাম-ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর, সাংকেতিক বার্তা সহ মোট তিনটে খাতা তৈরি করা হলো। নাম দেয়া হলো টেলি-বম বুক। একটা ছিলো কে. জি. বি. সদর দফতরে, ডকুমেন্টস এক্সপার্ট নিকোলাই ডালচিমস্কির দায়িত্বে। আরেকটা আছে রেড আর্মি চীফ অভ স্টাফের প্রাইভেট সেফে, মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স অর্থাৎ গ্রু-র সশস্ত্র প্রহরীরা রাত দিন চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দেয় সেটাকে।

তৃতীয়টা আছে ওয়াশিংটনে, কে. জি. বি. রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত ব্রিফকেসে। ছোট্ট একটা বোতাম টিপে ব্রিফকেসটাকে যখন তখন পাউডার করে দেয়ার ব্যবস্থা ওটার ভেতরই রাখা হয়েছে।

একশো ছত্রিশ জন আদর্শ, নিখুঁত ডীপ-কাভার এজেন্ট সেই থেকে আজ চোদ্দ বছর ধরে জেগে জেগে ঘুমাচ্ছে আমেরিকায়। টেলিফোনে সাংকেতিক বার্তা না পেলে তাদের সম্মোহিত অবস্থা কাটবে না, তার আগে পর্যন্ত তারা মাটির মানুষ। কিন্তু সাংকেতিক বার্তা পাবার সাথে সাথে নিরীহ দর্শন মাটির মানুষগুলো হয়ে উঠবে আক্ষরিক অর্থেই একেকটা দানব। যন্ত্রের মতো বিশ্বস্ততার সাথে যে যার দায়িত্ব পালন করবে, প্রত্যেকে ধ্বংস করবে যুক্তরাষ্ট্রের একটা করে সামরিক স্থাপনা, কিংবা জনগুরুত্বপূর্ণ কোনো সেবা-মূলক প্রতিষ্ঠান। সেই সাংকেতিক বার্তাই পাঠাতে শুরু করেছে ম্যানিয়াক ডালচিমস্কি, হিউম্যান বোমাগুলো এক এক করে ফাটিয়ে দিচ্ছে সে।

পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে স্তম্ভিত হয়ে গেল রানা। রাশিয়ার সাথে আমেরিকার সম্পর্ক এখন আগের চেয়ে অনেক ভালো, দু'পক্ষের কেউই নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ চায় না। ঠিক এই পরিস্থিতিতে ডালচিমস্কি যদি একের পর এক টেলি-বোমাগুলো ফাটাতে থাকে, তাকে যদি থামানো না যায়, আমেরিকা ধরে নেবে রাশিয়া তাদের সাথে অঘোষিত যুদ্ধ শুরু করেছে। কাজেই পাল্টা আঘাত হানতে ইতস্তত করবে না তারা। আর রাশিয়া এবং আমেরিকার মধ্যে যুদ্ধ মানেই তো তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

শুধু যে বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি করলো রানা তাই নয়, অসহায়ও বোধ করলো। আমেরিকা বিরাট একটা দেশ, সেখানে কোথায়

ডালচিমস্কিকে খুঁজবে সে? এমনকি কানাডাতেও থাকতে পারে ডালচিমস্কি, কারণ কানাডা থেকেও সরাসরি আমেরিকায় টেলিফোন করা যায়। কিন্তু অসহায় বোধ করলেও, অনুরোধে ঢেঁকি গিলতে হলো রানাকে। মনে মনে জানলো, এই অ্যাসাইনমেণ্টে তার ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা ষোলোআনা। রানা চাইলো, কে. জি. বি. রেসিডেণ্টের সাথে বা কে. জি. বি. হেডকোয়ার্টারের সাথে কোনো যোগাযোগ রাখবে না সে, কে. জি. বি. হেডকোয়ার্টার শুধু মাঝেমধ্যে রেডিওর খবরের মাধ্যমে রানাকে পরামর্শ দিতে পারবে। তার শর্ত মেনে নিলেন ওঁরা। তবে রানাকেও ওদের একটা অনুরোধ রক্ষা করতে হলো। কে. জি. বি.-র একজন মেয়ে এজেণ্টকে সহকারিণী হিসেবে সাথে নিতে হবে। মেয়েটা আমেরিকান, খুবই সুন্দরী, নাম লিলিয়ান।

প্লেন, তারপর সাবমেরিনে চড়ে আমেরিকায় পৌঁছুলো রানা। সাগর সৈকতে ওকে অভ্যর্থনা জানালো লিলিয়ান। ওদিকে মার্কিন জলসীমার ভেতর বিদেশী একটা সাবমেরিন এসেছিল, সাবমেরিন থেকে কোড করা একটা মেসেজ প্রচার করা হয়েছে, এ-সব মার্কিন ইণ্টেলিজেন্স জেনে ফেললো। অপরদিকে স্যাবোটাজের যে-সব ঘটনা ঘটেছে সেগুলোর রহস্য ভেদ করার জন্যে একাধিক ইণ্টেলিজেন্স জোরেশোরে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে জানা গেছে এলিস থেলার আসল এলিস থেলার নয়। আসল এলিস থেলার চোদ্দ বছর আগে মারা গেছে।

এফ. বি. আই. এবং মার্কিন মিলিটারী ইণ্টেলিজেন্স তদন্ত চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর, কিন্তু সংশ্লিষ্ট মহল বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করলো, সি. আই. এ. তাদেরকে সাহায্য করছে না। সাপ্তাহিক

মিটিঙে এ-সব প্রসঙ্গে কথা উঠলেই দায়সারা গোছের জবাব দিয়ে পাশ কাটাবার চেষ্টা করে সি. আই. এ. প্রতিনিধিরা।

মস্কো থেকে মস্কোর কাজে আমেরিকায় পাঠানো হয়েছে রানাকে, আর সেই মস্কোতেই রানার অবর্তমানে বিচার হয়ে গেল ওর। রায় হলো, মৃত্যুদণ্ড।

অনেক দিন আগে রাশিয়া থেকে মিগ-একত্রিশ নিয়ে পালিয়ে এসেছিল রানা, সে-কথা মিলিটারী ইন্টেলিজেন্সের কিছু অফিসার আজও ভোলেনি। তাদের মধ্যে একজন হলেন গ্রু-র চীফ মেজর জেনারেল ইগর কুদরভ। তাঁর ধারণা, মিগ-একত্রিশ চুরি করে রাশিয়ানদের অপমান করেছিল রানা, তাকে ক্ষমা করা যায় না। রেড আর্মি চীফ অভ স্টাফের সাথে মিটিঙে বসে রানার মৃত্যুদণ্ড অনুমোদন করিয়ে নিলেন তিনি। ডালচিমস্কি এবং রানাকে একই দৃষ্টিতে দেখা হলো। রাশিয়া এবং বিশ্ব-শান্তির জন্যে দু'জনেই নাকি সমান বিপজ্জনক। সি. আই. এ.-তে গ্রু-র নিজস্ব চর আছে, তার নাম চ্যাপেল, সেই চ্যাপেলের কাছ থেকে একটা বার্তা পেয়েছেন মেজর জেনারেল কুদরভ। মেসেজে চ্যাপেল বলেছে, 'মাসুদ রানা আমেরিকানদের সাথে হাত মিলিয়েছে···।' এই মেসেজ দেখিয়েই রানার মৃত্যুদণ্ড অনুমোদন করিয়ে নিলেন তিনি। সেই মিটিঙে আরো সিদ্ধান্ত হলো, টেলি-বমগুলোকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে গ্রু-র চারটে টিমকে পাঠানো হবে। আমেরিকার সাথে যুদ্ধ এড়াতে হলে নিজেদের অর্থাৎ কে. জি. বি.-র একশো ছত্রিশজন ডীপ-কাভার এজেন্টকে হত্যা না করে উপায় নেই। আর মাসুদ রানাকে হত্যা করার জন্যে পাঠানো হবে তিনটে দলকে।

এ-সব কিছুই সময় মতো রানা জানতে পারলো না। লিলিকে

ওর ভালো লাগলো, কিন্তু তার ব্যাপারে সতর্ক থাকার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলো ও। আমেরিকায় পৌঁছুবার পর কয়েকটা দিন কেটে গেল, কিন্তু কিভাবে বা কোত্থেকে কাজ শুরু করবে ঠিক করতে পারছে না রানা। এঁতো বড় একটা দেশে কোথায় খুঁজবে সে ডালচিমস্কিকে? তার ওপর আবার নিষেধ করে দেয়া হয়েছে, কে. জি. বি. এজেন্ট বা অন্য কারো সাহায্য নেয়া যাবে না।

ইতিমধ্যে আরো একটা টেলি-বোমা ফাটিয়ে দিলো ডালচিমস্কি। কিন্তু লোকটা পালাতেও পারলো না, মারাও গেল না। আহত হয়ে জ্ঞান হারালো, সামরিক হাসপাতালে ভর্তি করা হলো তাকে। একাধিক মার্কিন ইন্টেলিজেন্স অষ্টপ্রহর তাকে পাহারা দিয়ে রাখলো। এই সময় রেডিওর মাধ্যমে কে. জি. বি. হেডকোয়ার্টার থেকে রানাকে অনুরোধ করা হলো, সামরিক হাসপাতালে ঢুকে রানা যেন জ্ঞানহীন ডীপ-কাভার এজেন্ট লোকটাকে খুন করে। মনে মনে ভীষণ রেগে গেল রানা। কি ভেবেছে তাকে ওরা? কসাই? কাজটায় প্রাণের ঝুঁকি আছে, তবু রানা সিদ্ধান্ত নিলো সামরিক হাসপাতালে ঢুকবে সে। খুন নয়, লোকটাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসবে।

ইতিমধ্যে রানার ওপর দু'বার হামলা চালানো হয়ে গেছে। দু'-বারই অল্পের জন্যে প্রাণে বেঁচে গেছে রানা। প্রথমবার নিজের বুদ্ধিতে বেঁচেছে, দ্বিতীয়বার লিলিয়ানের সাহায্যে। হামলাগুলো কারা করছে, কিভাবে তারা ওদের হোটেলের ঠিকানা যোগাড় করলো, এই সব প্রশ্নে লিলিয়ানের সাথে আলোচনা করলো রানা। আগেই লক্ষ্য করেছিল ও, লিলিয়ানের কানের দুল জোড়া অস্বাভাবিক বড়। কথাটা মুখ ফুটে বলতেই দুল জোড়া কান থেকে খুলে

রানার হাতে দিলো লিলিয়ান। দেখা গেল একটার চেয়ে অপরটা একটু বেশি ভারি। ক্ষুদে বোতামে চাপ দিয়ে ভারিটার ভেতর থেকে মিনি একটা ব্লিপার বের করলো রানা। লিলিকে বললো, কে. জি. বি. রেসিডেন্টের অনুরোধ ফেলতে পারোনি বলে এটা তুমি সাথে রেখেছিলে, তাই না? রেসিডেন্ট চেয়েছিল তুমি অর্থাৎ আমরা কোথায় যাই না যাই সব খবর সে যেন জানতে পারে। লিলিয়ান এমন ভাব দেখালো, যেন রানার অনুমানই ঠিক। দু'জনেই একমত হলো, রেসিডেন্ট যাদেরকে নিয়ে কাজ করে তাদের মধ্যে স্ট্যালিন-পন্থী কে. জি. বি. অথবা গ্রু-র এজেন্ট লুকিয়ে আছে, তারাই রানাকে খুন করার চেষ্টা করছে। এভাবে রহস্যের একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করানো গেল বটে, কিন্তু মনে মনে রানা জানলো, রহস্যের কোনো মীমাংসাই হলো না আসলে।

চোখ কান খোলা রাখলো রানা। জানে, আবার তার ওপর আক্রমণ হতে পারে।

অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে সামরিক হাসপাতালে ঢুকলো সে। ভিনসেন্ট গগল সাহায্য করলো ওকে। কিন্তু আহত ডীপ-কাভার এজেন্টের কেবিনে ঢুকে রানা দেখলো, লোকটা মারা গেছে। পরে রানা জানতে পারলো, কে. জি. বি. রেসিডেন্টের এজেন্ট তাকে খুন করে রেখে গেছে। রাগে দুঃখে ইচ্ছে হলো অ্যাসাইনমেন্ট ফেলে দেশে ফিরে যায়। কিন্তু তারপর ভাবলো, কাজটা নিতে রাজি হয়েছিল মানবিক একটা কারণে। ওর মনে হয়েছিল একশো ছত্রিশ জন টেলি-বম আসলে নিরপরাধ, সাংকেতিক বার্তা না পাওয়া পর্যন্ত তারা কোনো অপরাধ করবে না। কোনোভাবে এদেরকে যদি বাঁচানো সম্ভব হয় তাহলে একটা কাজের মতো কাজ করা হবে। ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা

করে দেশে ফিরে যাবার ইচ্ছেটা বাতিল করে দিলো রানা। একটা জেদ, একটা চ্যালেঞ্জ অনুভব করলো সে। দেখা যাক লোকগুলোকে বাঁচানো যায় কিনা।

প্রথম খণ্ডের শেষাংশে দেখা গেছে, লিলিয়ানকে সাথে নিয়ে নিউ ইয়র্কের রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করছে রানা। হঠাৎ কি মনে করে লিলিয়ানকে হোটেলে ফিরে যেতে বললো ও। হোটেলে ফিরতে বললো, কিন্তু নিজেদের কামরায় নয়—গ্রাউণ্ড ফ্লোরে রেস্তোরাঁ আছে, রানার জন্যে সেখানে অপেক্ষা করতে হবে লিলিকে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও রানার নির্দেশ মেনে নিয়ে ফিরে গেল লিলি।

লিলিকে বিদায় করে দিয়ে পাবলিক টেলিফোন বুদ থেকে একটা এয়ারলাইন্স অফিসে টেলিফোন করলো রানা। লাস ভেগাসের তুটো টিকেট রিজার্ভ করলো। লিলিকে জানায়নি ও, গ্রুর চারটে দল মেক্সিকো থেকে লাস ভেগাস এয়ারপোর্টেই আসছে। ওখান থেকে সারা আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়বে তারা, এক এক করে খুন করবে টেলি-বমগুলোকে।

রানা ঠিক করেছে, ওরা যখন পৌঁছুবে তখন লাস ভেগাসে থাকবে সে। ওদের ব্যাপারে কি করা যায় তা এখনো ঠিক করেনি। জানে, একাধিক ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তার মধ্যে একটা হলো, নিজের পরিচয় না জানিয়ে এফ. বি. আই.-কে ওদের আসার কথা এবং পরিচয় জানিয়ে দেয়া। এফ. বি. আই. সদলবলে হাজির থাকবে এয়ারপোর্টে, একটা করে গ্রুর টিম প্লেন থেকে নামবে আর তাদের গ্রেফতার করা হবে। এখন পর্যন্ত এটাই সবচেয়ে নিরাপদ বলে মনে হচ্ছে রানার কাছে।

সুধী পাঠকবৃন্দ, বুঝতেই পারছেন রানা সম্ভবত এই অ্যাসাইন-

মেণ্টে ব্যর্থ হতে যাচ্ছে। বেশ ক'দিন হয়ে গেল আমেরিকায় পৌঁচেছে ও, বেশিরভাগ সময় নিজের জান বাঁচাবার জন্যে ছুটোছুটি করতে হচ্ছে ওকে, আসল কাজে এখন পর্যন্ত হাতই দিতে পারেনি। অবশ্য কাজে হাত দেয়ার জন্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও—ঠিক করেছে, অসৎ একজন পুলিশের সাহায্য নেবে। চলুন এবার দেখা যাক আপনাদের প্রিয় মার্জারের কপালে শিকে ছেঁড়ে কিনা।

এক

শেরাটন হোটেলের গ্রাউণ্ড ফ্লোরে, লোটাস বার অ্যাণ্ড রেস্টুরেণ্টে বসে রয়েছে লিলি। এক ঘণ্টার মধ্যে আসার কথা অথচ দেড় ঘণ্টা পেরিয়ে যাচ্ছে, রবিনের দেখা নেই। রাগ বা অভিমান নয়, দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগে মনে মনে ছটফট করছে লিলি। মানুষটার কোনো বিপদ হলো না তো? আমাকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে গেলই বা কোথায়? টনটনে সময় জ্ঞান, এতো দেরি করার মানুষ তো সে নয়!

রেস্টুরেণ্টের পিছন দিকে, কোণের একটা টেবিলে বসেছে লিলি। রাত কম হয়নি, প্রায় বারোটা, তবু আশপাশের সবগুলো টেবিলে খদ্দের রয়েছে। আজ রাতে শেষবারের মতো গলা ভিজিয়ে নিতে এসেছে ওরা, আর খানিক পর এক এক করে বেরিয়ে যাবে সবাই। রেস্টুরেণ্টে ঢোকার মুখেই বার কাউণ্টার, সেটার সামনে পাঁচ-সাতজন লোক দাঁড়িয়ে বিয়ার বা হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে। কাউণ্টারের পাশেই টেলিফোন বুদটা। পিছন দিকে শুধু লিলির টেবিলেই তিনটে চেয়ার খালি, তবু কেউ উপযাচক হয়ে আলাপ

জমাবার চেষ্টা করেনি বা খালি চেয়ারগুলোয় বসার অনুমতি চায়নি, সম্ভবত ওকে একা এবং বিষণ্ণ দেখেই। লিলির পিছনের দেয়ালে বড়সড় একটা আয়না থাকলেও, দরজার দিকে মুখ করে বসেছে সে। দরজার বাইরে করিডর, উল্টোদিকে পাশাপাশি তিনটে কাঁচের দরজা, দরজার ওদিকে রিশেপসন হল আর লাউঞ্জ। নিজের টেবিল থেকে লাউঞ্জে ঢোকার দ্বিতীয় এবং শেষ দরজাটাও দেখতে পাচ্ছে। ঢুকলে দ্বিতীয় দরজা দিয়েই লাউঞ্জে ঢুকবে রবিন। লাউঞ্জের এলিভেটরটাও দেখতে পাচ্ছে লিলি।

একা একা অনেক গোপন কথা ভাবছে ও। ইতিমধ্যে দু'বার খুন করার চেষ্টা করা হয়েছে রবিনকে। দু'বারই রবিনের সাথে সে-ও মারা যেতে পারতো। প্রথমবার আততায়ীরা কিভাবে ওদের হদিশ পেয়েছিল রবিন তা আবিষ্কার করে ফেলে। লিলির কানের ভারি দুলটার ভেতর থেকে ক্ষুদে ব্লিপার বের হয়। দ্বিতীয়বার রবিনের ধারণা হয়, লিলি কে. জি. বি. রেসিডেন্টের সাথে যোগাযোগ করতে গিয়ে শত্রুর চোখে পড়ে যায়, তারা লিলিকে অনুসরণ করে, এবং এক সময় রবিনকে দেখে ফেলে। কিন্তু লিলি জানে, ব্যাপারটা ঠিক তা ছিলো না। কে. জি. বি. রেসিডেন্টের সাথে তার যোগাযোগ করার প্রশ্নই ওঠে না, কাজেই যোগাযোগ করতে গিয়ে শত্রুর চোখে ধরা পড়ার প্রশ্নও অবান্তর। শত্রুরা তার হদিশ পায় টেলিফোনে, এ-ব্যাপারে লিলি সম্পূর্ণ নিশ্চিত। কোত্থেকে টেলিফোন করা হয়েছিল তা-ও পরিষ্কার জানে সে। অর্থাৎ মোক্ষম জায়গায় একজন গুপ্তচর লুকিয়ে আছে।

হঠাৎ আঁতকে উঠলো লিলি। এই মুহূর্তেও! সেই গুপ্তচর সম্ভবত এই মুহূর্তেও জানে কোথায় রয়েছে সে। দেড় ঘণ্টার বেশি হলো

এখানে বসে রয়েছে, গুপ্তচরের ফোন পেয়ে এখানেও শত্রুরা ওত পেতে নেই তো ?

চারপাশে দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে আশপাশটা দেখে নেয়ার ঝোঁকটা অনেক কষ্টে দমন করলো লিলি। কেউ যদি তার ওপর নজর রেখেই থাকে, তাকে সতর্ক করে দেয়াটা বোকামি হবে। আরেকটা কথা ভেবে ক্ষীণ একটু স্বস্তি বোধ করলো সে। শত্রুরা যদি থাকে, তারা নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছে রবিনের জন্যে। তাহলে রবিন বরং আরো দেরি করে এলেই ভালো, বিরক্ত হয়ে ফিরে যাবে ওরা। পরমুহূর্তে নিজেকে তিরস্কার করলো লিলি, বোকার মতো চিন্তা করছে সে। প্রফেশনাল খুনীরা কখনো অধৈর্য হয়ে ফিরে যায় না। রবিনের অপেক্ষায় সে যতোক্ষণ এখানে বসে থাকবে, আততায়ীরাও ততোক্ষণ এখান থেকে নড়বে না।

আমার তাহলে এখানে বসে থাকা উচিত হচ্ছে না।

কিন্তু রবিন আমাকে এখানেই থাকতে বলে দিয়েছে।

বিপদ যদি হয়ই, আমি থাকলেও হবে, না থাকলেও হবে— থাকলে বরং সতর্ক বা সাহায্য করতে পারবো ওকে।

ওয়েটারকে ডাকার ছলে এদিক ওদিক তাকালো লিলি। কেউ ওর দিকে তাকিয়ে নেই, কাউকে সন্দেহজনক বলে মনে হলো না। কাছে এসে দাঁড়ালো ওয়েটার। ‘আরেকটা বিয়ার দাও,’ তাকে বললো লিলি। ‘না, আরো দুটো।’ লোকজনের মাথার ওপর দিয়ে হঠাৎ রবিনকে দেখতে পেয়েছে সে।

চলে গেল ওয়েটার। লাউঞ্জ পেরিয়ে করিডরে বেরিয়ে এলো রবিন। তারপর কাঁচ লাগানো সুইংডোর ঠেলে রেস্টুরেন্টে ঢুকলো। গাল ফুলিয়ে নড়েচড়ে বসলো লিলি। রবিন কাছে

আসতে বললো, 'তুমি কেমন মানুষ বলো তো! এক ঘণ্টার কথা বলে দু'ঘণ্টা পার করে দিলে!'

'আরে সব্বোনাশ, বিবি সাহেব দেখি রেগে টং হয়ে আছে!' খালি একটা চেয়ার টেনে লিলির মুখোমুখি বসলো রানা। পিছনে একটা শব্দ হলো—সম্ভবত কারো পকেট বা হাত থেকে খুচরো পয়সা পড়ে গেছে মেঝেতে। 'শোনো, কাল সকালে আমরা লাস ভেগাসে যাচ্ছি,' নিচু গলায় বললো রানা। 'টুকটাক কিছু কেনা-কাটা করে আজ রাতেই সব গুছিয়ে রাখতে হবে।' আয়নার দিকে চোখ পড়তে চুপ করে গেল ও। বিয়ার নিয়ে এগিয়ে আসছে ওয়েটার।

ওয়েটার চলে যেতে বিয়ারের গ্লাসে ছোট্ট একটা চুমুক দিলো রানা। 'বাইরে বেশি ঠাণ্ডা, বুঝলে। এক ছুটে কামরা থেকে তোমার কোটটা নিয়ে এসো।'

কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকিয়ে থাকলো লিলি, কিন্তু কথা বাড়ালো না। তাড়াতাড়ি বিয়ারটুকু শেষ করে উঠে দাঁড়ালো সে। 'এখুনি নিয়ে আসছি,' বলে দরজার দিকে এগোলো।

রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে এলো লিলি। করিডর পেরিয়ে লাউঞ্জে ঢুকলো। এলিভেটরের পাশেই সিঁড়ি, সিঁড়িটাকেই বেছে নিলো সে। স্যাভয়ের এলিভেটর বিস্ফারিত হবার পর ভয়টা এখনো তার দূর হয়নি।

এদিকে লিলি লাউঞ্জে ঢুকতেই অস্থির হয়ে উঠলো রানা। দ্রুত পকেট হাতড়াচ্ছে সে। কি যেন খুঁজছে। হঠাৎ বোকা বোকা হাসি দেখা গেল ওর মুখে। পকেট থেকে বের করে আনলো সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার। দরজার দিকে পিছন ফিরে বসেছিল ও,

ঘাড় ফিরিয়ে করিডর আর লাউঞ্জের দিকে তাকালো। দেখলো, সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে লিলি। লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়লো রানা, প্রায় দৌড় দিয়ে বেরিয়ে এলো করিডরে, ওখান থেকে চিৎকার করে ডাকলো, 'লিলি, এই লিলি—চলে এসো, সিগারেট আমার পকেটেই!'

হাসতে হাসতে নিজের চেয়ারে ফিরে এসে বসলো রানা। আয়েশ করে একটা সিগারেট ধরালো।

শান্তভাবে ফিরে এসে নিজের চেয়ারে বসলো লিলি। টেবিল থেকে প্যাকেট তুলে নিয়ে সিগারেট বের করে ধরালো। তারপর ফিসফিস করে বললো, 'আমি সিগারেট আনতে যাচ্ছিলাম না।'

ধোঁয়া উদগীরণ করার ছলে রানাও ঠোঁট নাড়লো, 'জানি।'

'তাহলে?'

'আমি এখন চিন্তিত,' বিড়বিড় করে বললো রানা। 'বিরক্ত করো না।'

অভিমান হলেও, লোকজনকে দেখিয়ে মৃদু শব্দে হাসলো লিলি।

'আমাদের কামরায় তুমি নও, আমি যাবো,' বললো রানা। কেউ ওদের দিকে তাকিয়ে নেই, কেউ ওদের কথা শুনতে পাচ্ছে না।

'কিন্তু কেন?'

হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো রানার চেহারা। 'ঠিক জানি না। হয়তো পাখা গজিয়েছে, মরতে যাবো। আমি চলে যাবার দু'মিনিট পর ফোন বুদে ঢুকে আবোলতাবোল নম্বরে ডায়াল করবে, সাত মিনিটের আগে বুদ থেকে বেরুবে না।' পকেট থেকে একগাদা খুচরো পয়সা বের করে টেবিলের তলা দিয়ে লিলির মুঠোয় গুঁজে

দিলো ও। 'বেরিয়ে কেনেডি এয়ারপোর্টের কাছে হোটেল লিফটনে যাবে, আরেক নামে কামরা ভাড়া করবে।'

'কিন্তু… !'

লিলির কথা যেন শুনতেই পেলো না রানা। অ্যাশট্রেতে সিগারেট গুঁজতে গুঁজতে উঠে দাঁড়িয়েছে ও। 'আসছি,' বলে আধ পাক ঘুরে দরজার দিকে পা বাড়ালো।

তিনতলায় রানা আর লিলির কামরা। দরজা বন্ধ, ভেতরটা অন্ধকার, দরজার দিকে মুখ করে কামরার মাঝখানে একটা চেয়ারে বসে রয়েছে আততায়ী। প্রায় তিন ঘণ্টা হলো মাস্টার কী দিয়ে দরজার তালা খুলে ভেতরে ঢুকেছে সে। ঢোকার পরপরই ফোন করে নিজের সঙ্গী লোকটাকে জানিয়ে দিয়েছে, ভেতরে ঢুকতে কোনো অসুবিধে হয়নি, ঢুকতে তাকে দেখেওনি কেউ। ঘণ্টাখানেক পর সঙ্গীর কাছ থেকে সে-ও একটা টেলিফোন পেয়েছিল—শিকার নয়, শিকারের সঙ্গিনী রেস্টুরেন্টে পৌঁচেছে। তারপর এই খানিক আগে কয়েক মিনিটের ব্যবধানে পরপর তিনটে ফোন পেয়েছে সে। প্রথমে বলা হলো, শিকারও এইমাত্র রেস্টুরেন্টে পৌঁছুলো। তারপর বলা হলো, শিকার নয়, তার সঙ্গিনী তিনতলায় উঠছে। সবশেষে বলা হলো, না, ওরা কেউ এখন কামরায় যাচ্ছে না।

টেলিফোন সহ টেবিলটা ঘরের মাঝখানে, চেয়ারের কাছে টেনে এনেছে আততায়ী। বেল বাজলেই রিসিভার তুলে নেবে সে। এই মুহূর্তে একদৃষ্টে দরজার দিকে তাকিয়ে আছে, হাতে ধরা পিস্তলের মাজল্-ও দরজার দিকে তাক করা।

ঝন ঝন শব্দে আবার বেজে উঠলো টেলিফোন।

ছোঁ দিয়ে রিসিভার তুললো আততায়ী।

'শিকার তিনতলায় উঠছে,' অপরপ্রান্ত থেকে সঙ্গী বললো। 'একা। সিঁড়িতে পা রাখলো এই মাত্র। গেট রেডি! গুড লাক!' যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

আস্তে করে ক্রেডলে রিসিভার নামিয়ে রাখলো আততায়ী। পিস্তলটা শক্ত করে ধরলো সে। দরজার বাইরে করিডরে আলো আছে, চৌকাঠের নিচের দিকে সরু, লম্বা একটা সাদাটে রেখা ফুটে আছে। কী-হোলটাও সামান্য আলোকিত। দরজার সামনে করিডরে কেউ দাঁড়ালে ছ'জায়গাতেই তার কালো ছায়া পড়বে।

একচুল নড়ছে না আততায়ী। ট্রিগারে শক্ত হয়ে আছে আঙুল। দরজার বাইরে ছায়া দেখলেই ট্রিগার টেনে দেবে সে। পিস্তলে সাইলেন্সার ফিট করা আছে, তেমন কোনো শব্দ হবে না। তবু ভাগ্যের সহায়তা দরকার হবে তাদের। শিকার যদি করিডরে একা থাকে, তাহলে কোনো সমস্যা হবে না। কিন্তু করিডরে যদি আর কেউ থাকে, ঝামেলা বেধে যাবে। সেক্ষেত্রে দরজা খুলেই ঝেড়ে দৌড় দেবে সে। হাতে পিস্তল থাকবে, কাজেই মরণের পাখা না গজালে কেউ তাকে বাধা দিতে আসবে বলে মনে হয় না।

এক, দুই করে সেকেণ্ড গুণছে আততায়ী।

একশো পর্যন্ত গোণার পর আবার নতুন করে এক, দুই শুরু করলো সে। দুশো পর্যন্ত গোণা শেষ করলো। এক তলা থেকে তিনতলায় উঠতে ক'টাই বা ধাপ সিঁড়ির, এতো দেরি হচ্ছে কেন?

তারপর মনে পড়লো, দোতলার ল্যাণ্ডিঙে ছোটো একজোড়া দোকান আছে। শিকার হয়তো সিগারেট কেনার জন্যে থেমেছে। কিংবা হয়তো বুকস্টলে দাঁড়িয়ে পেপার পড়ছে।

আরো তিনশো পর্যন্ত গুণলো আততায়ী। ব্যাপার কি? নিচে সঙ্গিনীকে বসিয়ে রেখে কেউ যদি তিনতলার একটা কামরা থেকে কিছু নিতে আসে, মাঝপথে কতোক্ষণ সময় নষ্ট করবে সে? এতো দেরি হচ্ছে কেন? মাঝপথ থেকে আবার যে রেস্টুরেন্টে নেমে যায়নি তা তো বোঝাই যাচ্ছে, কারণ তা গেলে আরেকটা টেলিফোন পেতো সে।

সঙ্গীকে সে টেলিফোন করবে নাকি? তাকে জিজ্ঞেস করবে, শিকারের পৌঁছুতে এতো দেরি হচ্ছে কেন? কিন্তু তাতে লাভ হবে না, কারণ সঙ্গীও তার মতো অন্ধকারে রয়েছে, শিকারের দেরি হবার কারণ তারও জানা নেই। তারচেয়ে আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখা যাক।

আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। আরো আড়াই শো পর্যন্ত গুণেছে আততায়ী, হঠাৎ দরজার বাইরে চৌকাঠের সরু ফাঁকে ছায়া দেখে দম বন্ধ হয়ে এলো তার। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড, তারপরই কী-হোলের একটু ওপরের একটা বিন্দু লক্ষ্য করে পরপর দু'বার গুলি করলো সে। কাতর একটা ধ্বনি তার কানে যেন মধুবর্ষণ করলো। একবার না পারিলে দেখো শতো বার! দু'বার দু'দলকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলে, বাছাধন! কিন্তু আমাকে তুমি ফাঁকি দিতে পারোনি!

কাতর গোঙানির শব্দ তখনো থামেনি, বিদ্যুৎবেগে দরজার সামনে চলে এলো আততায়ী। নবটা ঘুরিয়ে এক ঝটকায় খুলে ফেললো দরজার কবাট।

কাউন্টারের সামনে, ফোন বুদের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিলো আত-

তায়ীর সঙ্গী লোকটা। তার পরনে কালো একটা জ্যাকেট, মাথায় একই রঙের হ্যাট। রানা যখন রেস্টুরেন্টে ঢুকলো, তাড়াহুড়ো করে বুদে ঢোকার সময় এক লোকের সাথে ধাক্কা খায় সে, মুঠোর ভেতর ভরে রাখা খুচরো পয়সাগুলো মেঝেতে পড়ে যায়। এমন কিছুই নয় ব্যাপারটা, কিন্তু তবু মনটা তার খুঁতখুঁত করতে থাকে।

তারপর আরো কয়েকটা ঘটনা ঘটলো, কোনোটাকেই স্বাভাবিক-ভাবে নিতে পারলো না সে। তার ধারণা ছিলো, শিকার রেস্টুরেন্টে ঢুকবে সঙ্গিনীকে নিয়ে তিনতলায় নিজেদের কামরায় যাবে বলে। রাত তো আর কম হয়নি, নিশ্চয়ই বিছানায় গিয়ে মজা করার জন্যে অস্থির হয়ে থাকবে ছু'জনেই। কিন্তু তার ধারণা মিথ্যে প্রমাণিত হলো। শিকার নয়, রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোলো তার সঙ্গিনী।

কিন্তু সঙ্গিনীকে সিঁড়ি থেকে ডেকে নিলো শিকার। কি যেন কথা হলো ছু'জনের মধ্যে। তারপর শিকার নিজে চেয়ার ছাড়লো। তিনতলায় যাবে। প্রতিবারের মতো, এবারও কি ঘটতে চলেছে ফোনে সে তার সঙ্গীকে জানিয়েছে। মনটা খুঁত খুঁত করছিল বলেই তার একটা ঝোঁক চাপে, শিকারের পিছু পিছু সে-ও তিন-তলায় উঠে পড়ে। কিন্তু ঝোঁকটাকে দমিয়ে রাখে সে। কারণ প্ল্যানটা অন্য ভাবে করা হয়েছে।

প্ল্যান করার সময় ছু'জনেই একমত হয়েছিল, রানা হচ্ছে আসল শিকার, কিন্তু লিলিকেও বাঁচিয়ে রাখা চলে না। যদি সম্ভব হয় তাহলে ছু'জনকে একসাথে গুলি করে মারা হবে, তা না সম্ভব হলে একেকবারে একেকজনকে। তবে প্রথমে মারতে হবে রানাকে।

সংক্ষেপে প্ল্যানটা ছিলো এই রকম : মেয়েটা যদি একা কামরায়

ঢুকতে যায়, তাকে গুলি করা হবে না, ভেতরে ঢুকতে দেয়া হবে। ভেতরে ঢুকলে তাকে বন্দী করা হবে, মুখে কাপড় গুঁজে শুইয়ে রাখা হবে মেঝেতে, হাত-পা বেঁধে। আর যদি রানা একা কামরার সামনে আসে, তাকে কোনো সুযোগই দেয়া হবে না, বন্ধ দরজার ভেতর থেকে গুলি করা হবে। কিন্তু যদি দু'জন একসাথে তিনতলায় ওঠে তাহলে রেস্টুরেণ্ট থেকে সঙ্গীকে ফোন করে সে-ও ওদের পিছু নেবে। এই পরিস্থিতিতে গুলি করবে দু'জনেই—কামরার ভেতর থেকে একজন, আর করিডর থেকে অপরজন।

কাজেই রানা যখন একা তিনতলার উদ্দেশে রওনা হলো, মেয়েটার সাথে রেস্টুরেণ্টে থেকে যেতে হলো তাকে। সঙ্গীর ওপর তার আস্থা আছে, জানে তার লক্ষ্য কখনো ব্যর্থ হয় না। গুলি করার পরপরই দরজা খুলে লাশটা ঘরের ভেতর ঢুকিয়ে নেবে সে। তারপর অপেক্ষা করবে। রানার দেরি দেখে কিছুক্ষণ পর মেয়েটাও তিন-তলায় উঠবে। রেস্টুরেণ্ট থেকে সে-ও তখন অনুসরণ করবে মেয়েটাকে।

রানা সিঁড়ি বেয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবার পর ছয় মিনিট অপেক্ষা করলো কালো জ্যাকেট। ইতিমধ্যে আরো একটা ব্যাপার তার মনের খুঁতখুঁতে ভাবটা বাড়িয়ে তুলেছে। চার মিনিট আগে সেই যে মেয়েটা ফোন বুদে ঢুকেছে, বেরুবার নামটি পর্যন্ত নেই। ঈশ্বর জানে কোথায় ফোন করছে বারবার।

তবু এই বলে নিজেকে সান্ত্বনা দিলো সে যে আসল সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। রানা যে বেঁচে নেই এ-ব্যাপারে সে নিশ্চিত। তিনতলায় কোনো ঝামেলাই হয়নি, হলে এতোক্ষণে মহা হৈ-চৈ বেধে যেতো।

কাজেই অপেক্ষা করা যেতে পারে। বাইরে ফোন করা এক সময় শেষ হবে মেয়েটার। রানার দেরি হচ্ছে দেখে তিনতলায় ফোন করতে পারে সে। রানাকে খুন করার পর আর কোনো ফোন রিসিভ করবে না তার সঙ্গী, জানে কালো হ্যাট। কেউ রিসিভার তুলছে না দেখে কি করবে মেয়েটা? হয়তো আরো ক'মিনিট অপেক্ষা করবে। তারপর রেস্টুরেণ্ট থেকে বেরিয়ে তিনতলায় যাবে সে।

ফোন বুদে ঠিক সাত মিনিট থাকার পর বেরিয়ে এলো লিলি, ওয়েটারকে ডেকে ওখানে দাঁড়িয়েই বিল মেটালো, ভাঙতি পয়সা ফেরত না নিয়ে চলে এলো লাউঞ্জে, সেখান থেকে হোটেলের বাইরে। রাস্তা পেরিয়ে খানিকটা হাঁটলো সে, তারপর একটা ট্যাক্সি পেয়ে উঠে বসলো। ড্রাইভারকে বললো, 'কেনেডি এয়ারপোর্ট।'

লিলি হোটেল থেকে বেরিয়ে যেতে বোকা বনে গেল কালো হ্যাট। একবার ইচ্ছে হলো, মেয়েটার পিছু নেয়। কিন্তু প্ল্যানটা সেভাবে করা হয়নি ভেবে ইতস্তত করতে লাগলো সে। এতো রাতে মেয়েটা যে হোটেল থেকে বেরিয়ে অন্য কোথাও যেতে পারে, ওদের মাথায় একবারও এই সম্ভাবনাটা উঁকি দেয়নি! মেয়েটার পিছু পিছু গেলে তাকে খুন করার একটা সুযোগ হয়তো পাওয়া যাবে, কিন্তু সুযোগ-টা পেতে কতোক্ষণ সময় লাগবে বলা মুশকিল। এদিকে ঘরে লাশ নিয়ে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করা তার সঙ্গীর পক্ষে সম্ভব নয়। ফোন করে পরামর্শ করার ইচ্ছা হলো, কিন্তু আগেই ঠিক করা হয়েছে, রানাকে খুন করার পর তার সঙ্গী রিসিভার তুলবে না।

অগত্যা রেস্টুরেণ্ট থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোলো কালো হ্যাট।

তিনতলায় উঠে নিজেদের কামরার সামনে মুহূর্তের জন্যেও থামেনি রানা। আলোকিত করিডরের মাঝখান দিয়ে এগোলো, নিজেদের কামরাটাকে ছাড়িয়ে বিশ গজের মতো এসে ছোটো একটা ঝুল-বারান্দা দেখে থামলো সেখানে। কামরার দরজা থেকে জায়গাটা বেশ একটু দূরে হয়ে গেল, তবে চমৎকার একটা আড়াল পাওয়া গেছে বটে।

মনে মনে একটা হিসেব করেছে রানা, সম্ভবত মিনিট দশেকের মতো অপেক্ষা করতে হবে ওকে।

আর হ্যাঁ, ঠিক দশ মিনিটের মাথায় অপেক্ষার পালা শেষ হলো। সিঁড়ির মাথায় লোকটাকে দেখেই চিনতে পারলো রানা। রেস্টু-রেণ্টে এই লোকের হাত থেকেই খুচরো পয়সা পড়ে গিয়েছিল।

করিডর ধরে হন হন করে এগিয়ে এলো লোকটা। রানাদের কামরার সামনে থামলো সে। নক করার জন্যে হাত তুললো, কিন্তু শূন্যে স্থির হয়ে থাকলো হাতটা, মাথা নিচু করে নিজের পায়ের চারপাশে কি যেন খুঁজছে সে।

ঝুল-বারান্দা থেকে উঁকি দিয়ে আবার তাকালো রানা। নির্মম এক চিলতে হাসি দেখা গেল ওর ঠোঁটে। লোকটা কি খুঁজছে জানে ও। একেই সম্ভবত নিয়তির পরিহাস বলে। রক্তের দাগ খুঁজছে লোকটা।

রক্ত ঝরলো ঠিকই, কিন্তু তা লোকটার নিজের রক্ত। দরজার সামনে দাঁড়িয়েছে সে পাঁচ সেকেণ্ডও হয়নি, পরপর দু'বার ঝাঁকি খেলো। লোকটার মুখের একটা পাশ আর পিঠের খানিকটা দেখতে পাচ্ছিলো রানা। পিঠে পাশাপাশি দুটো ফুটো তৈরি করে বেরিয়ে এলো একজোড়া বুলেট। হাঁ হয়ে গেল মুখ, কাতর আক্ষেপ ধ্বনি

বেরিয়ে এলো গলার ভেতর থেকে।

গোঙানির আওয়াজটাই সব ভণ্ডুল করে দিলো। রানার ধারণা ছিলো না বুকের মোক্ষম জায়গায় গুলি খেয়ে এতো জোরে কেউ গোঙাতে পারে। ওদের কামরার দরজা বিস্ফোরিত হলো, প্রায় একই সাথে আশপাশের আরো কয়েকটা দরজা দড়াম দড়াম করে খুলে গেল।

দরজা খুলে বেরিয়ে এলো আততায়ী, লাশ তো নয় যেন ভূত দেখে চমকে উঠলো সে। আশপাশের খোলা দরজা থেকে লোকজনকে বেরিয়ে আসতে দেখে 'পুলিশ, পুলিশ' বলে চিৎকার জুড়ে দিলো, লাশ টপকে তীর বেগে ছুটলো সিঁড়ির দিকে। কেউ কিছু বুঝতে না পেরে দ্রুত পথ ছেড়ে দিলো তাকে। ইতিমধ্যে ঝুল-বারান্দা থেকে করিডরে বেরিয়ে এসেছে রানা, কিন্তু গুলি করার কোনো সুযোগই পেলো না ও। 'খুনী, ধরুন ওকে!' চিৎকার করে বলতে পারতো বটে, কিন্তু তাতে লাভের চেয়ে লোকসান হতো বেশি। লোকজন বা পুলিশকে জানতে দেয়া চলবে না ঘটনার সাথে সে-ও জড়িত ছিলো। কিন্তু লোকটাকে তো আর পালাতে দেয়া যায় না, ধাওয়া শুরু করলো ও। পিস্তলটা পকেটেই রয়েছে, বের করেনি।

রক্তাক্ত লাশ দেখলে যা হয়, এগোতে গিয়ে পিছিয়ে আসছে লোকজন। তিন চার জনের সাথে ধাক্কা খেয়ে রানা যখন সিঁড়ির মাথায় পৌঁছুলো, আততায়ী তখন একতলায় নেমে গেছে। দোতলা থেকে আরো অনেক লোক উঠে আসছে, রানার উত্তেজিত চেহারা দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো তারা যে যার ধাপে। ফলে এক তলায় নামতে আরো দেরি হয়ে গেল রানার। হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে আততায়ীর ছায়া পর্যন্ত দেখলো না কোথাও।

মনে মনে লোকটার প্রশংসা করলো রানা। স্রেফ উপস্থিত বুদ্ধির জোরে বেঁচে গেল ব্যাটা। পুলিশ পুলিশ বলে চিৎকার না করলে করিডরের লোকরাই তাকে খুনী মনে করে জড়িয়ে ধরে ফেলতো।

অনেক দেরি করে, রাত প্রায় দুটোর সময়, হোটেল লিফটনে এলো রানা। রিসেপশনে বসে ডিউটি ক্লার্ক ঝিমোচ্ছিল, পোর্টারের সাথে রানাকে দেখে চোখ কচলাতে কচলাতে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লো।

'আমি জন প্লেয়ার,' বললো রানা। 'মিসেস প্লেয়ার··· ?'

'জ্বী,' রেজিস্টার খাতা খুলে চোখ বুলালো ক্লার্ক। 'থার্ড ফ্লোর, রুম নাম্বার নাইনটি-ফোর। উনি বলেছেন আপনি এলে যেন ফোন করি, কেননা যদি ঘুমিয়ে পড়েন ।'

ক্লার্ককে সুযোগ না দিয়ে কাউন্টার থেকে ফোনের রিসিভার তুলে নিলো রানা। 'নম্বরটা বলুন।' নম্বর জেনে নিয়ে ডায়াল করলো ও। অপরপ্রান্তে সাথে সাথে রিসিভার তুললো লিলি।

'হ্যালো ?'

'জেগে বসে আছো, হানি ?' হাসলো রানা। 'যা যা বলে দিয়েছিলে সব কিনে এনেছি··· ।'

পোর্টারের হাতের দিকে তাকালো ক্লার্ক। তার দু'হাতে স্যুটকেস আর ব্যাগ। ওজনের ভারে কাঁধ দুটো দু'দিকে ঢালু হয়ে আছে।

রিসিভার নামিয়ে রেখে ধন্যবাদ দিলো রানা, তারপর এলিভেটরের দিকে এগোতে যাবে, সবিনয়ে বাধা দিলো ক্লার্ক।

'স্যার, আপনার পাসপোর্টটা ?'

কোটের ভেতরের পকেটে হাত ভরে পাসপোর্ট বের করলো রানা। সেটা নিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলো ক্লার্ক। ব্রিটিশ পাসপোর্ট, সাবজেক্টের পেশা অধ্যাপনা। মিসেস প্লেয়ারের কাছ থেকে আগেই জেনেছে সে, ইংলিশ লিটারেচারের ওপর একটা আন্তর্জাতিক সেমিনার হচ্ছে নিউ ইয়র্কে, সস্ত্রীক সেই সেমিনারে যোগ দিতে এসেছেন ভদ্রলোক। পাসপোর্টের ফটোর সাথে ভদ্রলোকের চেহারা-টা মিলিয়ে দেখলো সে। চওড়া গোঁফ, চওড়া জুলফি, নাকের পাশে লালচে জরুল, চোখে বাইফোকাল চশমা—সব ঠিক আছে।

পোর্টারকে পিছনে নিয়ে চারতলায় উঠে এলো রানা। চুরানব্বই নম্বর কামরার সামনে দাঁড়িয়ে নক করলো দরজায়। কী-হোলে চোখ রেখে আগে দেখে নিলো লিলি, তারপর দরজা খুললো। হোটেল শেরাটনে যাকে দেখে এসেছে তার সাথে এই লোকের চেহারা মেলে না, তবে রবিনের এই নতুন চেহারাই আশা করছিল সে। সম্ভবত কোনো পাবলিক টয়লেটে ঢুকে আগের চেহারা পাল্টে ফেলেছে রবিন।

ভেতরে ঢুকে লিলিকে জড়িয়ে ধরলো রানা, আদর করে ঠোঁট বুলালো তার গালে। ওদেরকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে খানিকটা ঢুকে ব্যাগ আর স্যুটকেস নামিয়ে রাখলো পোর্টার, তারপর পিছিয়ে গিয়ে দোরগোড়ায় দাঁড়ালো। পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে লোকটাকে বখশিশ দিলো রানা, স্যালুট ঠুকে লোকটা চলে গেল।

দরজা বন্ধ করে কবাটে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালো লিলি। দু'জন দু'-জনের দিকে কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ তাকিয়ে থাকলো।

'ভাগ্যিস তুমি ইনসিস্ট করেছিলে,' বললো লিলি, 'তা না হলে আরেক জোড়া পাসপোর্ট তৈরিই হতো না।'

'মস্কো থেকেই নিয়ে আসতাম, কিন্তু হেডকোয়ার্টার আমাকে বলে দেয়া হয় জানাশোনা লোক আছে তোমার, কাগজ-পত্র জাল করার ব্যাপারে তাদের জুড়ি নেই, সেজন্যেই দায়িত্বটা তোমার ঘাড়ে চাপিয়েছিলাম। সত্যি সত্যি কাজে লাগবে তা কিন্তু ভাবিনি।'

ব্যাগ আর স্যুটকেসের দিকে তাকালো লিলি। 'সবই দেখছি নতুন।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালো রানা। 'আবার সব ফেলে আসতে হয়েছে।'

'কেন?' রানার দিকে এক পা এগোলো লিলি। 'কি ঘটলো ওখানে?'

'তুমি আন্দাজ করতে পারোনি কি ঘটেছে?' পাল্টা প্রশ্ন করলো রানা, চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো।

'কি বলতে চাও তুমি?' আড়ষ্ট হয়ে গেছে লিলি।

একটা হাত তুললো রানা, অর্থাৎ তর্ক করার ইচ্ছে নেই। 'আবার, লিলি। আবার খুন করার চেষ্টা করা হয়েছিল। একা আমাকে নয়, আমাদেরকে।'

বিড়বিড় করে লিলি বললো, 'মাই গড!' নিজের অজান্তেই তার একটা হাত উঠে গেল গালের কাছাকাছি। কি করতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি হাতটা নামিয়ে নিতে গেল সে, কিন্তু তার আগেই সেটা খপ্ করে ধরে ফেললো রানা।

'ছাড়ো!' হাতটা মুচড়ে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করলো লিলি।

'আমি একটা আহাম্মক,' গাল পাড়লো রানা। 'এমন বোকামি মানুষ করে। তখনই আমার বোঝা উচিত ছিলো!' লিলির হাত ছেড়ে দিলো ও। 'খোলো আবার, দেখতে দাও।'

লিলির চেহারায় রাগ ছিলো, হঠাৎ দু'চোখ ঝিক্ করে উঠলো কৌতুক আর প্রশ্রয়। শরীরে মৃদু ঢেউ তুলে রিনরিনে গলায় জিজ্ঞেস করলো, 'কি ? কি খুলবো ? কাপড় ?'

হঠাৎ খেপে গেল রানা। দু'হাতে লিলির কাঁধ খামচে ধরলো ও। আধ পাক ঘোরালো। তারপর ধাক্কা দিলো সজোরে। ছিটকে গিয়ে বিছানার ওপর চিৎ হয়ে পড়লো লিলি। উঠে বসতে যাবে, দ্রুত বিছানার সামনে এসে ঠাস করে চড় কষালো গোলাপি গালে।

ফুঁপিয়ে উঠে দু'হাতে মুখ ঢাকলো লিলি। কান্নার দমকে ফুলে ফুলে উঠলো তার পিঠ।

বিছানার কিনারায় বসে সিগারেট বের করলো রানা। খানিক পর লিলির কান্না থামলো। কিন্তু নড়লো না সে, যেমন দ পাকিয়ে শুয়েছিল তেমনি শুয়ে থাকলো।

আবার জিজ্ঞেস করলো রানা, 'খুলবে ?'

কয়েক সেকেণ্ড পর বিছানায় উঠে বসলো লিলি। ধীরে ধীরে খুলতে শুরু করলো কানের দুল জোড়া। পাশাপাশি কয়েকটা কালচে লম্বা দাগ ফুটে রয়েছে গালে।

একটা একটা করে খুলে দুটো দুলই রানার বাড়ানো হাতে তুলে দিলো লিলি। দু'হাতের তালুতে নিয়ে আলাদাভাবে এক একটার ওজন অনুভব করলো রানা। ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়লো একটা। নিজেকে চড়াতে ইচ্ছে করলো ওর। আততায়ীরা প্রথমবার ব্যর্থ হবার পর সন্দেহবশতঃ রানা লিলির দুল জোড়া দেখতে চেয়েছিল। আকারে ওগুলো স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বড়, সেটাই ওর মনে সন্দেহ জাগিয়ে তোলে। হাতে নিয়ে দেখার সময় দুটোর মধ্যে একটাকে একটু বেশি ভারি মনে হয়, তাই শুধু সেটাকেই খুঁটিয়ে

পরীক্ষা করে রানা, এবং তুলটার ভেতর থেকে একটা মিনি স্লিপার বেরিয়ে আসে। স্লিপারটা বেরিয়ে আসার পর তুলটা অপরটার চেয়ে বেশি হালকা হয়ে গেল কিনা তা পরীক্ষা করে দেখেনি ও। অথচ দেখা উচিত ছিলো।

আজও ব্যর্থ হয়েছে আততায়ীরা। স্বভাবতই রানার মনে পুরনো প্রশ্নটা ফিরে এসেছে আবার—আততায়ীরা জানলো কিভাবে কোন্ হোটেলে উঠেছে ওরা? প্রথমবার স্লিপারের সাহায্যে জেনেছিল্। যদি বলা হয়, দ্বিতীয়বার তারা লিলিকে অনুসরণ করে রানার খোঁজ পেয়ে গিয়েছিল, তর্কের খাতিরে তা-ও নাহয় মেনে নেয়া যায়। কিন্তু আজ, তৃতীয়বার? শেরাটনের রেস্টুরেন্টে ঢুকে বসতে না বসতে এক লোকের হাত থেকে খুচরো পয়সা পড়ে যায়—সে-দিকে পিছন ফিরে থাকলেও সামনের দেয়ালে আয়না ছিলো, লোক-টাকে পরিষ্কার দেখতে পায় রানা। ফোন বুদে ঢুকে লোকটা কাকে যেন টেলিফোন করে। মাত্র দু'একটা কথা বলে বুদ থেকে বেরিয়ে আসে সে, বার কাউন্টারের গায়ে আবার হেলান দিয়ে দাঁড়ায়। রানা একটা সন্দেহের ওপর ভিত্তি করে লিলিকে তিনতলায় ওদের কামরায় যেতে বলে। লিলি রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে যেতেই লোকটা আবার ফোন্ বুদে ঢুকে কাকে যেন ফোন করে।

রানার ধারণা হয়, ওদের কামরায় ওত পেতে বসে আছে আত-তায়ী, ওর আর লিলির গতিবিধি সম্পর্কে ফোনে খবর পাঠাচ্ছে রেস্টুরেন্ট থেকে কালো হ্যাট। অমনি অভিনয় শুরু করে দেয় রানা। সিদ্ধান্ত নেয়, লিলির বদলে নিজেদের কামরায় সে নিজেই যাবে—আসলে যাবে না, যাবার ভান করবে।

ফাঁদ একটা আছে, এটা অনুমান করে প্রতিপক্ষদের জন্যে ফাঁদ

পাতে রানা। ওর ফাঁদে ধরা দিয়েছে প্রতিপক্ষ, নিজেদের একজনকে হারিয়েছে তারা। কিন্তু পুরনো প্রশ্নটার উত্তর ওকে জানতে হবে। আততায়ীরা জানলো কিভাবে কোথায় উঠেছে ওরা?

উত্তরটা কি হতে পারে আন্দাজ করতে পারলো রানা, সেজন্যেই নিজের ওপর রেগে গেছে ও। যে দুলটার ভেতর ব্লিপার ছিলো সেটা এখন সত্যি হালকা, কিন্তু অপরটা একটু বেশি ভারি। কিন্তু তা হওয়ার কথা নয়। কোনো ঘাপলা না থাকলে দুটোরই ওজন এক হওয়া দরকার।

হালকাটা আগেই পরীক্ষা করা হয়েছে, তবু আরেকবার পরীক্ষা করলো রানা। ক্ষুদে বোতাম টিপতে দু'ফাঁক হয়ে গেল দুল, কিন্তু ভেতরটা ফাঁকা। দ্বিতীয়টাতেও ক্ষুদে একটা লুকানো বোতাম রয়েছে। নখ দিয়ে চাপ দিতে এই দুলটাও দু'ফাঁক হলো, এবং ভেতর থেকে খসে পড়লো ছোট্ট একটা ব্লিপার। এটা আগেরটার চেয়েও ছোটো।

থমথমে চেহারা নিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে আছে লিলি।

মুখ তুললো রানা। 'কি বলবে জানি। কে. জি. বি. রেসিডেন্টের চাকরি করো, তার নির্দেশ ফেলতে পারোনি, এই তো?'

একটা ঢোক গিললো লিলি। মুখে কথা নেই। মনে মনে রানাকে আস্ত একটা গর্দভ ভাবছে সে।

'কিন্তু এটা কোনো যুক্তি নয়, লিলি,' বললো রানা। 'রেসিডেন্টকে অনেক কথা বলে এড়িয়ে যেতে পারতে তুমি। বলতে পারতে রবিন দুটো ব্লিপারই দেখে ফেলেছে।'

'তা পারতাম,' ফ্যাসফ্যাসে গলায় বললো লিলি। 'কিন্তু যদি বলি আমিও চেয়েছিলাম আমরা কোথায় যাই না যাই রেসিডেন্ট সব সময় জানুন? যদি বলি তোমাকে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি না?'

'বলতে হবে না, আমি জানি তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না,' তিক্ত একটু হাসলো রানা।

লিলির চোখ জোড়া সামান্য একটু বড় হলো। 'জানো ? তাহলে···তাহলে আমাকে তুমি সাথে রেখেছো কেন ? ইচ্ছে করলেই তো বিদায় করে দিতে পারতে।'

'পারতাম। কিন্তু দেইনি এই কারণে যে অদৃশ্য শত্রু আরো বেশি বিপজ্জনক!'

'কি!' প্রায় আঁতকে উঠলো লিলি। 'আমাকে তুমি শত্রু বললে?'

'নও ?' বিষণ্ণ হাসলো রানা। 'জানো সাথে স্লিপার রাখলে খুনীরা আমাকে খুন করার চেষ্টা করবে, তবু রেখেছো। জানো মস্কো আমার বিশ্বস্ততা যাচাই না করে পাঠায়নি, তবু তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারোনি। শত্রু নও তো কি?'

কষ্টার্জিত একটু হাসি ফুটলো লিলির ঠোঁটে। 'আমাকে নিয়ে খুব বিপদে পড়ে গেছো, তাই না ? শত্রু অথচ বিদায় করে দিতে পারছো না!' একটু থামলো সে, তারপর ফোঁস করে উঠলো, 'তুমি একটা একচোখো! স্লিপার সাথে রাখায় আমাকেও বারবার প্রাণ হারাবার ঝুঁকি নিতে হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছো না ? ভেবেছো ওটা আমি সাধ করে সাথে রেখেছি··· ?'

'এই না বললে···।'

'বলেছি বেশ করেছি!' দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠলো লিলি। ধরা গলায় বললো, 'বারবার তোমার কাছে ছোটো হতে হচ্ছে আমাকে—মেজাজ ঠিক রাখা সম্ভব ? রাগের মাথায় যা মুখে এসেছে তাই বলেছি···।'

'তারমানে আমার প্রথম অনুমানটাই ঠিক,' বললো রানা।

'রেসিডেন্টের নির্দেশ মানতে বাধ্য হয়েছো তুমি।' পকেট থেকে রুমাল বের করে লিলির কোলের ওপর ছুঁড়ে দিলো ও।

চোখ মুছতে মুছতে মাথা ঝাঁকালো লিলি।

'আর কোনো স্লিপার আছে তোমার সাথে?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

মাথা নাড়লো লিলি। 'তুমি জানো না, প্রথমবার আমাদের ওপর হামলা হবার পর রেসিডেন্টের সাথে ফোনে যোগাযোগ করেছিলাম আমি। তার লোকজনের মধ্যে গ্রু-র চর আছে এ-কথা বলেছি। দ্বিতীয় স্লিপারটা ফেলে দেয়ার অনুমতি চাই আমি তাঁর কাছে। কিন্তু তিনি আমাকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, দু'একদিনের মধ্যে গ্রুর চরকে খুঁজে বের করে ফেলবেন তিনি।'

রানা জানে কিছু কথা সত্যি বলছে লিলি, কিছু কথা ডাহা মিথ্যে, তবু সহাস্য বদনে সব হজম করলো ও। 'তাহলে দেখা যাচ্ছে তুমি নও, শত্রু আসলে রেসিডেন্ট।'

'তিনিও নন,' বললো লিলি। 'তিনি চেষ্টা করেছেন, কিন্তু গ্রু-র লোকটাকে চিনে বের করতে পারেননি। তাঁর উদ্দেশ্যটাকে খারাপ বলতে পারো না, আমাদের নিরাপত্তার জন্যেই আমরা কখন কোথায় থাকি না থাকি জানার ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি...।'

'কিন্তু আমি চেয়েছি আমরা কোথায় থাকবো বা কি করবো কেউ তা জানবে না,' ম্লান হাসলো রানা। 'মস্কো আমার এই শর্তে রাজি হয়েছিল। রেসিডেন্টের তা না জানার কথা নয়। তারমানে হেড-কোয়ার্টারের নির্দেশ মানছে না সে।'

'হয়তো মস্কো তোমাকে এক কথা বলেছে, রেসিডেন্টকে বলেছে অন্য কথা। তুমিও জানো, এসপিওনাজে মুখে যা বলা হয় কাজে

তা করা হয় না। এই পেশার এটাই দস্তুর।'

'কিন্তু আমি ভদ্রলোক। আর ভদ্রলোকের এক কথা।'

ভেজা ভেজা চোখ তুলে তাকালো লিলি। 'কি সেটা?'

'হেডকোয়ার্টার আমাকে একজন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট দিতে চাইলে এক শর্তে রাজি হই আমি,' বললো রানা। 'আমার আদেশ না মানলে তাকে আমি বিদায় করে দিতে পারবো।'

লিলির চেহারা থেকে সমস্ত রক্ত এক নিমেষে নেমে গেল। 'তার-মানে···তুমি···আমাকে···?'

'হ্যাঁ,' কঠিন সুরে বললো রানা। 'তোমাকে আমি বিদায় করে দিচ্ছি। ব্লিপারটা এখনো কাজ করছে, তারমানে গ্রু-র চর জানে কোথায় রয়েছি আমরা। তুমি কখন বেরিয়ে যাবে তার জন্যে অপেক্ষা করছি আমি। দশ মিনিট পর আমিও বেরিয়ে যাবো, অন্য কোনো হোটেলে উঠবো। সাবধান, পিছু নেয়ার চেষ্টা করো না। আর তোমার রেসিডেন্টকেও বলে দিয়ো, আমার ব্যাপারে নাক গলাতে চেষ্টা করলে তার পরিণতি ভালো হবে না।'

চেহারায় ব্যাকুলতা, খপ্ করে রানার হাত ধরার চেষ্টা করলো লিলি। 'রবিন···!'

স্যাৎ করে সরে গেল রানা, বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। দৃঢ় পায়ে দরজার সামনে চলে এলো ও। কবাট খুলে বললো, 'আমি অপেক্ষা করছি।'

আবার কিছু বলার জন্যে মুখ খুললো লিলি, কিন্তু রানার চোখে কাঠিন্য দেখে বুঝলো শতো অনুরোধেও কোনো লাভ হবে না আর। ধীরে ধীরে মাথা নিচু করে নিলো সে। স্থিরভাবে বসে থাকলো আরো কয়েক সেকেণ্ড। তারপর নিঃশব্দে নামলো বিছানা থেকে,

ক্লান্ত পায়ে দরজার দিকে এগোলো।

রানার সামনে থামলো লিলি। 'যাচ্ছি,' ফিসফিস করে বললো সে। 'কিন্তু যাবার আগে একটা কথা বলে যেতে দাও।'

রানা কঠিন। নির্বাক।

'একদিন হয়তো তুমি জানতে পারবে যে লিলি মেয়েটা ভালো ছিলো না,' শান্তভাবে বলার চেষ্টা করলেও, লিলির গলা কেঁপে গেল। 'কিন্তু জেনো, যাই সে করে থাকুক, কখনো তোমার অমঙ্গল চায়নি। ক'দিনেরই বা পরিচয়, তোমার সম্পর্কে কতোটুকুই বা জানি আমি—কিন্তু যতোটুকুই জেনেছি, শ্রদ্ধা করার জন্যে যথেষ্ট। নিজের রূপ-যৌবন নিয়ে বড় গর্ব ছিলো আমার, কিন্তু দেখলাম এমন পুরুষও দুনিয়ায় আছে পাশে শুয়েও আমার দিকে হাত না বাড়িয়ে থাকতে পারে।'

রানা নিরুত্তর।

'আরো কিছু কথা বলার ছিলো,' ঠোঁট কামড়ে বললো লিলি। 'বলতে গেলে কেঁদে ফেলবো, থাক...।' রানাকে পাশ কাটিয়ে ছুটলো লিলি। ডুঁকরে কেঁদে উঠে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

দুই

কেনেডি এয়ারপোর্টের দিকে ছুটছে ট্যাক্সি। সকালটা রোদ ঝলমলে। পিছনের সিটে হেলান দিয়ে ডেইলি নিউজ পড়ছে রানা। ড্রাইভারের পিছনে প্লাস্টিক প্যানেলটা সিলিং ছুঁয়ে রয়েছে, ওরা কথা বললেও লোকটা শুনতে পাবে না।

'এই ফ্যানাটিকদের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেছে মানুষ,' বিড়বিড় করে বললো রানা।

'কাদের কথা বলছো?' জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিলো লিলি, রানার দিকে ফিরে ওর কাঁধে চিবুক ঠেকালো, চোখ রাখলো খোলা কাগজটার ওপর। 'স্কাইজ্যাকার?'

'দেখো না,' বললো রানা, 'আবার একটা প্লেন হাইজ্যাক করেছে। তিনশো আরোহী জিম্মি, বাধা দিতে চেষ্টা করায় তিনজনকে গুলি করে মেরে ফেলেছে।'

'হ্যাঁ, আজকাল বড় বেশি প্লেন হাইজ্যাক হচ্ছে...।'

কাল রাতে সিঁড়ির মাথা থেকে লিলিকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল রানা। সত্যি সত্যি তাকে বিদায় করে দেয়ার কোনো ইচ্ছেই ওর

ছিলো না, তবে যেন বিদায় করে দিতে চায় এই অভিনয়টুকু করার দরকার ছিলো। তবু মনে মনে একটা কথা স্বীকার না করে পারেনি রানা—যদি সত্যি সত্যি লিলিকে বিদায় করে দেয়ার ইচ্ছেও ওর থাকতো, বিদায়-মুহূর্তে তার শেষ কথাগুলো শুনে নিশ্চয়ই সিদ্ধান্ত পাল্টাতে বাধ্য হতো ও। তার কথায় যে ভাব আর আবেগ প্রকাশ পেয়েছিল তাতে যে-কোনো পাষণ্ডেরও মন গলে যাবার কথা। লিলির মনের উপলব্ধি আর ভাবাবেগ তরল সোনার মতো চোখ আর মুখ বেয়ে ঝরে পড়তে দেখেছে রানা। চেহারা দেখে বোঝা না গেলেও, কামরা থেকে লিলি বেরিয়ে যাবার কয়েক সেকেণ্ড আগেই অস্থির হয়ে উঠেছিল রানা। তবু নিজেকে কঠোর শাসনে বেঁধে রাখে ও। লিলি সিঁড়ির মাথায় পৌঁছানোর আগে পিছু ডাকেনি।

লিলির শেষ কথাগুলো ভীষণভাবে স্পর্শ করেছিল রানাকে। লিলির হয়তো ধারণা, কথাগুলো পুরোপুরি অর্থ একা শুধু সে-ই জানে, রানা জানে না। কিন্তু লিলি যা বলতে চেয়েছে তার সবটুকু তো বুঝেছেই রানা, তারচেয়ে বেশি আন্দাজ করে নিয়েছে—সেজন্যেই মেয়েটার প্রতি নিজেও অনেকখানি দুর্বল হয়ে পড়েছে ও। এরকম একটা মেয়ের প্রতি কার না মমতা জাগে!

ট্যাক্সি ডেকে রাতেই ওরা হোটেল বদল করেছিল, তবে নতুন হোটেলে উঠেও কেউ ওরা ঘুমাতে পারেনি। কারণটা ভয় নয়, অন্য কিছু। প্রেমের লেন-দেন একবার শুরু হলে কারই বা সময়-জ্ঞান থাকে!

'আমি শুধু প্লেন-হাইজ্যাকারদের কথা বলছি না!' লিলির মনে হলো রেগে গেছে রানা। 'বলছি টেররোরিস্টদের কথা! সারা দুনিয়া

জুড়েই এমন বাড়াবাড়ি শুরু করেছে ওরা, গুরুতর একটা আন্তর্জাতিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।' লিলিকে বলার উপায় নেই, আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে সদ্য গঠিত একটা অ্যান্টি টেরোরিজম অর্গানাইজেশনে যোগ দিয়েছে রানা অল্প কিছু দিন হলো। 'বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের কিছু দেশ সন্ত্রাসবাদকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। এর পরিণতি যে ভয়াবহ, বুঝেও কেউ তা বুঝতে চাইছে না। আমার তো সন্দেহ হয়, টেরোরিস্টদের দমন করতে না পারলে ওরাই একদিন বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়ে দেবে।'

'তোমার ডালচিমস্কিও কি সে-ধরনের একজন টেরোরিস্ট?' হঠাৎ জানতে চাইলো লিলি।

'অফকোর্স!' মুঠো পাকালো রানা। 'লোকটাকে ধরতে পারলে এমন শাস্তি দেবো যে...।'

তাড়াতাড়ি মুখে হাতচাপা দিলো লিলি, কিন্তু তাতেও হাসির শব্দ আটকানো গেল না। রানা ওর দিকে কটমট করে তাকাতে বললো, 'সরি। হাসি পেলো এই জন্যে যে...।'

'জানি,' ম্লান মুখে বললো রানা। 'কোথায় সে তা-ই আজ পর্যন্ত জানতে পারলাম না, অথচ শাস্তি দেয়ার কথা ভাবছি, হাসি তো পাবেই। কে জানে, হয়তো ব্যর্থ হয়েই ফিরে যেতে হবে...।'

চিংড়ি মাছের মতো ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে রানার বুকের ওপর পড়লো লিলি। বোতাম খোলা জ্যাকেটের ভেতর হাত গলিয়ে শার্টের বোতাম খুলতে শুরু করলো। 'এতোক্ষণে একটা কাজ পেলাম!'

'মানে?'

'আমার ওপর নির্দেশ আছে, তোমাকে সব সময় হাসি-খুশি

রাখতে হবে,' শার্টের বোতাম খুলে রানার লোমশ বুকে মুখ ঘষলো লিলি। 'তোমাকে উৎসাহ আর প্রেরণা যোগানো আমার প্রথম দায়িত্ব।'

গম্ভীর হলো রানা। 'খুবই পবিত্র দায়িত্ব, সন্দেহ নেই। কিন্তু শার্ট আর ট্রাউজারের বোতাম এক নয়, এটা আগে বুঝতে হবে তোমাকে।'

মুহূর্তের জন্যে স্থির হয়ে গেল লিলি, তারপরই অদম্য হাসিতে কেঁপে উঠলো তার সারা শরীর। 'কি অসভ্য রে বাবা!'

ইউনাইটেড এয়ার ট্রাভেলস-এর অফিস থেকে টিকেট সংগ্রহ করলো ওরা। ওদের নির্দেশে এরপর সরাসরি ইউনাইটেডের নিজস্ব টার্মিনালের সামনে চলে এলো ড্রাইভার। এয়ারপোর্টে আসার পথে নো রিস্ক সেফ ডিপোজিট কোম্পানীর বক্স থেকে লম্বা একটা কেস ছাড়িয়েছে রানা। নিগ্রো পোর্টার সেটার দিকে কেমন সন্দেহের চোখে তাকালো, কিন্তু কোনো প্রশ্ন করলো না। প্রশ্ন করলো শ্বেতাঙ্গ টিকেট ক্লার্ক।

'হ্যাঁ, এটা একটা রাইফেল,' বললো রানা। 'হান্টিং রাইফেল। চেক করিয়ে নিয়ে যেতে পারবো কি?'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো ক্লার্ক।

'খুব দামী জিনিস, কাজেই সাবধানে নাড়াচাড়া করবেন, তা না হলে ইন্সুরেন্স আপনাদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ চেয়ে বসবে,' সাবধান করে দিলো রানা।

'অফকোর্স, স্যার,' সবিনয়ে বললো টিকেট ক্লার্ক। 'এবার আপনাদের সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট জেনে নিন। বলেছিলেন স্মোক করবেন, তাই না? তাহলে নাইন-এ আর বি। হ্যাভ এ গুড ফ্লাইট, স্যার।'

কিন্তু ঝামেলা এখানেই শেষ হলো না। রানা আর লিলির মতো রেডিওতে পাসপোর্ট অফিসাররাও হোটেল শেরাটনের ঘটনাটা শুনেছে। একজন মানুষ খুন হয়েছে ওখানে। খুনী পালিয়েছে। এবং হোটেল থেকে অদৃশ্য হয়েছে একটা দম্পতি। চেহারার বর্ণনা জানিয়ে তাদের সতর্ক করে দিয়েছে পুলিশ আর এফ. বি. আই.। রানার মতো লিলির চেহারাও আজ সকালে বদল হয়েছে, চেহারার সাথে পাসপোর্টের ফটো হুবহু মিলে গেল।

কিন্তু কাস্টমস চেকিঙের সময় আটকে গেল ওরা। গেট দিয়ে ঢোকার সময়ই মেটাল ডিটেকটর ফাঁস করে দিলো রানার সাথে পয়েন্ট টু টু রয়েছে।

'টার্গেট পিস্তল, আনলোডেড,' ব্যাখ্যা করলো রানা।

'সরি, মিঃ প্লেয়ার। অ্যাটাচি কেসে করে ওটা আপনি নিয়ে যেতে পারবেন না।' ইউনিফর্ম পরা অফিসার মাথা নাড়লো। 'এফ. এ. এ. রুলসে নিষেধ আছে। গন্তব্যে পৌঁছে ওটা আপনি ফেরত পাবেন।'

কোনো মন্তব্য না করে কাঁধ ঝাঁকালো রানা। অ্যাটাচি কেস খুলে বের করে দিলো পিস্তলটা।

'ধন্যবাদ, এবার আপনারা যেতে পারেন।'

ওদের বাহন ডিসি-৮, ফার্স্ট ক্লাস কমপার্টমেণ্ট অর্ধেকও ভরেনি। সোনালি ডানার চিলের মতো সাবলীল ভঙ্গিতে কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সময়ে টেক-অফ করলো, নিখুঁত দাড়ি কামানো পাইলটের রয়েছে বিশ হাজার ঘণ্টা প্লেন চালাবার অভিজ্ঞতা। শুধু ফার্স্ট ক্লাস কমপার্টমেণ্টেই মেদহীন চারজন স্টুয়ার্ডেসকে দেখা গেল, হাতে হাতে দিয়ে গেল তাজা ফুল আর কানে কানে মধুঝরা হাসি, উপরি

পাওনা হাঁটু পর্যন্ত অনাবৃত সুগঠিত পায়ের প্রদর্শনী। দিক বদল করে গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা হলো ডগলাস জেট, মাটি ছাড়ার নয় মিনিট পর পরিবেশিত হলো বিনা পয়সায় আরোহীদের পছন্দ মতো পানীয়।

কি যেন ভাবছে রানা।

'পেনি ফর ইওর থটস।' লিলি হাসছে না।

মাথা নাড়লো রানা। 'যতো কম জানবে ততোই তোমার জন্যে ভালো। ভিলেন টাইপের কেউ যদি তোমাকে জেরা করে, তুমি কিছু না জানলে আমি নিরাপদে থাকবো।'

শ্যাম্পেনের গ্লাসে চুমুক দিলো লিলি। 'কেন, ভিলেনরা কেউ আমাকে জেরা করবে কেন?'

'কারণ ভিলেনদের স্বভাবই তাই।'

সময়মতো লাঞ্চ দিয়ে গেল স্টুয়ার্ডেস। একাধিক ভি. সি. আর. চালু রয়েছে। হেডসেট আর ইয়ার প্ল্যাগও আছে, পাঁচটা চ্যানেলের যে-কোনো একটার সঙ্গীতানুষ্ঠান শোনা যেতে পারে।

'আরো ব্র্যাণ্ডি দেই?' সোনালি চুলের স্টুয়ার্ডেস জিজ্ঞেস করলো।

নিজের অজান্তেই ভুরু কুঁচকে উঠলো লিলির। 'না, লাগবে না।'

কিন্তু প্রশ্নটা করা হয়েছে রানাকে। ওর কাছ থেকে উত্তর পাবার আশায় একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়েই থাকলো স্টুয়ার্ডেস। খানিক আগেই লক্ষ্য করছে লিলি, বেহায়ার মতো বারবার শুধু রবিনের দিকেই তাকাচ্ছে মেয়েটা।

আবার জিজ্ঞেস করলো স্টুয়ার্ডেস, 'মিঃ প্লেয়ার, মোর ব্র্যাণ্ডি?'

রানার শুনতে পাবার কথা নয়, হেডসেট পরে রয়েছে। লিলি আবার কিছু বলতে যাচ্ছিলো, কিন্তু স্টুয়ার্ডেসকে হাত বাড়াতে দেখে কেমন বিহ্বল হয়ে পড়লো সে।

রানার মাথা থেকে আলগোছে হেডসটটা খুলে নিলো স্টুয়ার্ডেস, মুখে মুক্তো ঝরা হাসি, চোখে কৌতুক মেশানো দুষ্টামির ভাব। প্রশ্নটা আবার করলো সে।

লিলির দিকে তাকালো রানা। 'তুমি কি বলো, হানি?'

'মাত্র তিনটে বাজে, আর তোমাকে খেতে দেবো না,' প্রয়োজনের চেয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বললো লিলি। ভুলেও স্টুয়ার্ডেসের দিকে তাকালো না। রানার কাঁধে মাথা রাখলো সে। 'ঘুম পাবে।'

স্টুয়ার্ডেসের দিকে ফিরে অসহায় ভঙ্গিতে মুক্ত কাঁধটা ঝাঁকালো রানা।

স্টুয়ার্ডেস চলে যেতে রানার কাঁধ থেকে মাথা তুলে সাপের মতো হিস হিস করে উঠলো লিলি, 'ডাইনী!'

'আত্মসমালোচনা ভালো জিনিস,' সহাস্যে বললো রানা। 'কিন্তু সেটা মনে মনে করা উচিত।'

'কে বললো আত্মসমালোচনা করছি?' ফোঁস করে উঠলো লিলি। 'গাল দিচ্ছি ওকে!'

'কেন, কেন?' অবাক হবার ভান করলো রানা।

'বেহায়া, এক নম্বর ছোটোলোক, আস্ত একটা ডাইনী! এমন-ভাবে তাকাচ্ছিল, যেন তোমাকে গিলে খাবে!'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো রানা। তারপর লিলির দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, 'আকাশের কতোটা ওপরে উঠেছি বলতে পারবে? বেহেশতের কাছাকাছি চলে আসিনি তো?'

কোথায় গেল ঈর্ষা, খিল খিল করে হেসে উঠলো লিলি। তারপর ফিসফিস করে বললো, 'তুমি একজন কমিউনিস্ট হয়ে এ-সব রাবিশ বিশ্বাস করো—দোজখ, বেহেশত ?'

'ভয়ে বলবো নাকি নির্ভয়ে ?'

'নির্ভয়ে।'

রানার সংক্ষিপ্ত উত্তর, 'করি।'

'তুমি ? একজন কমিউনিস্ট ?' হাঁ হয়ে গেল লিলি। 'ওহ্, গড !'

পরস্পরের দিকে তাকালো ওরা, একসাথে সশব্দে হেসে উঠলো।

তারপর রানা বললো, 'ধর্মের চেয়ে জোরালো আফিম আর হয় না।'

'ধর্মের কথা বাদ দাও,' বললো লিলি। 'তোমার কথা বলো। আমি তোমাকে বুঝতে চাই।'

'আমি কর্মে বিশ্বাসী, আবার আমি ভোগীও,' বললো রানা। 'আমার ভেতর ভালো কাজ করার প্রবণতা জন্মগত, প্রবণতাটা কিছু পাবার আশার মুখাপেক্ষী নয়। আমার ভেতর ধ্বংসের বীজও লুকিয়ে আছে, ধ্বংস আমি করিও, তবে বিবেকের নির্দেশে ন্যায়ের স্বার্থে ধ্বংস করি। মানুষ হয়ে জন্মেছি সেজন্যে নিজেকে ভাগ্যবান বলে জানি, সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু ত্রুটিহীন, আদর্শ মানুষ আমি কোনো দিনও হতে পারবো না, কারো পক্ষেই হওয়া সম্ভব নয়—সেজন্যে আমার ক্ষোভ আর যন্ত্রণার শেষ নেই···।'

'তুমি ভোগী, এই কথাটা কিভাবে ব্যাখ্যা করবে ?' মনোযোগী ছাত্রীর মতো গালে হাত দিয়ে একদৃষ্টে রানার দিকে তাকিয়ে আছে লিলি।

‘সমস্ত সৌন্দর্যের মধ্যে আমি মহান এক শিল্পীর সৌন্দর্যবোধ উপলব্ধি করতে পারি,’ বললো রানা। ‘অপূর্ব সুন্দর যে-কোনো জিনিস আমাকে আলোড়িত এবং মুগ্ধ করে, শ্রদ্ধায় সেই শিল্পীর প্রতি নত হয়ে আসে আমার মাথা, কৃতজ্ঞতায় ছেয়ে যায় অন্তর। নগণ্য আমি, কিন্তু ভাগ্যবান, এই অনুভূতি গ্রাস করে আমাকে। নারীদেহ সেই মহান শিল্পীর এক মহৎ সৃষ্টি।’ ওর চোখের তারায় ঝিক্ করে উঠলো দুষ্টামি। ‘আমি সেই মহৎ সৃষ্টির একজন সমঝদার হবার চেষ্টায় থাকি।’

‘সোজা কথায়, আমি তাহলে একটা শিল্প?’ আগ্রহের সাথে জিজ্ঞেস করলো লিলি। ধীরে ধীরে রানার কাঁধে হাত রাখলো সে। দু’জন দু’জনের চোখে তাকিয়ে আছে। ‘তাহলে বলো, আমি কেমন শিল্প?’

‘খুবই উঁচুদরের শিল্পকর্ম,’ শিল্প সমালোচকের মতো গম্ভীর ভাবে মাথা ঝাঁকালো রানা। ‘যদি লজ্জা না পাও তাহলে ব্যাখ্যা করতে পারি। প্রথমে ধরা যাক তোমার বুকের গঠন…।’

দাঁত দিয়ে জিভের ডগা কেটে রানার মুখে হাতচাপা দিলো লিলি। ‘পাগল নাকি! মুখে একটু লাগাম নেই!’ হঠাৎ প্রায় আঁতকে উঠলো সে। ‘বলে কি, কতোক্ষণ হুঁশ ছিলো না আমাদের?’

লিলির দৃষ্টি অনুসরণ করে সামনের দেয়ালের দিকে তাকালো রানা। লাল হরফে কয়েকটা আলোকিত লেখা ফুটে উঠেছে বোর্ডে—সিট বেল্ট বেঁধে নিন। এখন থেকে আর সিগারেট খাওয়া যাবে না। আমরা লাস ভেগাসে ল্যাণ্ড করতে যাচ্ছি। ইত্যাদি।

একটু পরই স্পীকার জ্যান্ত হয়ে উঠলো।

প্লেন থেকে যেন গরম তন্দুরে নেমে এলো ওরা। ছায়ায় সাতাশি

ডিগ্রী টেমপারেচার। বহুদূর পর্যন্ত কোনো ছায়া নেই। হিম টার্মিনাল ভবনে ঢুকে হাঁফ ছাড়লো ওরা। চারদিকে নারী-পুরুষের ভিড়, কিন্তু শুধু মেয়েদের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো লিলি। 'একি, রবিন!'

'আগে বোধহয় লাস ভেগাসে আসোনি তুমি, তাই না?' সকৌতুকে জিজ্ঞেস করলো রানা। 'আমার কথা বিশ্বাস হলো এবার? নারীদেহ মহান এক শিল্পীর মহৎ এক শিল্প, কথাটা লাস ভেগাসের মেয়েদের চেয়ে ভালোভাবে আর কেউ জানে না।'

'নিশ্চয়ই ট্রেনিং নিয়েছে ওরা,' বিহ্বল ভাবটা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারছে না লিলি। 'চর্চা না করলে এ কসরত দেখানো অসম্ভব।'

'সোফিয়া লরেনের মতো? দু'দিকে সার সার টুলের ওপর ফুটবল রাখা থাকতো, মাঝখান দিয়ে হেঁটে যাবার সময় কোমর ঝাঁকিয়ে বলগুলোকে টুলের মাথা থেকে ফেলে দিতো—নিতম্বে ঢেউ তোলা এভাবে শেখে সে।'

শুধু নিতম্বের ঢেউ নয়, চারদিক থেকে ক্লিক ক্লিক শব্দেও অস্থির হয়ে উঠলো লিলি। রানার পিছু নিয়ে বারবার ডানে বায়ে ঘাড় ফেরাতে হলো তাকে। জিজ্ঞেস করলো, 'সব্বাই এখানে জুয়াড়ি নাকি?'

স্লট মেশিনগুলোকে একবার দেখে নিলো রানা। প্রতিটি মেশিন গোগ্রাসে খুচরো পয়সা গিলছে। 'এদের তুমি ঠিক জুয়াড়ি বলতে পারো না—ক্ষ্যাপাটে বলতে পারো। লাস ভেগাসে এদের সংখ্যাই বেশি। কে কতো তাড়াতাড়ি পকেট হালকা বা ভারি করতে পারে তারই প্রতিযোগিতায় মেতে আছে সবাই। সত্যিকার জুয়াড়িও

আছে, তবে সংখ্যায় তারা কম।' রানা ব্যাখ্যা করলো, সময়টা হপ্তার মাঝামাঝি, লাস ভেগাসে এখন শুধু সেমিনার অনুষ্ঠানের ধুম লেগে থাকবে। জুয়াড়িরা আসতে শুরু করবে শুক্রবার থেকে, সোমবার সকাল পর্যন্ত থাকবে তারা। মঙ্গল, বুধ, আর বৃহস্পতি, এই তিন দিন লাস ভেগাসের হোটেলগুলো কম পয়সায় জুয়া খেলার সুযোগ করে দেয়, তা না হলে সেমিনারে যারা আসে তারা খেলবে না।

ভেগাসে ছাব্বিশ হাজার হোটেল আর মোটেল রুম রয়েছে। তিন লাখ ধর্মভীরু মানুষ স্থায়ীভাবে বাস করে এখানে, ভীতি প্রকাশের জন্যে একশো তেতাল্লিশটা চার্চ ব্যবহার করা হয়। গেমিং টেবিলের সংখ্যা এক হাজার, ষোলো হাজারের কিছু বেশি স্লট মেশিন, এয়ারপোর্টেরগুলো সহ।

শুধু এম. জি. এম. গ্র্যাণ্ড হোটেলেই রয়েছে একুশ শো কামরা, হোটেলটার আকার-আকৃতি আর জৌলুসের সাথে তুলনা করলে তাজমহলকে মনে হবে পুতুল-ঘর! বারোটা সুইমিং পুল, বত্রিশটা রেস্তোরাঁ, আঠারোটা ডান্স ফ্লোর, ক্ষুদ্রতম পোশাক পরা সুন্দরতম ক্যাবারে নর্তকীদের সংখ্যা কয়েক শো, পাঁচশোর বেশি রুলেৎ টেবিল, এগারোটা টেনিস কোর্ট, দুটো খেলার মাঠ—তালিকা বাড়তেই থাকবে।

দুটো হিলটন রয়েছে ভেগাসে, বড়টায় কামরা রয়েছে দেড় হাজার। সার্কাস সার্কাস নামে একটা সার্কাস পার্টি আছে, টিকেট কেটে যে-কেউ তাদের চারশো পঁচিশটা কামরার যে-কোনো একটায় ঢুকে বন্য, পোষ মানানো পশুদের কাছাকাছি থেকে দেখতে পারে। নামকরা হোটেল, যেমন স্যাণ্ডস, কাইজার'স প্যালেস, রিভারিয়া

থাণ্ডারবার্ড এবং ট্রপিকানা-র রয়েছে নিজস্ব ক্যাসিনো। হোটেলের খদ্দের বা ক্যাসিনোর জুয়াড়ি নিঃসঙ্গ বোধ করলে কর্তৃপক্ষ কোনো আলাদা পয়সা ছাড়াই মনোলোভা সঙ্গিনী জুটিয়ে দেবে।

'তারমানে গোটা ব্যাপারটা সেক্স-কেন্দ্রিক!' মন্তব্য করলো লিলি।

'সেক্সের কথা কখন বললাম! আমি টাকার কথা বলছিলাম!'

'বাট মানি ইজ সেক্স, রবিন!'

'ইউ আর ব্যানানা। মানি ইজ পাওয়ার,' দৃঢ় কণ্ঠে ভুলটা শুধরে দিলো রানা।

'ওই একই হলো। মানি ইজ পাওয়ার ইজ সেক্স, হুইচ এক্স-প্লেইনস ক্যাপিটালিজম।'

টার্মিনাল ভবন থেকে বেরিয়ে এসে ট্যাক্সি নিলো ওরা। আলো-চনা থেমে নেই।

রানা বললো, 'বলতে চাইছো ধনীরা টাকার পাহাড় গড়ছে, আর প্রসেসটাই এমন যে তাতে করে গরীবদের শোষিত না হয়ে উপায় নেই?'

'একটু বেশি সহজ করে দেখছো ব্যাপারটাকে, তবে ঠিক লাইনে এগোচ্ছো। বলতে গেলে তুমি নিজেও এক ধরনের ক্যাপিটা-লিস্ট।'

'আমি?'

'এক অর্থে। তুমি ভালোভাবে বেঁচে আছো, তারমানেই কেউ বঞ্চিত হচ্ছে। বিশদ জিজ্ঞেস করো না, কারণ সোশিওলজিতে ভর্তি হয়েও মাত্র এক সেমিস্টারের বেশি টিকতে পারিনি।'

ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলো ড্রাইভার, 'কোথায় যাবেন, স্যার?'

'নিস শ্যাতো,' বললো রানা।

'কোথায় ওটা, রবিন?'

'স্ট্রিপ।'

'ট্যাক্সিতে?'

হাসলো রানা। 'হোটেলটা স্ট্রিপে। রুট নাইনটি-ওয়ান, সব-গুলো ভালো হোটেল এক সারিতে দেখতে পাবে তুমি। জায়গাটার নাম স্ট্রিপ।'

'সুন্দর?'

'ভেগাস সুন্দর। কিন্তু সবই চড়া দাম দিয়ে কিনতে হয়। সুন্দর এবং দামী।'

সুন্দর যে তার কিছুটা আভাস পাওয়া গেল নিয়ন সাইনগুলো দেখে। এখনো সন্ধ্যে হয়নি, শহর এখনো এক মাইল দূরে, অথচ রঙচঙে অক্ষরগুলো এক একটা এতো বড় যে পরিষ্কার পড়া গেল। একদিকের গোটা আকাশকে যেন আলোক সজ্জায় সাজানো হয়েছে।

কথা বলছে বটে, কিন্তু কাজের কথা সারাক্ষণই ভাবছে রানা। কে. জি. বি. হেডকোয়ার্টার থেকে শেষ মেসেজটায় বলা হয়েছে, তাড়াতাড়ি করুন। তা না হলে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড শুরু হয়ে যাবে।

কিন্তু বললেই তো তাড়াতাড়ি করা যায় না। ব্যাপক হত্যাকাণ্ড বলতে ওরা বোঝাতে চেয়েছে একশো ছত্রিশজন টেলি-বোমাকে খতম করতে আসছে গ্রুপ। মূল অ্যাসাইনমেন্টের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। ডালচিমস্কিকে খুঁজে বের করবে রানা, নাকি গ্রুপের কমাণ্ডো গ্রুপগুলোকে ঠেকাবে?

দুটোই জরুরী। তবে দ্বিতীয় কাজটা এফ. বি. আই.-কে দিয়ে

করানো যায়। কিংবা আর কাউকে দিয়ে।

মস্কো তো তাগাদা দেবেই। ওরাও বুঝতে পারছে, কাজ মোটেও এগোচ্ছে না। বুঝতে পারছে, আমেরিকায় পৌঁছে মাছি মারছে মাসুদ রানা। অথচ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঠেকাবার দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছে ওকে।

এলোমেলো হয়ে গেল রানার চিন্তা ভাবনা।

যদি সফল হই? ডালচিমস্কিকে যদি ধরতে পারি? তাহলে আমার নোবেল প্রাইজ পাওয়া উচিত। কিন্তু কপালে সম্ভবত একটা বুলেট জুটবে—হয় এদের, নাহয় ওদের।

একটা ফুয়েল স্টেশনের পাশে ড্রাইভারকে থামতে বললো রানা। গাড়ি থেকে নেমে যাচ্ছে, লিলি জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় যাচ্ছো?'

'এফ. বি. আই.-কে ফোন করতে,' বলে হন হন করে এগোলো রানা। সোজা গিয়ে ঢুকলো ফোন বুদে।

দু'দিন পরের ঘটনা। ভোর সাড়ে তিনটে। লাস ভেগাস এয়ারপোর্ট।

ঝকঝকে তিনটে মার্সিডিজে চড়ে এলো ওরা। সবার একই পোশাক—কালো স্যুট, সাদা টাই, কালো হ্যাট। গাড়ি থেকে নেমে চারদিকে এমনভাবে তাকালো, যেন পরস্পরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন নয়। একটু খেয়াল করতেই গেটের গার্ড টের পেয়ে গেল, প্রত্যেকে ওরা স্যুটের নিচে শোল্ডার হোলস্টার পরে আছে। টুল ছেড়ে উঠলো না সে, তবে আস্তে করে হাত বাড়িয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা কারবাইনটা ধরলো। গুণলো সে, বারো জন

লোক। কিন্তু এগিয়ে এলো মাত্র দু'জন। হাঁটার ভঙ্গিতেই গন্ধ পাওয়া যায় এফ. বি. আই.-এর, পা ফেলার সাথে তাল মেলাচ্ছে না হাতগুলো, শরীরের কাছ থেকে একটু দূরে আড়ষ্ট ভাবে ঝুলে আছে, সামান্য বাঁকা হয়ে।

কারবাইনটা কোলের ওপর তুললো গার্ড। এই গেট দিয়ে শুধু টারমাকে ঢোকা যায়। এয়ারপোর্ট অফিসাররা ছাড়া আর কারো ঢোকার অনুমতি নেই, তাদের সবার কাছে পাস থাকে।

টুল ছাড়লো গার্ড। কারবাইনটা লোক দু'জনের দিকে তাক করলো। প্রাক্তন সৈনিক সে, বোকার মতো ঝুঁকি নিতে অভ্যস্ত নয়।

ছ'ফুট লম্বা লোক দু'জন তিন হাত দূরে থামলো। 'টু ফাইভ থ্রি, ওয়ান নাইন জিরো ফোর থ্রি,' মার্জিত কিন্তু ভারি কণ্ঠস্বর, দু'জনের একজন বললো গার্ডকে। 'কার নম্বর?'

'সিকিউরিটি চীফ বনি ওয়ার্ডারের,' বললো গার্ড।

দ্বিতীয় লোকটা পকেট থেকে দুটো কাগজ বের করলো। একটা পরিচয়-পত্র, অপরটা প্যাডে লেখা নির্দেশ। প্রথমে সে প্যাডের কাগজটা দিলো গার্ডকে। 'পড়ুন।'

টাইপ করা নির্দেশ, তবে সিকিউরিটি চীফের সইটা চিনতে পারলো গার্ড। পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছে, টেরোরিস্টদের দুটো গ্রুপকে গ্রেফতার করার জন্যে এফ. বি. আই. অফিসারদের বারো জন সদস্য এয়ারপোর্টে যাচ্ছে। তাদের সাথে সম্ভাব্য সব রকম সহযোগিতা করতে হবে।

গার্ড মুখ তুলতেই তার হাতে গুঁজে দেয়া হলো আইডেনটিটি কার্ড।

কার্ডে চোখ বুলিয়ে মাথা ঝাঁকালো গার্ড।

তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'সবার কার্ড দেখাতে হবে?'

দ্রুত মাথা নাড়লো গার্ড। 'তার কোনো দরকার নেই, স্যার। বলুন কি করতে হবে আমাকে।'

'গ্রুপ দুটোকে টারমাক থেকে গ্রেফতার করবো আমরা,' এফ. বি. আই. অফিসারদের একজন কার্ডটা ফেরত নিয়ে বললো। 'টার্মিনাল ভবনে ঢোকার ঠিক আগের মুহূর্তে। টের পেয়ে যদি বাধা দিতে চেষ্টা করে, ওখানে নিরীহ লোকদের আহত হবার সম্ভাবনা কম। দু'বারই আমরা এই গেট ব্যবহার করবো। আপনার একমাত্র কাজ এ-ব্যাপারে কাউকে কিছু না বলা।'

'কোনো প্রশ্ন থাকলে টু ফাইভ থ্রি, ওয়ান নাইন জিরো থ্রি-তে ফোন করে জেনে নিন,' বললো দ্বিতীয় লোকটা।

এক সেকেণ্ড ইতস্তত করলো গার্ড। তারপর ঘন ঘন মাথা নাড়লো সে। ফোন সে করবে, তবে এদের সামনে নয়। 'এখুনি ঢুকতে চান আপনারা? ক'জন?'

দু'জনের একজন কোটের আস্তিন সরিয়ে হাতঘড়ি দেখলো। 'হ্যাঁ, এখুনি। মেক্সিকো ফ্লাইট ল্যাণ্ড করতে আর সাত মিনিট বাকি। আটজন।'

'ঠিক, আছে,' বলে গেট খুলে দিলো গার্ড।

তিনটে গাড়িতে চারজন লোক থেকে গেল, বাকি আটজন গেট পেরিয়ে টারমাকে ঢুকলো। রানওয়ের দিকে খানিকটা এগিয়ে অন্ধকারে হারিয়ে গেল তারা।

কিছুক্ষণ টুলে বসে থাকার পর গেট হাউসে ঢুকলো গার্ড। একটা সিগারেট ধরিয়ে জানালার পর্দা আধ ইঞ্চি সরালো। মার্সিডিজগুলো

থেকে কেউ এদিকে আসছে না। ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করলো সে।

অপরপ্রান্তে বেল বাজছে, কিন্তু রিসিভার তুলছে না কেউ। পাঁচ-বার, ছয়বার। কানেকশন কেটে দিয়ে আবার ডায়াল করলো গার্ড। চারবার, পাঁচবার বেল বাজলো। তারপর রিসিভার তুললো কেউ। ঘুম জড়ানো, ভারি, তিক্ত কণ্ঠস্বর, 'কোন্ বেআক্কেল!'

'স্যার, সাউথ গেট-বি থেকে আমি···।'

'হ্যাঁ, জনসন দ্য ইডিয়ট। কি চাই তোমার?'

'স্যার, আপনার সই করা নির্দেশ নিয়ে বারো জন এফ. বি. আই. এজেন্ট···।'

'জানি। কি হয়েছে তাই বলো!' ভারি কণ্ঠস্বর হঠাৎ খাদে নামলো। 'তোমার সাথে প্যাচাল পাড়তে গিয়ে মিসেসের যদি ঘুম ভেঙে যায়, আস্ত রাখবে না!'

ফিক্ করে হেসে ফেললো গার্ড জনসন। 'কিছু হয়নি, স্যার। জানতে চাইছিলাম···।'

'জানি কি জানতে চাইছো। ওদের সাথে সহযোগিতা করবে কিনা। কোরো না।'

'স্যার! কি বললেন, স্যার?'

'সহযোগিতা কোরো না। তাহলে তোমার মতো ইডিয়টের চাকরি খাওয়ার একটা অজুহাত তৈরি হবে। বেশি করে ঘাড়তেড়ামি কোরো, তাহলে নিজের সাথে আমারও বারোটা বাজাতে পারবে। যত্তোসব!' যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

আপনমনে হাসতে লাগলো গার্ড। একটা গোপন কথা জানা গেল আজ। অমন রগচটা বস, তিনি-ও কিনা বউকে যমের মতো

ভয় করেন !

নয় মিনিট পর, দু'মিনিট দেরি করে ল্যাণ্ড করলো মেক্সিকো ফ্লাইট। পাসপোর্ট আর কাস্টম্‌স্‌ চেকিঙের ঝামেলা চুকিয়ে একশো বাইশ জন আরোহী এক এক করে বেরিয়ে এলো শেড থেকে, সোজা টার্মিনাল ভবনের দিকে এগিয়ে আসছে তারা।

আটজন এফ. বি. আই. এজেন্ট দু'সারিতে দাঁড়ালো, চারজন চারজন করে। আরোহীদের কেউ কোনো নির্দেশ দেয়নি, তবু সারি দুটোর মাঝখানটাকে গলি ধরে নিয়ে এক এক করে সবাই ঢুকলো সেটার ভেতর, একদিক দিয়ে ঢুকছে এবং অপর দিক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। মানুষের এ এক অদ্ভুত প্রবণতা, একজন কিছু করলে সবাই তাকে অনুসরণ করে।

গ্রুর চারজন কমাণ্ডো আছে আরোহীদের মধ্যে। একশো বাইশ-জনের মধ্যে থেকে তাদের চিনে বের করতে হবে। তারা কে কেমন দেখতে বা কে কি পরে থাকবে জানা নেই। তারা আসছে শুধু এই তথ্যটাই জানানো হয়েছে টেলিফোন করে। তবে আটজনের মধ্যে সাতজন ব্যাপারটা নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তায় ভুগছে না। তারা জানে, শেষ অর্থাৎ অষ্টম ব্যক্তি কমাণ্ডো চারজনকে দেখিয়ে দেবে। ওদের কেউ নয় সে, মাত্র আধ ঘণ্টা আগে টার্মিনাল ভবন থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাকে। কমাণ্ডো চারজনকে রিসিভ করে নিয়ে যাবার জন্যে একটু আগেভাগেই এয়ারপোর্টে পৌঁচেছিল বেচারা।

কিছুটা ভাগ্য, বাকিটা দূরদৃষ্টির কল্যাণে লোকটাকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়েছে। কমাণ্ডো দলটাকে রিসিভ করার জন্যে কেউ না কেউ আসবে, এই ধারণা থেকেই টার্মিনালে লোক রাখা হয়েছিল। আগের দিন পাওয়া একটা তথ্য অবশ্য উৎসাহিত করে ওদেরকে।

কাল ওরা হোটেলগুলোয় খবর নেয়, কোথাও চারজনের জন্যে কামরা রিজার্ভ করা হয়েছে কিনা। প্রথমে নামকরা হোটেলগুলোর সাথে যোগাযোগ করে ওরা। বেশি খাটতে হয়নি, পিকানা-র সাথে যোগাযোগ করতেই রিসেপশন থেকে জানানো হলো, হ্যাঁ, এক ভদ্রলোক সশরীরে এসে চারজনের জন্যে চারটে কামরা রিজার্ভ করে গেছেন, তাঁরা আগামী কাল ভোর তিনটে চল্লিশ মিনিটের মেক্সিকো ফ্লাইটে ভেগাসে আসছেন। এফ. বি. আই. কার্ড দেখানোর পর লোকটার চেহারার বর্ণনা দিতে আপত্তি করেনি রিসেপশনিস্ট। এখানেই ওরা থেমে থাকেনি, অন্যান্য আরো হোটেলের সাথে যোগাযোগ করলো। জানলো, একই চেহারার লোক আরো তিনটে হোটেলে মোট আরো বারো জনের জন্যে কামরা রিজার্ভ করেছে।

সেই বর্ণনা অনুসারে আধ ঘণ্টা আগে লোকটাকে চেনা সম্ভব হয়েছে। টয়লেটে নিয়ে গিয়ে তাকে এবং নিজেদের একজন লোককে বিবস্ত্র করানো হয়, কাপড় বদল করে তারা। নিজেদের লোকটাকে তারা টার্মিনাল ভবনে পাহারায় রেখেছে। রাশিয়ানটাকে নিয়ে এসেছে নিজেদের সাথে। অস্ত্রের মুখে বেচারা একদম কেঁচো বনে গেছে। জানে, তার পরিচয় যদি ফাঁস হয়ে গিয়ে থাকে, মস্কো যতোই চেঁচামেচি করুক, মার্কিন আইনে তার যাবজ্জীবন হতে বাধ্য। তবে ওরা তাকে কথা দিয়েছে, সে যদি সহযোগিতা করে তাহলে তাকে ক্ষমা করা হতে পারে, এমনকি যুক্তরাষ্ট্রে তাকে রাজনৈতিক আশ্রয়ও দেয়া যেতে পারে।

কিন্তু যদি সে সহযোগিতা না করে ?

কোনো বিচার হবে না। তবে কাল তার একটা খবর বেরুবে

কাগজে। তার খবর, কিন্তু সে পড়তে পারবে না। কারণ সেটা হবে তার মৃত্যুর খবর।

মন খারাপ করে দ্বিতীয় সারিতে দাঁড়িয়ে আছে বেচারা, নিরস্ত্র। গ্রেফতার করার সময়ই সার্চ করে পিস্তলটা কেড়ে নিয়েছে ওরা। 'চারজন একসাথে আসছে,' বিড়বিড় করে বললো সে। 'দু'জন ছাই রঙের স্যুট পরে, একজন বা···হ্যাঁ, বাদামি স্যুট। তার পাশে জ্যাকেট পরা লোকটা।' ঢোক গিললো সে।

তার পাশ থেকে সারির প্রথম অফিসার বললো, 'স্বাভাবিক থাকতে চেষ্টা করুন। ওরা তো আর আপনাকে চেনে না।' কমাণ্ডো চারজনকে দু'সারির মাঝখান দিয়ে এগিয়ে যেতে দিলো ওরা, কোনো রকম বাধা দিলো না। কমাণ্ডোরা কে কি ভাবলো কে জানে, কেউ তারা দু'পাশে দাঁড়ানো অফিসারদের দিকে ভুলেও একবার তাকালো না। কমাণ্ডো চারজনের পিছনে যারা ছিলো বাধা দেয়া হলো তাদের। অফিসারদের একজন এক হাতে কার্ড আর অপর হাতে পিস্তল নিয়ে তাদের পথরোধ করে দাঁড়ালো। বাকি সাতজন অনুসরণ করলো কমাণ্ডো চারজনকে। টার্মিনাল ভবনের কাছাকাছি পৌঁছে অফিসারদের তিন জন কমাণ্ডোদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল। তারপর হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে মুখোমুখি হলো। একই সময়ে পিঠে শক্ত কিছুর গুঁতো অনুভব করলো রুশ আততায়ীরা।

দাঁড়িয়ে পড়লো কমাণ্ডোরা। হতচকিত এবং বিহ্বল।

'এফ. বি. আই.,' অফিসারদের একজন বললো। 'কিছু প্রশ্ন করার আছে, সবাইকে হেডকোয়ার্টারে যেতে হবে।'

কোনো ধস্তাধস্তি হলো না, তর্ক-বিতর্ক হলো না। ছয়জন অফিসার চারজন কমাণ্ডোকে ঘেরাও করে সাউথ গেট-বি অভিমুখে

এগোলো। কয়েক সেকেণ্ড পর তাদের সাথে যোগ দিলো বাকি দু'জন অফিসার।

পরবর্তী মেক্সিকো ফ্লাইট বেলা এগারোটায়। সাউথ গেট-বি এবং টারমাকে একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি হলো।

তৃতীয় ফ্লাইটের কমাণ্ডোদের গ্রেফতার করা হলো লাউঞ্জ থেকে বেরুবার মুখে। এখানে তুমুল ধস্তাধস্তি হলো, ছুটে এলো এয়ারপোর্ট সিকিউরিটির লোকজন, হৈ-হট্টগোলের মধ্যে দৌড় দিলো একজন কমাণ্ডো। মার্সিডিজ নিয়ে বাইরে অপেক্ষা করছিল অফিসারদের তিনজন লোক, নিরস্ত্র কমাণ্ডোকে ধরে ফেললো তারা। লাউঞ্জের বাইরে এফ. বি. আই. এজেন্টদের চ্যালেঞ্জ করে বসলো এয়ারপোর্ট সিকিউরিটির লোকজন। ব্যাজ, পরিচয়-পত্র, ইত্যাদি দেখে তারা অবশ্য একটু পরই ক্ষমা চেয়ে নিলো।

চার এবং শেষ কমাণ্ডো গ্রুপটাকে টার্মিনাল ভবন থেকে বেরিয়ে আসতে দিলো ওরা। মার্সিডিজ নয়, ভাড়া করা ট্যাক্সি নিয়ে স্ট্যাণ্ডে অপেক্ষা করছিল বারো জনের দলটা। এখানে পালাতে গিয়ে গুলি খেলো একজন কমাণ্ডো, তবে আঘাতটা মারাত্মক নয়।

প্রতিটি ঘটনাই দুর থেকে চাক্ষুষ করলো রানা। পরম স্বস্তি বোধ করলো ও, ভালোয় ভালোয় কয়েদ করা গেছে গ্রুর লোকগুলোকে। একশো বত্রিশ জন রুশ ডীপ-কাভার আপাততঃ বেঁচে গেল ওদের হাত থেকে।

কিন্তু ডালচিমস্কির হাত থেকে ওদের সে বাঁচাবে কিভাবে?

পরদিন সন্ধ্যায় বাইরে বেরুবার জন্যে তৈরি হলো ওরা। লিলি

কাপড় পরছে, জ্যাকেটের ডান পকেটে সাইলেন্সারটা রাখলো রানা। রিলোড করা পয়েন্ট টু-টু রেখেছে ভেতরের ব্রেস্ট পকেটে।

নিস শ্যাতোর লাউঞ্জে বিয়ার খেলো ওরা। 'চলো দেখি বড়লোক হওয়া যায় কিনা,' বলে হাত ধরে টানতে টানতে পাশের কামরায় রানাকে নিয়ে এলো লিলি। একশো নব্বই ডলার হারার পর লিলিই আবার টেনে বের করে আনলো ওকে। বললো, 'আমি একটা কুফা। যতোক্ষণ সাথে থাকবো কোনো কাজই হবে না তোমার।'

ট্যাক্সি নিয়ে আরেক হোটেলে এলো ওরা। বিয়ারের বদলে শ্যাম্পেন চাইলো লিলি, অনেকটা বাধ্য হয়েই হুইস্কি নিতে হলো রানাকে। আটটা দশ পর্যন্ত এখানে থাকলো ওরা, সময় কাটলো ক্যাবারে দেখে। তারপর ওরা প্রচুর সময় নিয়ে ডিনার খেলো। আধ ঘণ্টা পর পর তিন বার টেলিফোন করার জন্যে উঠে গেল রানা। প্রতিবার ফিরে এলো আগের চেয়ে বেশি গম্ভীর হয়ে।

সাড়ে দশটা থেকে রাত দুটো পর্যন্ত বিভিন্ন নাইট ক্লাবে ঢুঁ মারলো ওরা। রাস্তায় বেরিয়ে এসে হাঁটলো কিছুক্ষণ। লিলিকে একটা বুকস্টলে দাঁড় করিয়ে রেখে আবার ফোন বুদে ঢুকলো রানা।

ফোন বুদ থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি থামালো রানা। আড়াইটা বাজে। আগের মতোই গম্ভীর ও। ড্রাইভারকে বললো, 'থাণ্ডার-বার্ড।'

'একা একা কষ্ট পাও, আমার কি!' জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে লিলি, ম্লান চেহারা।

'লোকটাকে পেয়েছি।'

'কাকে পেয়েছো, কোথায় পেয়েছো, কিছুই আমি জিজ্ঞেস করবো

না,' বললো লিলি। রানার দিকে ফিরলো সে, ওর একটা হাত ধরলো। 'শুধু লক্ষ্য রাখতে অনুরোধ করবো তুমি পাশে থাকা সত্ত্বেও আমি যেন নিঃসঙ্গ বোধ না করি।'

থাণ্ডারবার্ডের সবচেয়ে বড় রেস্তোরাঁয় বসলো ওরা। ফোন করে আগেই রিজার্ভ করা হয়েছে টেবিলটা। হালকা, মৃদু মিউজিকের সাথে ফ্লোরে অর্ধনগ্ন ফ্রেঞ্চ মেয়েরা নাচছে। রেস্তোরাঁয় একজন লোক ঢুকলো—ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি, ব্রাউন হ্যাটের কিনারা থেকে বেরিয়ে আছে লালচে চুল, শক্ত-সমর্থ বলিষ্ঠ গড়ন, পরনে অ্যাশ কালারের স্যুট, হাতে একটা বড় আকারের সাদা গোলাপ। কোনো দিকে না তাকিয়ে রেস্তোরাঁর ভেতর দিয়ে ক্যাসিনোর দিকে চলে গেল সে। রানা তাকে একবার মাত্র দেখলো, তারপর আর সেদিকে তাকালো না।

বিশ মিনিট পর চেয়ার ছেড়ে উঠলো রানা, 'আসছি।'

'টেলিফোন, না টয়লেট?' জিজ্ঞেস করলো লিলি।

রানা হাসলো না। 'দুটোই।'

ক্যাসিনোয় ঢুকে এদিকে ওদিকে তাকালো রানা। ছিয়াশি নম্বর টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভিনসেন্ট গগল। দু'জন সামনা-সামনি হলো, কিন্তু কথা বললো না। পাশাপাশি হেঁটে আরেক দরজা দিয়ে ক্যাসিনো থেকে বেরিয়ে এলো ওরা। চারতলার রেস্তোরাঁয় আরেকটা টেবিল রিজার্ভ করা আছে।

টেবিলটা কেবিনের ভেতর। সামনাসামনি বসলো ওরা। সিগা-রেটের জন্যে পকেটে হাত দেবে রানা, এই সময় গোলাপটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিলো গগল। হাত বাড়িয়ে নিলো রানা, কিন্তু ফুলের দিকে নয় তাকিয়ে আছে বন্ধুর দিকে।

'ডন আর. কে. আমার স্কটল্যাণ্ডের বাড়িতে বিশ্রাম নিচ্ছেন,' বললো গগল।

কেবিনে বোমা পড়লেও এতোটা চমকাতো না রানা। ওর সমগ্র অস্তিত্ব একটা ঝাঁকি খেয়ে অবশ হয়ে গেল যেন।

'ভয়ের কিছু নেই, এখন তিনি সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত,' আশ্বাস দিলো গগল। 'পড়ে দেখো।'

কি পড়ে দেখতে হবে রানাকে বলে দিতে হলো না। সাদা গোলাপের পাপড়ির ভেতর ছোট্ট একটুকরো কাগজ লুকানো অবস্থায় পাওয়া গেল। চিরকুটে মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান লিখেছেন, 'রানা, মস্ত একটা ফাঁড়া গেল। প্রথম স্ট্রোক, ঘাবড়াবার কিছু নেই। তবে এখন থেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকা দরকার তোমার, দায়িত্ব তো তোমাকে নিতেই হবে। কাজ কেমন এগোচ্ছে?'

রানা মুখ তুলতেই গগল বললো, 'কি একটা কাজে স্কটল্যাণ্ডে এসেছিলেন। আসার পরদিনই অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্ট্রোক, তবে জোরালো নয়। ডাক্তাররা কমপ্লিট রেস্ট নিতে বলেছেন, ক'দিন পর আবার পরীক্ষা করবেন।' অপারেশনও দরকার হতে পারে, কিন্তু সে-কথা চেপে গেল গগল। 'আশ্চর্য মানুষ তোমার বস,' বললো সে। 'তোমার খোঁজ জানেন না, কিন্তু আমি জানি সে-খবর ঠিকই রাখেন। হাসপাতাল থেকে ফোন করেছিলেন তিনি, প্লেন নিয়ে একাই তাঁকে আমি দেখতে চলে যাই। খানিক আগে ফিরেছি, তাই টেলিফোনে পাওনি আমাকে। ডনকে জোর করে আমার বাড়িতে তুলে দিয়ে এসেছি।'

'আমি যাবো,' বললো রানা। বস গগলের বাড়িতে বিশ্রাম নিতে

উঠেছেন। প্রায় অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপার।

'উনি নিষেধ করেছেন।'

'আমাকে যেতে হবে।'

'তোমাকে দেখে উনি রেগে যাবেন,' বললো গগল। 'তাতে তাঁর ক্ষতি হবার সম্ভাবনাই বেশি। কাজ শেষ হলে যেতে বলেছেন। ভালো একটা হান্টিং রাইফেল নিয়ে যেয়ো।'

হার্টের রোগীকে উত্তেজিত করা চলে না। ওকে দেখে বস যে রেগে যাবেন তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। সিদ্ধান্তটা বদলাতে হলো। হাতের কাজ শেষ করে দেখতে যাবে বসকে। হান্টিং রাই-ফেল? কিসের লোভে গগলের বাড়িতে উঠেছেন বস, পরিষ্কার হয়ে গেল। স্কটল্যাণ্ডে বিশাল বনভূমির মালিক গগল, হরিণের স্বর্গ-রাজ্য। 'বনি ওয়ার্ডারের খবর কি?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'বারো ঘণ্টা আটকে রেখে ছেড়ে দিয়েছি,' বললো গগল। 'এয়ারপোর্ট থেকে কয়েকবার ফোন করা হয়, তাকে দিয়েই রিসিভ করিয়েছি সবগুলো। পিস্তলের মুখে শেখানো বুলি আওড়ে গেছে।'

'ছেড়ে দেয়ার পর?'

'সাউথ গেট-বি আর টার্মিনালের তিনজন গার্ডকে সাসপেণ্ড করেছে, বাধ্যতামূলক অবসর নিতে হয়েছে দু'জন সিকিউরিটি অফিসারকে।'

'এফ. বি. আই.?'

'ওরা রহস্যের কোনো কিনারাই করতে পারছে না।' ফিক্ করে হাসলো গগল।

'কোথায় রেখেছো ওদের?'

'গোটা আমেরিকা আমার সেফ হাউস, যেখানেই রাখি, কারো

সাধ্য নেই খুঁজে বের করে। ওদের কি মস্কোয় ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করবো ?'

'এখন না। আমি বলবো।'

পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকলো ওয়েটার। অর্ডার দিলো গগল। ওয়েটার বেরিয়ে যেতে রানাকে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার আরো সাহায্য দরকার না হলে দেখা করতে বলতে না, ঠিক ?'

মাথা ঝাঁকালো রানা। 'আমাকে একজন অসৎ পুলিশের সন্ধান দিতে পারো ? আর, পনেরো বছরের পুরনো রাশিয়ান নোটবুক দরকার একটা।'

'কি কাজের জন্যে তাকে চাইছো বললে বুঝতে পারতাম কি ধরনের অসৎ লোক দরকার তোমার।'

সিগারেট বের করলো রানা। অফার করলো গগলকে। মাথা নাড়লো গগল। ট্রে-তে করে জনি ওয়াকারের একটা বোতল আর দুটো গ্লাস দিয়ে গেল ওয়েটার।

'আমি একজন লোককে খুঁজছি। সে কোথায় আমি জানি না। তবে আমেরিকাতেই আছে বলে আমার ধারণা। তাকে খুঁজে বের করতে হলে পুলিশ আর এফ. বি. আই.-এর সাহায্য দরকার, কিন্তু সরাসরি ওদের সাহায্য চাওয়া যাচ্ছে না। তাই আমি অসৎ একজন পুলিশের সাহায্য নেবো, যার পক্ষে পুলিশ বিভাগের সমস্ত সুযোগ-সুবিধে কাজে লাগানো সম্ভব।'

প্রথমে নিজের গ্লাসে, তারপর রানার গ্লাসে হুইস্কি ঢাললো গগল। বরফ মিশিয়ে নিজের গ্লাসে চুমুক দিলো। রানার গ্লাসে রানাকেই বরফ মেশাতে হলো।

সময় বয়ে চলেছে। নিঃশব্দে পান করছে ওরা। রানার সিগারেট

প্রায় শেষ হয়ে এলো। দু'জনের গ্লাসে আবার হুইস্কি ঢাললো গগল। সে হয়তো মনে মনে চিন্তা-ভাবনা করছে, কিন্তু চেহারা দেখে কিছুই বোঝা গেল না।

আরো পাঁচ মিনিট পর গগল বললো, 'অ্যালিস টেনডেল।'

'অ্যালিস টেনডেল,' পুনরাবৃত্তি করলো রানা। 'পদ?'

'সার্জেন্ট,' বললো গগল। 'তোমাকে ভালোই সাহায্য করতে পারবে বলে মনে করি। সাহায্য করার অভ্যেস আছে।'

'তোমার মতো,' বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিলো রানা, ওর এই বন্ধুটি অদ্ভুত রকমের স্পর্শকাতর, কি কথার কি মানে করে বসবে বলা কঠিন। মুশকিল হলো, কোনো প্রতিক্রিয়া হলে সেটা ধরতে পারা যায় না। অনেক মাস বা অনেক বছর পর হয়তো ছোট্ট একটা মন্তব্য করবে, তখন বোঝা যাবে কথাটা তাকে আঘাত করেছিল।

'তাকে বলবে আমি তার প্রশংসা করেছি,' অনুরোধ করলো গগল। 'কখন দেখা হবে ফোনে জানাবো।'

'এনভেলাপে ভরে যদি হাজার পাঁচেক ডলার দিতে চাই, মাইণ্ড করবে না তো?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'এক হাজার! নোটবুকটা পেতে দেরি হবে।'

রানা কিছু বলতে গিয়ে বাধা পেলো।

আবার বললো গগল, 'দরকার হলে পরে বাড়িয়ো।' হঠাৎ রানার দিকে ঝুঁকলো সে। 'তোমার বস সম্পর্কে বিশেষ কিছু আমার জানা নেই। উনি কি খান, কিসে অভ্যস্ত, কি লাগবে না লাগবে, কিছুই আমি জানি না। বুঝতেই পারছো মেহমানের খাতির যত্নে ত্রুটি থাকুক তা আমি চাই না।'

'হার্টের রোগী যা খায় তাই খাবেন,' অবাক হয়ে বললো রানা। 'কি লাগবে না লাগবে, তোমার লোকজন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেই তো পারে।'

'আমার কথা তুমি বুঝতে পারছো না,' বললো গগল। একটু যেন গম্ভীর মনে হলো তাকে। 'সব কথা কি সবাইকে জিজ্ঞেস করা যায়? আমি বলতে চাইছি, মানে নেশা-টেশা, মেয়ে-টেয়ে···।'

চোখে পানি এসে গেল রানার, হাসতে হাসতে। এমন প্রাণ-খোলা, বাঁধনহীন হাসি সারা বছর হাসেনি ও। এক সময় হঠাৎ করেই থামলো। গগলের দিকে তাকিয়ে ঠিক বুঝতে পারলো না দু'জনের সম্পর্ক ইতিমধ্যে কি পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

গগল স্থির পাথর।

'তুমি ঠিক বুঝতে পারোনি, গগল,' বললো রানা। 'তোমার ডন আর. কে. একজন ঋষি, যোগীপুরুষ। এ-সব বিষয়ে তাঁর কোনো মোহ নেই।'

'মিলে গেল,' বলে উঠে দাঁড়ালো গগল, চেহারা সেই আগের মতো নির্লিপ্ত। 'পাঁচ মিনিট পর যেয়ো। বিল আমি দিচ্ছি।' কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল সে।

কি মিলে গেল? গগলও কি তাই ভেবেছিল, রাহাত খান এসবে অভ্যস্ত নন? তাহলে জিজ্ঞেস করলো কেন? আপনমনে কাঁধ ঝাঁকালো রানা। লোকটাকে আজও সে ভালোমতো বুঝে উঠতে পারলো না। পাঁচ মিনিট পর কেবিন থেকে বেরিয়ে টয়লেটে ঢুকলো ও। বেসিনে ফেলে চিরকুটটায় আগুন ধরালো, ট্যাপ খুলে দিতে পানির সাথে পাইপে নেমে গেল ছাইটুকু। রেস্তোরাঁয়, লিলির কাছে ফিরে এসে রানা জিজ্ঞেস করলো, 'শো কেমন লাগলো?'

ম্লান মুখে লিলি বললো, 'ভালো।'

হাত বাড়িয়ে লিলির মুখে আলতো করে আঙুল বুলালো রানা। 'দেরি হলো বলে দুঃখিত। আমার বন্ধু···।'

এতোক্ষণে রানার দিকে ফিরলো লিলি। 'কোনো অজুহাত দেখাতে হবে না, রবিন। আমি খুব ক্লান্ত, বিছানায় যেতে চাই।'

কিন্তু বিছানায় ওঠার পর রানা আবিষ্কার করলো, লিলি মোটেই ক্লান্ত নয়।

তিন

বার্কশায়ারকে ভালো লেগে গেল ডালচিমস্কির। এর আগে ডেটনে ছিলো সে, তার তুলনায় ম্যাসাচুসেটস-এর উপত্যকা আর পাহাড় দশ ডিগ্রী বেশি ঠাণ্ডা। বিশাল ধড় নিয়ে গরমে হাঁসফাঁস করছিল সে, এখানে পৌঁছে শান্তি পেলো। আমেরিকার গ্রীষ্মকাল এরকম জঘন্য তার ধারণা ছিলো না, জুলাই মাসের মস্কোর চেয়ে পুরোপুরি বিশ ডিগ্রী বেশি গরম। ওহায়ো এবং বার্কশায়ারের আবহাওয়া তুলনা করলে, আর সেই সাথে দিগন্তের কাছে পাহাড়ী ঢালের দিকে তাকালে পরিষ্কার হয়ে যায় শীতকালে কেন এলাকাটা স্কি-র

জন্যে এতো জনপ্রিয়।

আলবানি পর্যন্ত প্লেনে করে, তারপর বাসে চড়ে পিটসফিল্ড, সেখান থেকে ভাড়া করা কার নিয়ে এখানে পৌঁচেছে সে। অটো রেন্টাল এজেন্সির ম্যানেজার ছোটো শহর স্টকব্রিজে একটা হোটেল কামরা পাইয়ে দিতে সাহায্য করে তাকে। হোটেলটার নাম গ্রে লায়ন ইন, রুট সেভেনের সাথেই। হপ্তার শেষ দিকে ট্যুরিস্টদের প্রচণ্ড ভিড় লেগে যায়, পৌঁছুবার আগেই কামরা রিজার্ভ করে রাখে তারা, তবে হপ্তার মাঝামাঝি সময়ে চেষ্টা করলে দু'দিনের জন্যে কামরা পাওয়া সম্ভব। ডালচিমস্কির জন্যে দু'দিনই যথেষ্ট, কারণ এখনো সে কোথাও দু'দিনের বেশি থাকার ঝুঁকি নিতে রাজি নয়।

গ্রে লায়ন ইন পুরনো ধাঁচের হোটেল। কামরাগুলো বড় বড়, সিলিং অস্বাভাবিক উঁচু, বারান্দাগুলোয় ফুটবল খেলা যেতে পারে। হোটেলের চার পাশেই বাগান। রান্নাবান্না করে সুইস শেফ। শহরটাও খুব সুন্দর, প্রতিটি রাস্তার দু'পাশে সার সার গাছ। পাবলিক লাইব্রেরীটা এতো বড়, অবাক না হয়ে পারা যায় না। মিউজিয়ামটাও ছোটো নয়, পুরোটা দেখতে হলে সারা দিন লেগে যাবে। সবচেয়ে বেশি পছন্দ হলো আর্ট গ্যালারি—এতো বিচিত্র ধরনের ন্যুড ছবি আছে মাথা ঠিক রাখা মুশকিল। আরেকটা জিনিস খুব আগ্রহের সাথে লক্ষ্য করেছে ডালচিমস্কি। প্রকাণ্ড একটা বাড়ি। ওটা নাকি শিশুদের মানসিক হাসপাতাল। রোগী পিছু প্রতি হপ্তায় পাঁচশো ডলার চার্জ করা হয়, তারমানে ধনীর দুলাল যারা পাগল-টাগল হয়ে যায় বা যাচ্ছে শুধু তারাই এখানে থাকতে পারে। মানসিক প্রতিবন্ধীদের প্রতি কেমন যেন একটা তাচ্ছিল্য মেশানো কৌতূহল আছে ডালচিমস্কির, সেজন্যেই ভেতরে ঢোকার চেষ্টা

করেছিল সে। কিন্তু তাকে ঢুকতে দেয়া হয়নি। দারোয়ান ফিরিয়ে দেয়ার সময় তাকে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আগে অনুমতি নিতে হবে।

অনুমতির জন্যে ছুটোছুটি করার ধৈর্য বা সময় কোনোটাই নেই তার। তবে হাসপাতালটায় ঢুকতে পারলো না বলে মনে একটা ক্ষোভ জমা হলো।

হোটেলে ফিরে এসে মুখ হাঁড়ি করে বসে থাকলো ডালচিমস্কি। বার বার ফোনের দিকে তাকালো। দেবে নাকি ডায়াল করে ? দিই, দিই আরেকটা ফাটিয়ে ?

কিন্তু প্ল্যানটা অন্যভাবে করা হয়েছে। আরেকটা টেলি-বোমা ফাটাবার সময় হয়ে গেছে, কিন্তু সেটা আজ নয়—কাল। তবে প্ল্যান বদল করতে অসুবিধে কি ? এখন আমি রেগে আছি, এখন নয় কেন ? সিদ্ধান্ত নিতে না পেরে নিচের ডাইনিং রুমে ডিনার খেতে নামলো সে।

ভালো ভালো সব খাবারের অর্ডার দিলো ডালচিমস্কি। কিন্তু খেলো খুব অল্প, বেশিরভাগ পড়েই থাকলো। কিন্তু অর্ডার আমি ঠিকই দিয়েছিলাম, মনে মনে বললো সে। আমি তো সে-ই লোক যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়ে দিতে পারে। আমি খেতে বসলে সামনে তো ভালো ভালো সব খাবার থাকতেই হবে। মাথায় কতো যে আবোলতাবোল চিন্তা-ভাবনা আসছে! সবচেয়ে দুঃখজনক বলে মনে হলো, আশপাশের লোকজন কেউ তাকে চিনতে পারছে না। জানে না, ছোটো একটা খাতা রয়েছে তার পকেটে, সেই খাতার কি ক্ষমতা! যারা খাচ্ছে তাদের খাওয়া বন্ধ করে দিতে ইচ্ছে করলো একবার। 'তোমাদের সবার জীবন আমার হাতে,' চিৎকার

করে এই কথাটা বললেই হবে। আচ্ছা, একজন সুস্থ মানুষ কি এভাবে চিন্তা করে? এতো কিছু ভাবছি, এ-সব কি অশুভ কোনো লক্ষণ? মাথা খারাপের লক্ষণ নয় তো?

প্ল্যান বদল করার পোকা মাথায় ঢোকার পর থেকে অস্থিরতা বেড়ে গেছে তার। পোকাটা মাথায় ঢুকলো কেন? বাচ্চাদের মানসিক হাসপাতালে তাকে ঢুকতে দেয়া হয়নি। ওখানে ঢুকলে কি হতো? কি দেখতে পেতো সে?

আমি জানি না।

হয়তো আমি আমার বাল্যকালটা দেখতে পেতাম ওখানে।

হ্যাঁ, অবশ্যই। ছোটোবেলায় আমিও তো ওদের মতো ছিলাম। একটু পাগলাটে।

কিন্তু এখন আর আমি পাগলামি করি না। আমি যা করছি তাকে অ্যাকশন বলা যাবে না কোনোমতে, শুধুই রিয়্যাকশন। ঢিল মেরেছো পাটকেল খাও। এক আঙুল দেখিয়েছো, দু'আঙুল দেখাবো। টিট ফর ট্যাট। বিদ্রোহ করেনি, করতে পারে এই অভিযোগে ওরা মেরে ফেললো সবাইকে! পাষণ্ড, নরাধম! কি সুন্দর সেট হয়ে গিয়েছিল জীবনটা। ইচ্ছে করলেই নতুন নতুন সহকারিণী পাচ্ছিলাম, একটাকে বাদ দিয়ে আরেকটা পেতে কোনো অসুবিধে হচ্ছিল না। হঠাৎ করে আকাশ ভেঙে পড়ার উপক্রম হলো মাথায়। কিছুই করিনি, করতে পারি এই অভিযোগে ধরতে আসছে, ধরা পড়লে মেরে ফেলবে! বললাম, রসো, তাহলে আমিও একহাত দেখাচ্ছি!

এখন? এখন কেমন লাগছে? হাহ্-হা!

না, শিডিউল বদলাবার কোনো মানে হয় না। ইচ্ছে করলে রাগটাকে আমি সামলে রাখতে পারি। তারচেয়ে নতুন নতুন প্ল্যান

তৈরি করে সময় কাটানো যাক।

নিজের কাছে প্রায় সাড়ে তিন লাখ ডলার আছে। এক অর্থে অনেক টাকা, আরেক অর্থে কোনো টাকাই নয়। টাকার আমার দরকার হবে যদি আগের জীবনটা ফিরে পেতে চাই। মস্কোর কাছে চাইলে দেবে না; কিন্তু ওয়াশিংটন কি না বলতে পারবে ? সবগুলো টেলি-বোমা ফাটিয়ে দিলে ওদের ক্ষতি হবে···আন্দাজ করা যাক— তিনহাজার মিলিয়ন ডলার। দুর, ক্ষতি আরো বিশ গুণ বেশি হতে বাধ্য। আহা, নাহয় ধরোই না তিন হাজার মিলিয়ন ডলার। তা-ও তো খুব কম নয়। ঠিক আছে, তাই। এখন আমি যদি ওদের কাছ থেকে এক হাজার···না···একশো মিলিয়ন ডলার দাবি করি, দেবে না ?

একশো মিলিয়ন ডলার কম হয়ে যায়। যদি চাই, বেশি করে চাওয়াই ভালো। দর কষাকষির একটা ব্যাপার তো থাকবেই। আমেরিকানরা আবার এ-ব্যাপারে সাংঘাতিক পটু। ঠিক আছে, পাঁচশো মিলিয়ন ডলার দিয়ে শুরু করবো। তিনশো মিলিয়নের কমে রাজি হবো না।

নিজের ঘরে ফিরে এসেও হিসেবটা নিয়ে ব্যস্ত থাকলো ডালচিমস্কি। কিন্তু টাকার চেয়ে বড় একটা নেশার দিকে আকৃষ্ট হলো সে। টেলি-বম বুক।

খাতাটা দেখতেই তার ভালো লাগে। খাতায় হাত বুলোবার সময় প্রায় যৌন উত্তেজনার মতো একটা আনন্দ, একটা শিহরণ বয়ে যায় তার শরীরে।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙার পর ডালচিমস্কি দেখলো, খাতাটা বুকের সাথে নিয়ে শুয়ে আছে সে। টাকার ভূত নেমে গেছে ঘাড়

থেকে, আরো বড় নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। বিশ্রাম নেয়ার পর তাজা হয়ে গেছে শরীর, মাথাটাও ভালো খেলছে। টাকা দিয়ে কি হবে, শুনি? টাকা দিয়ে কি সব কেনা যায়? একটা টেলি-বম ফাটাবার যে আনন্দ, আর কিছুর সাথে তার তুলনা চলে? বিশ্বব্যাপী একটা পারমাণবিক যুদ্ধ বাধিয়ে দেয়ার মধ্যে যে তৃপ্তি, আর কিছুতে কি তা পাওয়া সম্ভব? বৈষম্য, দুর্নীতি, অন্যায়-অবিচার নির্যাতন, আর বিকৃতি—দুনিয়ার যেদিকেই তাকাও, শুধু এই সব দেখতে পাবে তুমি। কি কমিউনিস্ট দেশ, কি পুঁজিবাদী দেশ, সবখানে এক অবস্থা। মানুষের সভ্য হবার সমস্ত চেষ্টা মানুষ নিজেই ব্যর্থ করে দিয়েছে। দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে শিখেছে বটে, কিন্তু চার-পেয়েদের কোনো খারাপ গুণই ত্যাগ করতে পারেনি, বুদ্ধি আর মেধা দিয়ে আরো বরং সুকৌশলে প্রয়োগ করতে শিখেছে। মানুষ-জাতির ভবিষ্যৎ কি, এই প্রশ্নের উত্তর যে-কেউ দিতে পারবে ধ্বংস।

সেই ধ্বংস আমি ত্বরান্বিত করতে পারি, সে ক্ষমতা আমার আছে। সেই ধ্বংসের কারণ যদি আমি হই, কোথাও লেখা থাক বা না থাক, আমিই হবো মানব সভ্যতার ইতিহাসে শেষ চরিত্র।

কল্পনা করতে গিয়ে পুলক অনুভব করলো ডালচিমস্কি, তার গায়ের রোম খাড়া হয়ে উঠলো। দেখলো পারমানবিক বিষবাষ্প গ্রাস করছে পৃথিবীকে। প্রতি মুহূর্তে কোটি কোটি মানুষ মারা যাচ্ছে। ইউরোপ উজাড় হয়ে গেল। গোটা আমেরিকায় ঘাসের একটা কণা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। রাশিয়া নো ম্যান'স ল্যান্ডে পরিণত হয়েছে। এশিয়ায় প্রাণের কোনো চিহ্ন নেই। নির্জন নিস্তব্ধ পৃথিবী। অনুর্বর. বন্ধ্যা। পাঁচশো কোটি ছোটো বড় কংকালের

মধ্যে তারটাও থাকবে।

কল্পনা করছে, আর খাতাটায় হাত বুলাচ্ছে ডালচিমস্কি। সারা শরীরে অদ্ভুত এক শিহরণ। অসম্ভব—সুযোগ যখন পাওয়া গেছে নিজেকে সে বঞ্চিত করতে পারে না। প্ল্যান বদলানোর প্রশ্নই ওঠে না। নামটা আগে সই করা হয়ে যাক, মস্কোর রাঘব-বোয়ালদের আরো একটু ঘাম ঝরুক, তারপর একসাথে সব ক'টা ফাটিয়ে দেবে সে। এক রাতে সবগুলো। প্রথম ফোনটা আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে করবে সে। বলবে, 'আমি রাশিয়া। এক রাষ্ট্রে যেমন দু'জন প্রেসিডেন্ট থাকতে পারে না, তেমনি এক পৃথিবীতে দুই মাতবর থাকতে পারে না। তুমি আমেরিকা, তোমাকে বিদায় দিতে হচ্ছে। যদি পারো তো ঠেকাও।' এরপর সারা রাত ধরে ডায়াল করবে সে। একশো ছত্রিশটা টেলি-বম ফাটিয়ে দেবে। জানা কথা, আমেরিকানরাও বসে থাকবে না। রাত শেষ হবার আগেই পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে মস্কো। রাশিয়ার মিসাইলগুলো আঘাত হানবে ওয়াশিংটনে। শুরু হয়ে যাবে খেল। ডালচিমস্কি তখনো ফোন করছে, কানাডা থেকে।

কয়েক দিন থেকেই পরবর্তী টার্গেট কাকে করবে ভাবছে ডালচিমস্কি। ধীরে ধীরে খাতার পাতা ওল্টাতে শুরু করলো সে। একটু অধৈর্য বোধ করলো, টার্গেট আগেই বেছে রাখা উচিত ছিলো।

খাতা বন্ধ করে বাথরুমে গেল ডালচিমস্কি। মনের যা অবস্থা, মুখে কিছু রুচবে না এখন। কাজটা সেরে তারপর নাস্তা খাবে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে ব্যস্তভাবে কাপড় পরলো সে। তাড়াতাড়ি দাড়ি কামাতে গিয়ে এক জায়গায় কেটে গেছে গাল, জ্বালা করছে।

হোটেল থেকে বেরিয়ে এলো ডালচিমস্কি। রাস্তা পেরিয়ে হন হন

করে হাঁটছে। হোটেলের কাছাকাছি কোনো কোন বুদ ব্যবহার না করাই ভালো। একটা বাজারের ভেতর দিয়ে এগোলো সে। মানুষ ইচ্ছে করলে কি না পারে, হঠাৎ মনে হলো কথাটা। আজ কতো দিন হয়ে গেল কোনো মেয়ের গন্ধ পর্যন্ত নেইনি! কে জানতো আমার মধ্যেও সংযম আছে!

সকালটা গরম। মেয়েরা শুধু বুক আর নাভির নিচেটা ঢেকে রাস্তায় বেরিয়েছে। বুড়ো এক লোককে রাস্তা পেরোতে সাহায্য করছে এক যুবক। দেখে হাসি পেলো ডালচিমস্কির। ইচ্ছে হলো চিৎকার করে বলে, 'ওহে, কোনো লাভ নেই!' আবার রাস্তা পেরোলো সে। প্রায় ছুটতে শুরু করেছে। দেরি আর সহ্য হচ্ছে না তার।

রাস্তার মোড়ে খালি একটা বুদ পাওয়া গেল। হোটেল থেকে অনেকটা দূরে চলে এসেছে সে। বুদে ঢুকে হাঁপাতে লাগলো ডালচিমস্কি। ভুরুতে লোমের গোড়াগুলো ঘামে ডুবে আছে। চটচট করছে বগলের তলা। রিসিভার তুললো সে। ডায়াল করলো ইণ্ডিয়ান গর্জ, টেক্সাসে।

অপরপ্রান্ত থেকে একটা পুরুষকণ্ঠ ভেসে এলো, 'বেকারি।' কথার সুরে টেক্সাসের টান।

'মিঃ হ্যারি মার্কস?'

'বলছি।'

'মিসেস রোয়েনা যা বলেছে সত্যি কিনা, আপনাদের ওখানে নাকি নয় ইঞ্চি লম্বা প্যানকেক পাওয়া যায়?' জিজ্ঞেস করলো ডালচিমস্কি।

অপরপ্রান্ত থেকে কয়েক সেকেণ্ড কোনো সাড়া পাওয়া গেল না

চোখে ঘাম পড়লো ডালচিমস্কির। অপেক্ষা করছে সে।

টেক্সাস থেকে লোকটা বললো, 'দুঃখিত, প্যানকেক শেষ হয়ে গেছে।'

ফোন বুদ থেকে বেরিয়ে হোটেলে ফিরে এলো মূর্তিমান শয়তান। ব্রেকফাস্ট করতে বসে প্যানকেকের অর্ডার দিলো সে।

নাস্তা শেষ করে বিল মেটালো ডালচিমস্কি, মোটা বকশিশ দিলো ওয়েটারকে। সিঁড়ি বেয়ে নিজের কামরায় যাবার সময় আপনমনে হাসতে লাগলো সে।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রেডিওতে শোনা যাবে খবরটা।

প্রথমবার রানার ঘুম ভাঙলো বেলা সাড়ে এগারোটায়। রিসিভারটা খাটের পাশেই, কিন্তু সেটা তুলতে হলে টপকাতে হবে লিলিকে। বেচারির যাতে ঘুম না ভাঙে সেজন্যে সাবধানে ঘুরপথে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে যাবে রানা, কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকা মেয়েটা কথা বলে উঠলো, 'স্টীম রোলারে চ্যাপ্টা হতে চাইছি।'

তৃতীয়বার বাজতে শুরু করলো ফোনের বেল। রিসিভার তুললো রানা, একটা মাত্র শব্দ উচ্চারণ করলো, 'হ্যালো?'

অপরপ্রান্ত থেকে ওর কণ্ঠস্বর চিনতে পারলো গগল। একাই কথা বলে গেল সে। তার কথা শেষ হতে রিসিভার নামিয়ে রাখলো রানা, গড়ান দিয়ে লিলির ওপর থেকে বিছানায় নামলো।

'কে, কেন—কিছুই আমি জিজ্ঞেস করবো না,' বললো লিলি। চাদরের বাইরে শুধু তার সুন্দর মুখটা বেরিয়ে আছে। চোখ বন্ধ, নড়লো শুধু ঠোঁট জোড়া। 'কিন্তু ভুলে যেয়ো না আমি তোমার স্ত্রী

'অ্যাই! কি করছো!' চেঁচিয়ে উঠলো সে। চাদরের তলায় ঢুকে

লিলিকে বুকে টেনে নিয়েছে রানা আবার। 'ছাড়ো। এখন ঘুমাবো··· ধ্যেৎ! কি হচ্ছে! হি হি!'

তারপর দ্বিতীয়বার ঘুম ভাঙলো একটা পঞ্চাশ মিনিটে। ঘরের ভেতরটা অন্ধকার, ভারি পর্দা গলে রোদ বা আলো কিছুই ঢুকতে পারছে না। বাইরে দিনের সবচেয়ে বেশি গরম এখন, একশো এক ডিগ্রী, তবে কামরার ভেতরটা ঠাণ্ডা। হাতঘড়ি দেখে সতর্ক হয়ে গেল রানা, বেশি সময় নেই। ডালচিমস্কি এখন কি করছে? পর-মুহূর্তে ভাবলো, এ-ধরনের প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামানো স্রেফ বিলাসিতা। সরাসরি কাজে নেমে পড়তে হবে ওকে। পা টিপে টিপে বিছানা থেকে নামলো ও। তারপর বিছানার ওপর ঝুঁকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলো নগ্ন নারীদেহ।

'আমি কি এতোই কুৎসিত?' এবারও ঘুম ভেঙে গেছে লিলির।

হেসে ফেললো রানা। উত্তর না দিয়ে বাথরুমে ঢুকলো ও। শাওয়ার সেরে দাড়ি কামালো, টয়লেটে ঢুকে আমেরিকান এক্সপ্রেস কার্ডের পিছন থেকে বের করলো পাসপোর্ট সাইজের একটা ফটো, দুই প্রস্থ প্লাস্টিকের মাঝখানে লুকানো ছিলো ওটা। কামরায় ফিরে এসে দ্রুত কাপড় পরলো ও।

'কোনো মেয়ের কাছে না গেলেই হলো!' রানার দিকে পিছন ফিরে শুয়ে রয়েছে লিলি।

'দরজাটা বন্ধ করবে না?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'তারচেয়ে বাইরে থেকে আমাকে তালা দিয়ে রাখাই তো ভালো,' বললো লিলি। 'চাইলেও পালাতে পারবো না।'

'পালিয়ে যাবে কোথায়! খুঁজে বের করে ফেলবো না

'কেমন খুঁজতে জানো সে তো দেখতেই পাচ্ছি,' খোঁচা দিয়ে

বললো লিলি।

লাগলোও রানাকে। নিঃশব্দে কামরা থেকে বেরিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে দরজায় তালা দিলো ও। হোটেলের গ্রাউণ্ড ফ্লোরে নেমে এসে অটো রেন্টাল কোম্পানী থেকে গাড়ি ভাড়া করলো একটা।

ক্রীম কালারের মার্সিডিজটা বেলা সাড়ে তিনটের সময় একটা ফটো স্টুডিওর সামনে দাঁড় করালো রানা। পাঁচটার সময় দেখা করলো অ্যালিস টেনডেলের সাথে।

একেবারে বাঘের ঘরে, পুলিশ হেডকোয়ার্টারের ভেতর। রিসেপশনে অপেক্ষা করার সময় অস্বস্তি বোধ না করে পারলো না রানা। শরীর এবং অবচেতন মনের জানা আছে, পুলিশ মাত্রেই তার শত্রু। স্বদেশী, বিদেশী, সব পুলিশ সম্পর্কেই কথাটা খাটে। এসপিওনাজ এজেন্ট হিসেবে কাজ করতে গিয়ে বেশিরভাগ সময়ই আইন ভাঙছে রানা, ওর প্রায় প্রতিটি কাজ গোপনীয় আর বেআইনী। আইন ভাঙার সুযোগ ভোগ করে বলেই ওর ক্ষমতা একজন পুলিশ অফিসারের চেয়ে কয়েক শো গুণ বেশি। কিন্তু পুলিশ যদি ওকে চ্যালেঞ্জ করে, লেজ দাবিয়ে পালানো ছাড়া ঝামেলা বা বিপদ এড়াবার পথ থাকে না।

খানিক পর ভেতরের একটা অফিস থেকে বেরিয়ে এলো অ্যালিস টেনডেল। মাথা নেড়ে কথা বলতে নিষেধ করলো সে, ইঙ্গিতে অনুসরণ করতে বলে আবার ভেতরে ঢুকে গেল। তার পিছু পিছু ছোট্ট একটা অফিস কামরায় ঢুকলো রানা। কামরার চারদিকে দেয়াল রয়েছে, মাঝামাঝি অংশ থেকে সিলিং পর্যন্ত কাঁচ।

'ভিনসেন্ট গগল আপনার খুব প্রশংসা করলো,' একটা চেয়ারে বসে বললো রানা।

'বলুন আপনার জন্যে কি করতে পারি আমি,' জিজ্ঞেস করলো সার্জেন্ট অ্যালিস টেনডেল।

লোকটার গায়ের রঙ তামাটে, পেশীবহুল শরীর। মুখটা সব সময় হাসি হাসি। বছরে ষোলো থেকে আঠারো হাজার ডলার বেতন পায়, সেদিক থেকে বিচার করলে তার পরনের স্যুটটা একটু বেশি দামী হয়ে গেছে বলতে হবে। হীরে বসানো সোনার আঙটি আর রোলেক্স হাতঘড়িও অন্য রকম গল্প শোনায়।

'একজন নিখোঁজ লোকের সন্ধান চাইছি,' বললো রানা। 'হতে পারে তার স্মৃতিভ্রংশ ঘটেছে।'

গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লো সার্জেন্ট। তারপর আবার হাসি হাসি মুখ করলো। 'কে, মিস্টার প্লেয়ার ?'

'একজন বুককিপার, আমাদের পারিবারিক এক প্রতিষ্ঠানে কাজ করছিল ।দূর সম্পর্কের আত্মীয়ও হয়—অনেক দুর সম্পর্কের।'

সার্জেন্টের চোখে কৌতূহলের আলো ফুটে উঠলো। 'এটা কি তাহলে একটা পারিবারিক ব্যাপার, স্যার ?'

পরিবার বা পারিবারিক, এ-সব শব্দের একটাই মানে—মাফিয়া। অ্যালিস টেনডেল জানতে চাইছে কেসটার সাথে কোনো প্রতাপশালী মাফিয়া পরিবার জড়িত কিনা।

'হ্যাঁ—পুব উপকূলের একটা পরিবার তাকে হারিয়ে শোকে কাতর হয়ে পড়েছে,' বললো রানা। মাফিয়া পরিবারের নিজস্ব ভাষায় শোকে কাতর এই শব্দ দুটোর আলাদা অর্থ আছে। শোকে কাতর মানে রাগে অন্ধ।

সার্জেন্টের চেহারায় স্থায়ী আসন গাড়তে যাচ্ছে গাম্ভীর্য। ঘন ঘন মাথা ঝাঁকালো সে। আন্দাজ করার চেষ্টা করছে কতো টাকা আশা

করা উচিত হবে। নেহাত ঠেকায় না পড়লে মাফিয়ারা পুলিশের কাছে সাহায্যের জন্যে আসে না। তবে নিজেকে লোকটা স্মরণ করিয়ে দিলো, ভিনসেন্ট গগলের দোস্ত, বুঝেশুনে হাত পাততে হবে।

আবার মুখ খুললো রানা, 'লোকটা মাস কয়েক আগে নিখোঁজ হয়েছে, সার্জেন্ট। আমরা সবাই তার ব্যাপারে উদ্বেগের মধ্যে আছি। এখানেও থাকতে পারে, আবার অন্য কোথাও-ও থাকতে পারে —কিছুই জানি না'।

'সাথে যথেষ্ট টাকা-পয়সা আছে?'

'ফার্মের মোটা একটা টাকা তার সাথে থাকার কথা। আমরা সন্দেহ করছি সে তার স্মরণশক্তি হারিয়ে ফেলেছে।'

প্রাণটাও হারাতে যাচ্ছে, মনে মনে ভাবলো টেনডেল। মাফিয়ার টাকা মেরে দিয়ে কেউ আজ পর্যন্ত পার পায়নি। যতো খরচই পড়ুক ওরা তাকে ঠিকই খুঁজে বের করবে। এটা একটা নীতির প্রশ্ন। সে নিজেও নীতি মেনে চলে, কাজেই এ-ধরনের কাজে তার সমর্থন এবং শ্রদ্ধা আছে। হত্যাকাণ্ডের সাথে সরাসরি জড়াতে না হলে ওদের সে সাহায্য করবে।

জন প্লেয়ার নামে পরিচয়-দাতা লোকটা টেবিলের ওপর একটা ফটো রাখলো। ফটোর পাশে রাখলো মোটা একটা সাদা এনভেলাপ। 'ওর নাম নিক,' বললো রানা। 'নিক ডালো। কালো চোখ, কামানো মাথা, তবে পরচুলা পরে থাকতে পারে। চৌকো, ছয় ফিট লম্বা। ভালো ইংরেজী বলতে পারে না, কথার মধ্যে বিদেশী টান আছে।'

সার্জেন্ট ভাবছে, এনভেলাপে কতো টাকা? 'কতো দিন ধরে নিখোঁজ?'

'সম্ভবত দু'তিন মাস। আমরা চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি। আপনারা হয়তো তার নামটা মিসিং পারসন তালিকায় তুলে দিতে পারবেন, তারপর টেলিটাইপ···।'

কৌতুক বোধ করলো সার্জেন্ট টেনডেল। মাফিয়া পরিবারগুলোর নার্ভ আছে বলতে হবে! নিজেদের কাজে তারা এমনকি জাতীয় পুলিশ টেলিপ্রিন্টার সার্ভিসকেও কাজে লাগাতে চায়! 'ঠিক আছে, ক্যাপটেনকে জিজ্ঞেস করে দেখবো,' আশ্বস্ত করলো সে।

ফটো আর এনভেলাপ নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল টেনডেল। সন্দেহ নেই, টয়লেটে বসে টাকা গুণতে গেল। খানিক পরই ফিরে এলো সে, হাতে শুধু ফটোটা রয়েছে, এনভেলাপটা সম্ভবত পকেটে। 'মিস্টার প্লেয়ার, আমরা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করবো।'

'ধন্যবাদ, সার্জেন্ট।' দুটো আঙুল দেখালো রানা। 'খুঁজে বের করতে পারলে।'

'আপনি শুধু জানতে চান, মিস্টার ডালো-কে কোথায় পাওয়া যাবে, এই তো? নাকি চান আমরা তাকে আটক করবো?'

'না, সার্জেন্ট, না। তেমন মারাত্মক কিছু করেনি সে। বেচারা শুধু ভুলে গেছে সে কে আর তার আসল ঠাঁই কোথায়।'

'কোথায় উঠেছেন আপনি, মিস্টার প্লেয়ার?'

'নিস শ্যাতো, খুব সুন্দর হোটেল।'

'কিন্তু ওখানে স্ট্রিপটিজ হয় না,' অভিযোগের সুরে বললো সার্জেন্ট টেনডেল।

'সময় কাটাবার কথা যদি বলেন, স্ট্রিপটিজের চেয়ে রাইফেল রেঞ্জ আমাকে বেশি টানে,' বললো রানা। 'ভাবছি একটু ঠাণ্ডা পড়লে শিকারে বেরুবো।'

রানাকে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলো সার্জেন্ট টেনডেল। স্নাইপার? হিট ম্যান? কিন্তু পেশাদার খুনীদের চেহারা তো এরকম হয় না। দেখে তো মনে হয় যেন কলেজে অধ্যাপনা করে, তবে অ্যাথলেটিক্সে অলিম্পিক স্বর্ণপদক ছিনিয়ে এনেছে।

কিন্তু আজকাল অবশ্য জোর করে কিছুই বলা যায় না। হতে পারে, এই চেহারার আড়ালে লোকটা পেশাদার খুনীও হতে পারে। রানাকে সে জানালো, চার মাইল দূরে একটা নাইট রেঞ্জ আছে, আলোর ব্যবস্থা ভালোই, তাপমাত্রা আশি ডিগ্রীতে নামলে ওখানে গিয়ে প্র্যাকটিস করা যেতে পারে। পরামর্শের জন্যে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলো রানা।

হোটেল কামরায় ফিরে লিলিকে পেলো না রানা। সবচেয়ে খারাপ সম্ভাবনাটাই আগে জাগলো মনে। তবে একটু পরই জানা গেল কেউ লিলিকে খুনও করেনি, এফ. বি. আই. তাকে গ্রেফতার করেও নিয়ে যায়নি। আরেকটা চাবি ছিলো তার কাছে, দরজা খুলে সুইমিং পুলে সাঁতার কাটতে গিয়েছিল। ফিরতে অবশ্য দেরি হয়েছে, কারণ প্রৌঢ় এক লোক গদগদ হয়ে কাছে ভেড়ার চেষ্টা করেছিল। রাজকীয় ডিনার খাওয়ার প্রস্তাব পায়ে ঠেলে ফিরে এসেছে লিলি। রানাকে সে বললো, 'আমি যে তোমার সতী সাধ্বী স্ত্রী, প্রমাণ হলো?'

একবারও জিজ্ঞেস করলো না কোথায় গিয়েছিল রানা। রাত দশটার পর ডিনার খেয়ে আবার যখন বেরুলো রানা, তখনো লিলি জানতে চাইলো না কোথায় যাচ্ছে সে। মার্সিডিজ নিয়ে সরাসরি ক্লাবে চলে এলো রানা। কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে রাজি করালো তাদের, কিছু টাকা হাত-বদল হলো। এক ঘন্টা প্র্যাকটিস করতে

পারবে রানা। ইচ্ছে করলে অতিরিক্ত অ্যামুনিশনও কিনতে পারবে।

একের পর এক, বারবার ফায়ার করলো রানা। প্রতিবার ভালো রেজাল্ট করলো। নতুন রাইফেল নিয়ে রাতের বেলা প্র্যাকটিস করার অভিজ্ঞতা কাজে লেগে যেতে পারে। কেউ জানে না কখন কোথায় ডালচিমস্কির সাথে দেখা হয়ে যাবে তার।

চার

সন্ধ্যা ছ'টার খবরে কিছুই বলা হলো না, হতাশায় ম্লান হয়ে গেল ডালচিমস্কির চেহারা। কোথাও কিছু ধ্বংস হলে তার খবর যোগাড় করার ব্যাপারে মার্কিন রিপোর্টাররা ভারি পটু। রেডিও বা টিভিতে দুর্ঘটনার কথা দিয়েই শুরু করা হয় খবর পড়া। প্রায়ই শোনা যায়, শিকাগোর একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে আগুন লেগে যাওয়ায় পঞ্চান্ন ব্যক্তি অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা গেছে, ডালাস কিংবা নিউ অর্লিয়ন্সে উন্মাদ এক স্নাইপার বিনা কারণে সতেরোজন শিশুকে গুলি করে মেরেছে, স্কুল বাস খাদে পড়ে যাওয়ায় শিক্ষক সহ বাহান্নজন ছাত্রের সলিল সমাধি ইত্যাদি। এ-সব খবর দৈনিক পত্রিকাগুলোতেও প্রথম পৃষ্ঠায় ফলাও করে ছাপা হয়। তবে টোকিও বা কাঠমণ্ডুতে প্রাক-

তিক দুর্বিপাকে পাঁচ-সাতশো লোক মারা গেলে রেডিও বা টিভিতে খবরটা এলেও, একেবারে শেষের দিকে দু'এক কথায় সেরে দেয়া হয়, আর কাগজগুলোয় ছাপা হয় ভেতরের পাতায় ছোট্ট করে। সান্ধ্য সংস্করণ কিনে প্রথম পৃষ্ঠায় চোখ বুলালো ডালচিমস্কি। কোনো খবর নেই। আশ্চর্য ব্যাপার তো, টেক্সাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটা অংশ! ঘটনা ঘটেছে অথচ গুরুত্ব পায়নি, এমন হতেই পারে না।

তাহলে কি কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটা চেপে গেছে

অস্বস্তিকর হতে পারে মনে করে সোভিয়েত সরকার প্লেন দুর্ঘটনা সহ আরো অনেক ঘটনার কথা চেপে যায়। দেখাদেখি আমেরিকান সরকারও সে-পথ ধরেছে নাকি?

ডিনার খেতে খেতে আপনমনে মাথা নাড়তে লাগলো ডালচি-মস্কি। উঁহুঁ, তা সম্ভব নয়। এ-ধরনের একটা খবর ইচ্ছে করলেই চেপে রাখা যায় না। একটা নয়, দুটো নয়, চল্লিশটা নিউক্লিয়ার ওঅ-রহেড! সবগুলো বিস্ফোরিত হলে কল্পনার বাইরে আওয়াজ হবে। সে আওয়াজ চেপে রাখা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আর আগুন? তা-ও তো আকাশ ছোঁবে! একশো মাইল দূর থেকে দেখতে পাবে মানুষ!

হয়তো সবগুলো বিস্ফোরিত হয়নি।

হয়তো এয়ারফোর্সের 'স্পেশাল উইপনস' বাঙ্কারের কাছে সিকিউরিটি গার্ডরা হ্যারি মার্কসকে গুলি করে মেরে ফেলেছে!

ঠিক আছে, মাথা ঠাণ্ডা করো। সে-ধরনের কিছু ঘটে থাকলেও, এগারোটার খবরে নিশ্চয় বলা হবে। এগারোটার খবরে কম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও বাদ পড়ে না।

সাড়ে দশটা থেকে রুট সেভেনের নামকরা একটা বারে বসে আছে ডালচিমস্কি। এগারোটার খবরে ইণ্ডিয়ান গর্জ, টেক্সাস, বা কাছে-পিঠের এয়ার বেস সম্পর্কে একটা কথাও বলা হলো না। প্রাক্তন কে. জি. বি. ডকুমেন্টস এক্সপার্ট অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো। গোটা ব্যাপারটার একটা ব্যাখ্যা না থেকে পারে না। আবিষ্কার করলো, মাত্রা ছাড়িয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছে সে।

নিশ্চয়ই কোথাও কিছু গোলমাল হয়েছে। এর আগে প্রতিবার সব কিছু ঠিকঠাক মতো সম্পন্ন হয়েছে, কিন্তু এবারের ব্যাপারটা কেঁচে গেছে। তাড়াতাড়ি হোটেলে ফিরে এসে স্যুটকেস গোছাতে লাগলো সে, এখানে আর এক মুহূর্ত নয়। গোলমাল কিছু যদি ঘটেই থাকে, সবচেয়ে নিরাপদ হবে কেটে পড়া। মুহূর্তের মধ্যে গায়েব হয়ে যাওয়া।

না।

রাত দুপুরে হোটেল ছেড়ে চলে গেলে লোকের মনে সন্দেহ হবে।

রাতে ভালো ঘুম হলো না। ব্রেকফাস্ট সেরে হোটেলের বিল মেটালো ডালচিমস্কি, পিটসফিল্ডের রেন্টাল এজেন্সিতে ফিরিয়ে দিলো গাড়িটা। সকাল এগারোটায় বাসে চড়লো, ম্যাসাচুসেটস টার্ণপাইক হয়ে বোস্টনের দিকে ছুটলো বাস। বার্কশায়ারে আসাটাই তার বোকামি হয়ে গেছে, কারণ এখানে কোনো রেল বা এয়ার সার্ভিস নেই। বোস্টনের মতো বড় শহরে থাকলে যে-কোনো মুহূর্তে যে-কোনো দিকে রওনা হওয়া সম্ভব। তাছাড়া প্রচুর লোকজনের ভিড়ে নিরাপদ বোধ করবে সে। ওখান থেকে ইচ্ছে করলে মন্ট্রি-অলও চলে যেতে পারে।

মুখ তুললো। ডালচিমস্কি, আঁটসাঁট ব্লাউজ পরা যুবতী এক মেয়ের ঢাউস বুকের ওপর চোখ আটকে গেল। ধীর পায়ে 'রেস্ট রুম'-এর দিকে চলে গেল। রেস্ট রুম মানে টয়লেট, রাশিয়ার বাসগুলোয় এ-ধরনের সুযোগ সুবিধে থাকে না। কিন্তু টয়লেটের কথা বা আমেরিকায় কি আছে আর রাশিয়ায় কি নেই এ-সব সে ভাবছে না। ভাবছে মেয়েটার কথা। না, তাও সে ভাবছে না। কিছুই ভাবছে না। যুবতী মেয়েটার যৌবন দেখে রিয়্যাক্ট করছে তার শরীর। তার ভেতর কি যেন একটা আপনাআপনি নড়ে উঠেছে, নড়ে উঠে নিঃসঙ্গতার কথা আর নিজের শরীরের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। শরীর আর মনের চাহিদা দমন করার চেষ্টা করলো সে, তিরস্কার করলো নিজেকে, কিন্তু মেয়েটাকে রেস্ট রুম থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে ঘন ঘন ঢোক গিললো, চোখ ফেরাতে পারলো না। নিজেকে সে বোঝাবার চেষ্টা করলো, একটা মেয়ে বা তার নিজের শরীরের চাহিদার চেয়ে মিশনটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। টেলি-বম ফাটাবার আনন্দের সাথে আর কিছুর কোনও তুলনা চলে না।

কিন্তু কোথায় সে আনন্দ? হ্যারি মার্কস বিস্ফোরিত হয়নি।

একবার না পারিলে দেখো শতোবার! একজোড়া স্তনের কথা ভুলে গিয়ে কাজের কথা ভাবো।

বোস্টনের পার্ক স্কয়্যারে বাস থেকে নামলো সে। আরলিংটন স্ট্রীট খুব বেশি দূরে নয়, হেঁটেই চলে এলো হোটেল হিলটন পর্যন্ত। বড়-সড় হোটেল, এগারো শো কামরা। লোকজনের ভিড়ে নিরাপদ বোধ করলো সে। তবু সারাটা দিন উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তার মধ্যে কাটলো। মারাত্মক কিছু একটা যে ঘটেছে তাতে আর সন্দেহ কি। হেরাল্ড আমেরিকান-এর সান্ধ্য সংস্করণেও কোনো খবর থাকলো না।

বিপদের আশংকা করতে লাগলো ডালচিমস্কি। তার মনে হতে লাগলো, কারা যেন দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে তার দিকে ছুটে আসছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা হোটেল কামরায় পায়চারি করেও উত্তেজনা কমানো গেল না। রুম সার্ভিসকে ডেকে ঘরেই ডিনার দিতে বললো, টেলিভিশনের সামনে থেকে নড়তে চায় না। নতুন একটা ভয় উঁকি দিচ্ছে মনের আনাচেকানাচে—হোটেলের নিচে হয়তো ওত্ পেতে আছে অজানা কোনো বিপদ। পুলিশ হতে পারে, এফ. বি. আই. হতে পারে। গোটা হোটেল ঘিরে রেখেছে। অপেক্ষা করছে কখন সে নামবে।

দূর, নিজেকে ধোঁকা দেয়ার কোনো মানে হয় না! আমেরিকান পুলিশ বা এফ. বি. আই. তার সম্পর্কে কিছুই জানে না। জানে রুশ মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স আর কে. জি. বি.। কে. জি. বি. এজেন্টদের পাঠানো হয়েছে বলে মনে হয় না, কারণ তাদের মধ্যে কে স্ট্যালিনপন্থী আর কে নয় কেউ তা জানে না। এলে আসলে গ্রুর কমাণ্ডোরা আসবে, এসেছেও তারাই।

তা আসুক। খাতাটা ওদের পেতে হচ্ছে না।

পায়চারি করতে করতে বিড় বিড় করছে ডালচিমস্কি। সত্যি যদি দেখি হোটেলটা ঘিরে ফেলছে ওরা, সাথে সাথে টেলিফোন করতে শুরু করবো। তার আগে দরজায় চেয়ার-টেবিল-ওয়ার্ডরোব ঠেকিয়ে ভেতরে ঢোকার পথটা বন্ধ করতে হবে। বিশটা ফোন করতে এক ঘণ্টার মতো সময় লাগবে তার। এখন থেকে শুরু করলে মাঝরাতের মধ্যে সবগুলো টেলি-বম ফাটিয়ে দিতে পারবে সে।

জানালার দিকে হেঁটে গেল ডালচিমস্কি। সাততলা নিচে রাস্তা। গ্রুর লোকদের যদি দেখা যায়, আমেরিকা আর রাশিয়ার দুর্ভাগ্য

বলতে হবে সেটা। গোটা দুনিয়ার দুর্ভাগ্য।

কিন্তু নিচের রাস্তা প্রায় ফাঁকা। দু'একজন পথিক ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। কেউ দাঁড়িয়ে নেই। রাস্তার কিনারায় কোনো গাড়িও থেমে নেই।

রাত দশটার কিছু পর কামরা থেকে বেরুলো ডালচিমস্কি। পিছনের সিঁড়ি ব্যবহার করলো সে, এলিভেটরে চড়তে ভয় করছে। জানে, এলিভেটরে বোমা ফিট করে রাখতে খুব পছন্দ করে গ্রুর কমাণ্ডোরা।

বিশাল ধড় নিয়ে সাততলা থেকে গ্রাউণ্ড ফ্লোরে নেমে এসে হাঁপাতে লাগলো সে। টয়লেটে ঢুকে বসলো, জিরিয়ে নিচ্ছে। তারপর লাউঞ্জে বেরিয়ে এসে চারদিকে সতর্ক চোখে তাকালো। লোকজনের মধ্যে কেউ তার শত্রু থাকতে পারে। যুবক-যুবতীদের একটা দল দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, গলা ছেড়ে হাসছে তারা, বুদ্ধি করে তাদের সাথে ভিড়ে গেল সে। হোটেলের বাইরে বেরিয়ে এসে পিছন দিকটা দেখে নিলো। না, কেউ অনুসরণ করছে না। হন হন করে হাঁটতে শুরু করলো সে। কোথায় যাচ্ছে জানে না। শুধু জানে, নোংরা কোনো এলাকায় যেতে হবে। যেখানে সস্তা ছায়াছবি দেখানো হয়, থিয়েটারের মঞ্চে প্রায় উলঙ্গ হয়ে অভিনয় করে মেয়েরা, অলিতে গলিতে ঘুর ঘুর করে বেশ্যাগুলো।

দুশ্চিন্তা-মুক্ত হবার জন্যে খানিক আনন্দ-ফুর্তি করা দরকার তার আজ।

ঘণ্টা দেড়েক হাঁটার পর জায়গামতো পৌঁছে গেল ডালচিমস্কি। রাস্তার দু'ধারে সার সার দরজা, প্রতিটি দরজা আলোকমালায় সাজানো। দরজার পাশেই টিকেট কাউণ্টার। ভেতরে লম্বা একটা

করিডর, করিডরে সার সার বাক্স আকৃতির ঘর। ঘরের ভেতর একটাই টুল, সেটায় বসে একটা গোল ফুটোয় চোখ রাখতে হয়। ফুটোর ওদিকে আলোকিত মঞ্চ, এক জোড়া যুবক-যুবতী আদিম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করছে। অন্তত দরজার পাশের দেয়ালে সাঁটানো পোস্টারে সে প্রতিশ্রুতিই দেয়া হয়েছে।

একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে লাগলো ডাল-চিমস্কি। টিকেট ঘরে বসা লোকটা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্য দিকে তাকালো। এ ধরনের প্রৌঢ় খদ্দেরদের স্বভাব তার জানা আছে। প্রায় সবাই প্রথম প্রথম ভেতরে ঢুকতে ইতস্তত বোধ করে। কিন্তু একবার শো দেখার পর নিয়মিত দর্শক বনে যায়। চোখাচোখি হলে লজ্জা পেয়ে সরে যেতে পারে।

চোখাচোখি হলো না, তবু সরে গেল ডালচিমস্কি। প্রায় ছুটতে শুরু করলো সে। রাস্তার তু'পাশে হন্যে হয়ে কি যেন খুঁজছে। হঠাৎ তার চেহারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। যা খুঁজছিল পেয়ে গেছে।

প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে ফোন বুদের ভেতর ঢুকলো ডালচিমস্কি। জ্যাকেটের পকেটে হাত ভরে খুচরো পয়সাগুলো স্পর্শ করলো। খুচরো পয়সা কোনো সমস্যা নয়। উত্তর আমেরিকায় পা দেয়ার পর থেকে সব সময় তিন ডলারের মতো খুচরো পয়সা পকেটে রাখছে সে। দরকার হলেই যাতে বোমাবাজি শুরু করে দিতে পারে। পকেটে পয়সা থাকায় নিজেকে তার সশস্ত্র বলে মনে হচ্ছে।

ফোনটার দিকে তাকিয়ে থাকলো ডালচিমস্কি। ঘেমে গোসল হয়ে গেছে, তবে শীত, গরম বা শরীরের কথা ভাবছে না সে। মুখের ভেতরটা শুকিয়ে গেছে, খেয়াল করলো না। ধড়াস ধড়াস করছে

বুকের ভেতরটা। রিসিভার তুলে টেক্সাসের নম্বরে ডায়াল করতে শুরু করলো। কাজটা হয়তো বোকামি কিংবা নেহাতই বিপজ্জনক হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তবু তাকে জানতে হবে।

'হ্যালো,' নারীকণ্ঠ, গলায় টেক্সাসের সুরে, খুব একটা কম নয় বয়স।

'মিঃ হ্যারি মার্কস··· ?'

অপরপ্রান্তে কয়েক সেকেণ্ড কোনো শব্দ হলো না, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাসের আওয়াজ পাওয়া গেল। 'আপনি বোধহয় খবর পাননি। মিঃ মার্কস অ্যাক্সিডেন্ট··· ।'

তাকে শেষ করতে না দিয়ে প্রায় চিৎকার করে জানতে চাইলো ডালচিমস্কি, 'নিশ্চয়ই সিরিয়াস কিছু নয় ?'

আবার নিঃশ্বাস ফেলার আওয়াজ হলো। 'সিরিয়াস,' মহিলা বললো। 'ইন্টারস্টেট ধরে কাল তিনি গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন, এয়ার বেসের দিকে। বড় একটা ট্রেইলর ট্রাক পাহাড়ের ঢাল বেয়ে তার পিছু পিছু নামছিল, ব্রেক ফেল করে। ধাক্কা লাগার সময় ট্রাকের স্পীড ছিলো আশি, তাঁর গাড়ি খাদে পড়ে যায়।'

চোখ বুজলো ডালচিমস্কি, দৃশ্যটা কল্পনা করার চেষ্টা করলো। খাদের কিনারা থেকে চ্যাপ্টা গাড়িটা খসে পড়ছে। 'মিঃ মার্কস···?'

'মারা গেছেন,' মহিলা বললো। 'ভয়াবহ, এক কথায় ভয়াবহ। তিনি কোনো সুযোগই পাননি।'

অ্যামবুশ ?

ফাঁদে ফেলে মারা হয়েছে তাকে ?

গ্রু কমাণ্ডোরা এ-ধরনের দুর্ঘটনার আবরণেই শত্রুদের যমের বাড়ি পাঠায়, জানা আছে ডালচিমস্কির। ডীপ-কাভার এজেণ্টদের

সে ব্যবহার করার আগে কমাণ্ডোরা তাদের মেরে ফেলবে, সিদ্ধান্ত নিয়েছে গ্রু? 'দুঃখজনক, মর্মান্তিক...,' বিড়বিড় করে বললো সে।

'সবই ঈশ্বরের ইচ্ছে। আপনি তাঁর বন্ধু?'

'ঠিক তা নয়, জানাশোনা ছিলো। দয়া করে মিসেস মার্কসকে আমার সহানুভূতি জানাবেন।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। আমি তার বোন।'

রিসিভার রেখে দিয়ে ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকলো ডালচিমস্কি, কাঁপছে। শুধু উদ্বিগ্ন নয়, ভয়ও পেয়েছে। মার্কসকে যদি মেরে থাকে, অন্যান্যদের ওপরও তাহলে চোখ রাখছে ওরা। হয়তো পঞ্চাশ জনের একটা দল পাঠিয়েছে গ্রু। মেক্সিকো আর কানাডায় এরকম দল আছে ওদের। তারা হয়তো ওকেও খুঁজছে। পরচুলা পরেছে, নতুন গোঁফ গজিয়েছে ঠোঁটের ওপর, তবু ওকে তারা চিনে ফেলতে পারে। ট্রেনিং পাওয়া শিকারী তারা, শিকারের খোঁজে বেরিয়ে খালি হাতে ফেরে না। ফোন বুদ থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে বিড়বিড় করে বললো সে, 'আমাকে ধরা অতো সহজ নয়!'

'কিন্তু আমি তোমার হাতে ধরা দিতে চাই, প্রিয়তম।' হেসে উঠে প্রায় ডালচিমস্কির গায়ে গড়িয়ে পড়লো মেয়েটা। সেই বাসে দেখা মেয়েটার কথা মনে পড়ে গেল ডালচিমস্কির। এই মেয়েটার বুকজোড়া তার চেয়েও বড়। ছাব্বিশ কি সাতাশ বছর বয়স, চোখ আর ভুরু নাচিয়ে নিজেই বলে দিচ্ছে, পতিতা। ঠোঁটে সবজান্তার হাসি, কাপড় থেকে ভুর ভুর করে সেন্টের কড়া গন্ধ বেরুচ্ছে। সস্তা-দরের কীট একটা, পশুশক্তি প্রয়োগ করার জন্যে আদর্শ পাত্রী হতে পারে। ওর সাথে গেলে অন্তত ঘণ্টাখানেক গ্রুর কথা ভুলে থাকা যায়।

ডালচিমস্কিকে ইতস্তত করতে দেখে খিল খিল করে হাসলো মেয়েটা। 'নিজেকে ঠকিয়ো না হে, আত্মাকে কষ্ট দিয়ো না! বোঝাই যাচ্ছে, অ্যাকশন দরকার তোমার।'

'তা দরকার,' স্বীকার করলো ডালচিমস্কি।

'এসো তাহলে একটা পার্টির ব্যবস্থা করি,' প্রস্তাব করলো মেয়েটা। 'আমার এক গার্লফ্রেণ্ড আছে, একই কামরায় থাকি আমরা। সোনালি মেয়ে। ভা-আ-আ-রি দুষ্টু। আর এতো সব মজার মজার কৌশল জানে না, কি বলবো। কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছো?'

'মন্দ কি!' রাজি হয়ে গেল ডালচিমস্কি। কিন্তু মন সায় দিচ্ছে না। এতোটা অসংযমী হওয়া কি উচিত হচ্ছে? বিশেষ করে নিজেকে যখন চিনি? বন্ধ ঘরে দুটো মেয়েকে পেয়ে যদি নিজেকে সামলে রাখতে না পারি? আরে দুর, আমি কি অবোধ শিশু? 'চলো তাহলে। কোথায়?'

'পঞ্চাশ ডলার, ঠিক আছে?' জিজ্ঞেস করলো মেয়েটা। 'কাজ দেখে তোমার অবশ্য পাঁচশো ডলার দিতে ইচ্ছে করবে।' জিভের ডগা বের করে ঠোঁট ভেজালো সে। ডালচিমস্কিকে যেন বিশ্বাস করতে হবে মেয়েটা উত্তেজনায় অস্থির হয়ে আছে।

তৃতীয় শ্রেণীর একটা হোটেলে এলো ওরা। লাল চোখে ঘুম নিয়ে দরজা খুলে দিলো দ্বিতীয় মেয়েটা। হাড্ডিসারই বলা চলে, অস্বাভাবিক লম্বা, শেষবার কবে গোসল করেছে বলা মুশকিল। সোনালি চুল, কিন্তু রঙ করা। আগে পঞ্চাশ ডলার দিতে হলো, তারপর ওরা বিবস্ত্র করলো ডালচিমস্কিকে। দু'জন ধরাধরি করে বিছানায় শুইয়ে দিলো তাকে। তারপর বিবস্ত্র হলো নিজেরা। সবই যান্ত্রিক-

ভাবে ঘটছে, এর আগে বহু বার এ-সব করেছে ওরা। চোখ বুজে পড়ে থাকলো ডালচিমস্কি। শরীরটাকে ওদের হাতে ছেড়ে দিয়ে মাথাটাকে চিন্তা-শূন্য করার চেষ্টা করলো সে।

'তুমি নিউ ইয়র্ক থেকে আসছো, ডার্লিং?' লম্বা মেয়েটা জিজ্ঞেস করলো।

'হ্যাঁ, তবে আমার জন্ম হল্যাণ্ডে।'

'কথা শুনে আঁচ করা যায়।'

আদরের মাত্রা ধীরে ধীরে বাড়তে লাগলো।

'তুমি ক্লান্ত,' প্রথম মেয়েটা বললো। 'হাত-পা কিছুই তোমাকে নাড়তে হবে না, যা করার সব আমরা করছি।'

মেয়েটা বলার পর ডালচিমস্কিরও তাই মনে হলো, সে ভীষণ ক্লান্ত। কতোক্ষণ পর জানে না, হঠাৎ চোখ মেলে উপলব্ধি করলো, ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। অন্তত কয়েক মিনিট তো বটেই। ঘুমটা ভেঙেছে ইঞ্জিনের শব্দে, রাস্তা দিয়ে ভারি একটা ট্রাক ছুটে গেছে বলে মনে হলো। সোনালি মেয়েটা এখনো তার গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে রয়েছে, আদর করছে তাকে। কিন্তু প্রথম মেয়েটা বাথরুমে। খোলা দরজা দিয়ে তাকে দেখতে পেলো ডালচিমস্কি, সিঙ্কের ওপর আয়নায় তার প্রতিবিম্ব।

ডালচিমস্কির মানিব্যাগ খুলে ভেতরটা দেখছে সে।

সাথে সাথে বুঝতে পারলো ডালচিমস্কি কি করতে হবে। দু'হাত তুলে খপ্ করে সোনালি চুল মেয়েটার গলা পেঁচিয়ে ধরলো সে, তারপর হ্যাঁচকা টান দিয়ে মট্ করে ভেঙে ফেললো ঘাড়। তৃপ্তির একটা ঢেউ বয়ে গেল তার সারা শরীরে। একেই বলে গায়ের জোর!

নিষ্ঠুর এক চিলতে হাসি ঠোঁটে নিয়ে বিছানায় ওপর উঠে বসলো ডালচিমস্কি। নিঃশব্দ পায়ে মেঝেতে নামলো সে। টেবিল থেকে তুলে নিলো টেবিল-ল্যাম্পটা। সুইচবোর্ডের সামনে থেমে প্লাগটা খুললো। বাথরুমের দরজার সামনে এসে দেখলো, ব্যস্তভাবে টাকা গুণছে মেয়েটা।

চার হাজার তুশো বাষট্টি ডলার। মেলা টাকা! আপনমনে হাসতে লাগলো মেয়েটা। ঘাড় ফেরাতে শুরু করলো সে। টেবিল-ল্যাম্পের গোড়াটা সর্বশক্তি দিয়ে তার মুখের ওপর নামিয়ে আনলো ডাল-চিমস্কি, মধুর হাসিটুকু থ্যাঁতলানো মুখের ভেতর সেঁধিয়ে দিলো। টলমল করতে লাগলো অসহায় নারী, তার গলায় কর্ডটা পেঁচালো ডালচিমস্কি। নব্বই সেকেণ্ড পর মারা গেল বিশাল বক্ষ মেয়েটা। মেঝে থেকে মানিব্যাগ আর টাকা তুলে দ্রুত কাপড় পরলো ডালচিমস্কি। মেয়েটার নীল আণ্ডারপ্যাণ্ট দিয়ে ল্যাম্পের গোড়াটা মোছার ব্যর্থ চেষ্টা করলো সে। হোটেল থেকে বেরুবার সময় ভাবলো, তেমন কিছু এসে যায় না। স্রেফ বেশ্যা ছিলো ওরা। কেউ ওদের অভাব বোধ করবে না। পচে তুর্গন্ধ না ছোটা পর্যন্ত কেউ হয়তো জানতেও পারবে না কিছু।

ততোক্ষণে অনেক দূরে চলে যাবে ডালচিমস্কি। অন্তত এক হাজার মাইল দূরে। তার পকেটে থাকবে খাতাটা আর তিন ডলার খুচরো পয়সা। তুনিয়ার সবচেয়ে বিপজ্জনক মানুষ ডালচিমস্কি কোথায় আছে কেউ তা জানবে না।

পাঁচ

মানুষ বোধহয় বেশিরভাগই কিছুটা সৎ কিছুটা অসৎ। অন্তত সার্জেণ্ট টেনডেল সেরকম একজন মানুষ। অবৈধ পয়সা খায় সে, তবে বিনিময়ে নিষ্ঠার সাথে দ্রুত কাজও করে দেয়। পুরোপুরি অসৎ হলে নিখোঁজ ব্যক্তিদের তালিকায় নিক ডালোর নামটা তুলতো না বা টেলি-প্রিন্টারের সাহায্যে তার চেহারার বর্ণনা সারা দেশে প্রচারের ব্যবস্থাও করতো না। শুধু যে চেহারার বর্ণনা আর নামটা প্রচার পেলো তাই নয়, এফ. বি. আই. আর পুলিশ বিভাগের টেলি-ফটো সার্ভিসের কল্যাণে দেশের সবগুলো রাজ্যের সবগুলো পুলিশ স্টেশন আর এফ. বি. আই. শাখা অফিসে নিক ডালোর অর্থাৎ নিকোলাই ডালচিমস্কির ফটোও পৌঁছে গেল। কে. জি. বি. চীফ লুদভিক কায়কোভস্কি যদি জানতে পারতেন ডকুমেণ্টস এক্সপার্টের ফটো মার্কিন পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে মাসুদ রানা নির্ঘাৎ মূর্ছা যেতেন তিনি।

পঞ্চাশটা রাজ্যের স্টেট, সিটি, এবং ফেডারেল পুলিশ সেদিন বিকেল থেকেই নিক ডালোকে খুঁজতে শুরু করলো। কাজটা রুটিন,

কাজেই কেউই কোনোও টেনশনে ভুগলো না। শুধু এই একজন লোককে খুঁজছে না তারা—চুরি যাওয়া গাড়ি, পলাতক কিশোর-কিশোরী, ড্রাগস বিক্রেতা, অদৃশ্য আসামী, লুঠ হওয়া স্বর্ণালংকার, এবং আরো হাজার হাজার লোক আর মালামাল খুঁজে বের করতে হবে তাদের।

পরদিন জর্জিয়াতে ডালো নামে এক লোক গ্রেফতার হলো। কিন্তু তার বয়স মাত্র চব্বিশ, নতুন চাকরিতে ঢুকে তহবিল মেরে দিয়ে পালাবার চেষ্টা করছিল।

ডেট্রয়টের একজন মটরসাইকেল পেট্রলম্যান একটা ইমপেরিয়াল গাড়ির পিছু নিলো। তার সন্দেহ হলো, ড্রাইভার লোকটার চেহারা নিক ডালোর মতো। খানিক পর জানা গেল, ভদ্রলোক ফোর্ড মটর করপরেশনের একজন ভাইস-প্রেসিডেন্ট। সান ফ্রান্সিসকো-য় গ্রেফতার করা হলো এক লোককে। থানায় নিয়ে এসে জেরা করার সময় জানা গেল—বয়স চেহারা ইত্যাদি অনেকটা মিললেও লোকটা আসলে লোক নয়, মেয়েলোক—পাঁচ ফিট এগারো ইঞ্চি লম্বা লেসবিয়ান। থানা থেকে বেরুবার সময় সে বলে গেল, পুলিশের বিরুদ্ধে মানহানির কেস করার কোনো ইচ্ছেই তার নেই।

ওহায়ো থেকে খবর এলো, সেখানকার পুলিশ নাক্সোস ডালো-পোলিস নামে এক প্রৌঢ়কে গ্রেফতার করেছে, লোকটা অশ্লীল ছবির ব্যবসা করে।

ওদিকে রানা ওর শুটিং প্র্যাকটিস চালিয়ে যাচ্ছে। রোজ রাতে এক ঘণ্টা করে রেঞ্জে থাকে ও, হাতের টিপ ঝালিয়ে নেয়। তারপর সঙ্গিনীকে নিয়ে বের হয় শহর দেখতে, নামকরা রেস্তোরাঁয় ডিনার খায়, ক্যাসিনোয় জুয়া খেলে, আর নাইটক্লাবে নাচানাচি করে

হোটেলে ফিরে আসে। পরদিন দুপুর বারোটার আগে ওদের ঘুম ভাঙে না।

এক রাতে লিটল স্টার ক্যাসিনোয় রুলেৎ খেলে দুশো ডলার জিতলো রানা। একটা টেবিলে বসে বিয়ার খাচ্ছে, ওয়েটার এসে চিরকুট দিয়ে গেল একটা। রানা সেটা পড়ছে, অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে লিলি বললো, 'দেখবো না।'

'এক্সকিউজ মি,' বলে চেয়ার ছাড়লো রানা। সোজা টয়লেটে গিয়ে ঢুকলো ও। চওড়া এনভেলাপে মোড়া একটা প্যাকেট রিসিভ করে বেরিয়ে এলো। লিলির কাছে যখন ফিরে এলো, হাতে কিছুই নেই।

'কে ডেকেছিল, কি কথা হলো, কিছুই আমি জানতে চাইবো না,' বললো লিলি।

'এই না হলে আদর্শ স্ত্রী!'

ক্যাসিনোর চারদিকে চোখ বুলালো লিলি। 'ডাকাতি করে এখান থেকে কেউ পালাতে পারবে বলে মনে হয় না, তুমি কি বলো? সিকিউরিটি সিস্টেমে কোনো খুঁত না থাকারই কথা।'

সিগারেট ধরালো রানা। 'কোনো কাজই অসম্ভব নয়। যোগ্য লোক, উপযুক্ত ইকুইপমেন্ট, নিখুঁত প্ল্যান দাও, ফোর্ট নক্স লুঠ করে আনতে পারি। সম্পূর্ণ নিরাপদ বলে কোনো জায়গা নেই। হয়তো ভেতরের এক লোকের সাহায্য দরকার হবে। ওরলি এয়ারপোর্ট, কুরিয়ার সেন্টারে কি ঘটেছিল, মনে আছে তোমার?'

মাথা ঝাঁকালো লিলি।

'কি যেন নাম লোকটার? শিকাগো ট্রিবিউনে পুরো ঘটনাটা ছাপা হয়েছিল। জনসন। পঁচিশ বছর জেল হয় তার। সার্জেন্ট জনসন।'

মার্কিন আর্মির একজন সার্জেন্ট ছিলো লোকটা, মনে পড়লো লিলির। আর্মড ফোর্সের কুরিয়্যার সেন্টারে অসংখ্য টপ সিক্রেট ডকুমেন্ট ছিলো, প্রায় সবগুলোর ফটো তুলে পাচার করতে যাচ্ছিলো লোকটা। মনে করা হতো, ভল্টটার ধারেকাছেও কেউ পৌঁছুতে পারবে না। বারোজন সশস্ত্র গার্ড পালা করে চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দিতো। খরচ বহুল ইলেকট্রনিক সিকিউরিটি সিস্টেমকে ফাঁকি দিয়ে ভল্টে হাত দেয়া সত্যি অসম্ভব বলে মনে হতো। কিন্তু এই অসম্ভব-কেই সম্ভব করে দেখায় জনসন। সেই থেকে অনেক এসপিওনাজ অর্গানাইজেশনের ট্রেনিং প্রোগ্রামে জনসনের ক্লাসিক অপারেশন ঠাঁই করে নিয়েছে। 'তুমি পারবে—এখানে?' অনেকটা বিদ্রূপের সুরে জিজ্ঞেস করলো লিলি।

'আন্দাজ করি পারবো, কিন্তু কার দায় পড়েছে? কিছুক্ষণ পরপর সরিয়ে ফেলা হচ্ছে টাকা—হানা দিলে বেশি হলে আশি হাজার থেকে এক লাখ ডলার পাবে তুমি। যদি ডাকাতি করতে চাই, বড় একটা ব্যাংক বেছে নেবো। আমরা যাকে খুঁজছি, ওই ব্যাটাও তাই বেছে নিয়েছিল, তুমি জানো? তার মতো আমি অবশ্য কাউকে খুন করবো না।'

'বলতে চাইছো ব্যাংক ডাকাত হিসেবে তারচেয়ে যোগ্য তুমি?'

'দশ গুণ।'

'কিন্তু অস্বীকার করতে পারবে কোনো কোনো কাজে তোমার চেয়ে অনেক বেশি যোগ্য সে?'

এক সেকেণ্ড চিন্তা করলো রানা। তারপর মাথা নাড়লো। 'কেন অস্বীকার করবো! অনেক কিছুতেই আমার চেয়ে ভালো সে। একটা সার্টিফিকেট এখুনি তাকে দেয়া যায়—চ্যাম্পিয়ান টেলিফোনার।

এই, আরেক দফা বিয়ার চলবে নাকি ?'

'কফি ?' সি. আই. এ. হেডকোয়ার্টার, করিডরে চ্যারিটি উডস্টকের সাথে দেখা হয়ে গেল কর্নেল জিল ক্যাসেলের।

মাথা ঝাঁকালো উডস্টক। ক্যাফেটেরিয়ার দিকে এগোলো ওরা। আড়চোখে তাকিয়ে জিল ক্যাসেল নিশ্চিত হলো, হ্যাঁ, আজও চ্যারিটি ব্রেসিয়ার পরেনি। অর্থাৎ পরপর ছ'দিন! চ্যারিটির এ এক ধরনের উদ্ভট জেদই বলতে হবে, ভাবলো সে। নাহয় তার নতুন, হালকা গোলাপি ব্রেসিয়ারটার দিকে বারবার তাকতো সে, তাই বলে রেগেমেগে সেটা চিরকালের জন্যে খুলে ফেলতে হবে ? এখন যে তাকাচ্ছি, এখন কি করবে ? 'গলব্রেথের সাথে কথা বলছিলাম,' নরম সুরে বললো সে।

হেনরি গলব্রেথ কর্নেল নয়, এজেন্সির সিনিয়র কর্মকর্তাদের একজন। চোদ্দ বছর ধরে গাধার খাটনি খেটে জিল ক্যাসেলের সমমর্যাদায় উঠে এসেছে লোকটা। ওয়ার্কিং গ্রুপ ফাইভে সি. আই. এ.-র প্রতিনিধিত্ব করে সে। সেজন্যে বছরে আট হাজার ডলারের বেশি বেতন পায়। টলস্টয়, চেকভ, ফিদেল কাস্ট্রোর যৌন-জীবন সম্পর্কে যা কিছু জানার সব জানে। খুব ভালো দাবা খেলে।

'তারমানে বড় ধরনের ঝামেলায় পড়েছিলেন আপনি,' বললো চ্যারিটি উডস্টক।

'ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ার ঘটনা আর কলোরাডোর ঘটনা, দুটোর মধ্যে কোনো যোগসূত্র আছে কিনা জিজ্ঞেস করছিল,' বললো কর্নেল। 'বললো, এফ. বি. আই. নাকি লিভেনওয়ার্থ আর্মি হসপিটালের ঘটনাটা নিয়ে খুব চেতে আছে।'

কাঁধ ঝাঁকালো চ্যারিটি। একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে কর্নেল ভাবলো, ওর নগ্ন কাঁধে হাত রাখার জন্যে আরো সাধনা করতে হবে আমাকে।

'এ-সব ব্যাপারে আমরা কিছু জানি না, জানলেও এই মুহূর্তে মুখ খুলতে রাজি নই।'

'ঠিক তাই তাকে বলেছি, চ্যারিটি। বলেছি, আমাদের ধারণা সবগুলোই সম্ভবত পাগল-ছাগলদের কাণ্ড।'

আবার কাঁধ ঝাঁকালো চ্যারিটি, রীতিমতো শব্দ করে ঢোক গিললো জিল ক্যাসেল।

'বেন সুইটল্যাণ্ডও আমার অফিসে এসেছিল,' বললো সে।

'তিনি আবার কি চান?'

'বিগ রড সম্পর্কে জানতে চাইছিল,' বললো ক্যাসেল। 'কন্ট্রোল রুম থেকে হয়ে আমার কাছে আসে।'

'তারমানে তিনি জানেন, দ্বিতীয় পাখিটাও গাইছে না!' গম্ভীর হলো চ্যারিটি। 'আপনার কাজিন সম্পর্কে নিশ্চয়ই খুব উদ্বেগ প্রকাশ করলো?'

'মাত্রা ছাড়িয়ে। কিন্তু আমি তাকে বলে দিয়েছি, ওর ব্যাপারে তাকে মাথা ঘামাতে হবে না।'

'আপনার কাজিনকে জানিয়েছেন, ছারপোকাটা ধরা পড়েছে?' জিজ্ঞেস করলো চ্যারিটি, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই লক্ষ্য করলো, তার বুকের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে জিল ক্যাসেল।

'আমরা তাকে চিনতে পেরেছি,' তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বললো জিল ক্যাসেল। 'কিন্তু ধরিনি। দ্বিতীয় পাখিটাও গাইছে না, তারমানে প্রমাণ সহ এখন তাকে ধরা বেশ কঠিনই হবে বলে মনে হচ্ছে।'

'আপনার জায়গায় আমি হলে চ্যাপেলকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিতাম,' বললো চ্যারিটি। 'সুযোগ না পেলে একজন লোক কিভাবে বেঈমানী করবে?'

'এই জন্যেই তোমাকে আমার এতো ভালো লাগে··· শুরু করলো ক্যাসেল।

তাকে থামিয়ে দিয়ে চ্যারিটি বললো, 'ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে কিছু বলার থাকলে আগে একটা নোটিস দেবেন, মিঃ ক্যাসেল। কেননা আমারও তো শোনার জন্যে একটা প্রস্তুতি থাকা দরকার।'

মাথা নিচু করে নিয়ে ক্যাসেল বললো, 'তোমার তো এতোদিনে বোঝার কথা যে আমি খুব লাজুক প্রকৃতির মানুষ···।'

আবার তাকে বাধা দিলো চ্যারিটি, 'নোটিস!'

ক্যাফেটেরিয়ায় বসলো ওরা। ক্যাসেল বললো, 'ঠিক আছে, আজ তোমাকে নোটিস দিলাম···।'

'আবার যেদিন কফি খেতে আসবো এখানে সেদিন আপনার কথা শোনা যাবে,' বললো চ্যারিটি। 'এখন কাজের কথা হোক, কেমন?'

'কাজের কথা?'

'বেন সুইটল্যাণ্ড বা হেনরি গলব্রেথ, এদেরকে সন্তুষ্ট করা দরকার,' বললো চ্যারিটি। 'তা না হলে ডিরেক্টরের কাছে অভিযোগ করে বলবে, আমরা সহযোগিতা করছি না।'

ওয়েটার ওদেরকে কফি দিয়ে গেল।

'কিভাবে সন্তুষ্ট করতে চাও?' আগ্রহী হয়ে উঠলো কর্নেল।

'অ্যানালিস্ট হিসেবে আমার ওপর খুব আস্থা ওদের। ভার্জিনিয়া, কলোরাডো, এবং লিভেনওয়র্থে যা যা ঘটেছে সব লিখে ফেলবো

আমি, তারপর গবেষণা করবো…।'

'গবেষণার ফলাফল কি হবে আমি আন্দাজ করতে পারছি,' হাসতে লাগলো কর্নেল।

'পাগলদের কাণ্ড,' বললো চ্যারিটি। 'দিন কয়েক অন্তত বোকা বানিয়ে রাখা যাবে ওদের।'

'গুড আইডিয়া, চ্যারিটি,' খুশি হয়ে উঠলো কর্নেল। 'তাড়াতাড়ি শেষ করো তোমার গবেষণা। কাল বাদে পরশু এখানে বসে ফলাফলটা নিয়ে আলোচনা করতে পারি আমরা, কি বলো?'

'আপনি কিন্তু মোটেও লাজুক নন, মিঃ জিল ক্যাসেল,' বললো চ্যারিটি, 'স্যার। ওদিকে কেন, আমার চোখের দিকে তাকাতে পারেন না?'

জিল ক্যাসেলের হাতের কাপ থেকে লাফ দিয়ে টেবিলে পড়লো খানিকটা কফি। চ্যারিটি উডস্টকের বুকের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে তার চোখের দিকে তাকালো সে। মেয়েটা হাসছে দেখে ধড়ে প্রাণ ফিরে এলো তার।

'তোর ইয়ে করি, ইয়ংব্লাড!'

রোজ সকালে মনে মনে গালটা দিয়ে তারপর কাজে হাত দেয় জর্জ স্যাক্সটন। ডিটেকটিভ পুলিশ অফিসার হিসেবে যোগ্য এবং সৎ সে, কিন্তু তার দাদার বাবা সিসিলীয় মাফিয়া পরিবারের একজন প্রতাপশালী সদস্য ছিলো এ-কথা তো আর মিথ্যে নয়। কাজেই কেউ তাকে অপমান করলে বা অসুবিধেয় ফেললে ঐতিহ্যবাহী রক্তে প্রতিশোধ নেয়ার স্পৃহা জাগে। আইনের লোক, ছুরিতে শান না দিয়ে শান দেয় মুখে। বেলুন আকৃতির পেট বিশিষ্ট লেফটেন্যান্ট

ইয়ংব্লাড প্রায় এক বছর হলো হোমিসাইড ডিভিশনে বদলি করে পাঠিয়েছে স্যাক্সটনকে। বোস্টন পুলিশ ডিপার্টমেণ্টের কেউই বাধ্য না হলে হোমিসাইডে আসতে চায় না। কারণ হোমিসাইডে ডিউটি দিতে হয় বিরতিহীন চব্বিশ ঘণ্টা, অথচ বেতন সবাই যা পায় তাই। খুন-খারাবি কোথাও না কোথাও ঘটছেই, আর রিপোর্টাররা চিনে-জোঁকের মতো সব সময় লেগে থাকছে গায়ে। গরম গরম এমন সব খবর আর চোখা চোখা এমন সব অভিযোগ ছাপা হয় কাগজগুলোয়, প্রতি মুহূর্তে আতঙ্ক থাকে এই বুঝি চাকরিটা গেল। রিপোর্টারদের ধারণা, দেড় ঘণ্টার মধ্যে প্রতিটি হত্যা রহস্যের কিনারা হয়ে যাওয়া উচিত। এদের জানা নেই, পুলিশ স্ট্যাটিস্টিক্স বলে, পারিবারিক কলহের জের হিসেবে যে-সব খুন-খারাবি ঘটে সেগুলো বাদে বাকি খুনগুলোর রহস্য বেশিরভাগই অনুদঘাটিত থেকে যায়।

ডেস্ক থেকে তুলে নিয়ে ফটো দুটো আবার দেখলো স্যাক্সটন। এক জোড়া নিহত বেশ্যা। একেবারেই সাধারণ, কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। দু'জনেরই কালো চুল, তবে একজনের সোনালি রঙ করা। যার পেটে অপারেশনের দাগ রয়েছে গত বছর দু'বার তাকে গ্রেফ-তার করা হয়। এ বছর শীতে তিন মাসের জেল খেটে বেরোয় দ্বিতীয় মেয়েটা—মহিলা-জেলখানায় থাকার সময় সিফিলিসের চিকিৎসা করায় সে। সস্তাদরের মেয়ে ছিলো ওরা, খুনও হয়েছে সস্তাদরের এক হোটেলে। অথচ কাগজগুলো এমন চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে যেন দু'জন বিশ্ব সুন্দরীকে হারিয়েছে তারা।

মায়ের ওপর ঘৃণা আছে এমন কোনো লোক খুন দুটো করে থাকতে পারে, ভাবলো স্যাক্সটন। মেয়েদের যারা খুন করে তাদের মধ্যে এই অদ্ভুত একটা মিল দেখা যায়, বেশিরভাগই তারা মাকে ঘৃণা

করে। কিংবা এমন কোনো লোকের কাণ্ড, স্কুল জীবনে যৌন কেলেংকারীতে জড়িয়ে পড়েছিল, অপমানটুকু আজও ভুলতে পারেনি।

মেয়ে দুটো সাধারণ, কিন্তু খুনী লোকটাকে সাধারণ ভাবা যাচ্ছে না।

মলি কাউন্টারের বয়স পঁচিশ, কানাডা থেকে আমদানী। রিটা টেমপল স্থানীয়, পনেরো বছর বয়সে স্কুল থেকে পালায়। ল্যাব কর্মীরা খুব ভালোভাবে পরীক্ষা করেছে কামরাটা। অ্যাশট্রে থেকে শুকনো ঘাসের ভাঙা অংশ, কার্পেটের এক ধার থেকে কুকুরের পশম, বিছানা থেকে শক্ত একটা পাকা চুল পেয়েছে তারা। চুলটা সম্ভবত কারো গোঁফ থেকে খসে পড়া। নগদ টাকা পাওয়া গেছে আটানব্বই ডলার। বেশ অনেকগুলো হাতের ছাপও পাওয়া গেছে।

ওগুলোর মধ্যে ডালচিমস্কির ডান হাতের ছাপও রয়েছে, কিন্তু জর্জ স্যাক্সটন তা জানবে কিভাবে? সে একজন ডিটেকটিভ, জাদুকর নয়। কাজেই রাজ্যের রাজধানী স্প্রিংফিল্ডে ওগুলো পাঠিয়ে দেয় সে, দু'দিন পর সেখান থেকে রিপোর্ট এলো—শুধু নিহত মেয়ে দুটোকে আইডেনটিফাই করা গেছে। এরপর স্যাক্সটন অপর নমুনাটা ওয়াশিংটনে পাঠিয়ে দিয়েছে, এফ. বি. আই.-এর মাস্টার ন্যাশনাল প্রিন্ট ফাইলে রাখা নমুনাগুলোর সাথে মিলিয়ে দেখার জন্যে।

চুইংগাম চিবাতে চিবাতে স্যাক্সটন ভাবলো, কুকুরের পশমটাও কি পাঠানো উচিত ছিলো? মাথা নাড়লো সে, খুন তো আর কুকুরটা করেনি! করেছে একটা দানব। লোকটা যে অস্বাভাবিক শক্তিশালী তাতে কোনো সন্দেহ নেই। লম্বা মেয়েটাকে, যার চুল সোনালি রঙ করা, ঘাড় মটকে মারা হয়েছে। দ্বিতীয় মেয়েটাকে খুন

করা হয়েছে টেবিল-ল্যাম্পের গোড়া দিয়ে বাড়ি মেরে। চওড়া মুখ ছিলো মেয়েটার, প্রায় সবটাই ভেতর দিকে ডেবে গেছে—প্রচণ্ড গায়ের জোর দরকার হয়েছে। লোকটা মেয়ের দালাল হতে পারে? মাথা নাড়লো ডিটেকটিভ স্যাক্সটন। দালাল হলে কামরায় আটা-নব্বই ডলার পাওয়া যেতো না।

ফোন বেজে উঠলো।

রিসিভার তুললো স্যাক্সটন। ফেডারেল হেডকোয়ার্টার থেকে টেলি-প্রিন্টারে রিপোর্ট আসতে শুরু করেছে। 'আসছি,' বলে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সে।

চার মিনিট পর প্রিন্ট-আউট নিয়ে নিজের কামরায় ফিরে এলো।

নমুনা পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। এই হাতের ছাপ মাস্টার ফাইলে নেই। যারই হাতের ছাপ হোক ওটা, কখনো মার্কিন সেনাবাহিনীতে ছিলো না সে, বা পঞ্চাশটা রাজ্যের কোথাও কখনো গ্রেফতার হয়নি।

তবে ভবিষ্যতে লোকটা আবার কোনো অপরাধ করতে পারে। চোখ-কান খোলা রেখে অপেক্ষা করবে স্যাক্সটন। ফোনের রিসিভার তুলে সংশ্লিষ্ট মহলকে নির্দেশ দিলো সে, 'ফাইলে লিখে রাখো খুনী সন্দেহে খোঁজা হচ্ছে তাকে। সম্ভবত সশস্ত্র এবং বিপজ্জনক। পরিচিত দু'জন বেশ্যাকে খুন করেছে, এই অভিযোগে গ্রেফতার করতে হবে।'

নগদ তিন লাখের বেশি ডলার ও আমেরিকান এক্সপ্রেস চেক নিয়ে ব্রডওয়ে আর কলম্বাসের কোণে দাঁড়িয়ে রয়েছে নিকোলাই ডালচিমস্কি। নিউ ইয়র্কে নয়, সানফ্রান্সিসকোয়। নামকরা এক রেস্তোরাঁয়

সী-ফুড ডিনার খেয়েছে সে। একটা বারে বসে তিন আউন্স হুইস্কি গিলেছে। বেশ কিছুক্ষণ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগার পর হাভানা চুরুট কিনেছে এক প্যাকেট। কিনে ভালোই করেছে, এখন আর হাত দুটোকে নিয়ে কোনো সমস্যায় পড়তে হচ্ছে না। ধূমপানে সে তেমন অভ্যস্ত নয়, তবে চুরুট টানতে কোনো অসুবিধেও হচ্ছে না। স্বস্তিবোধটা ফিরে এসেছে মনে। আঙুলের ফাঁকে চুরুট থাকায় হাত দুটো আগের মতো আর নিশপিশ করছে না।

ট্যাক্সি নিয়ে এয়ারপোর্ট থেকে আসার সময় সিটে একটা ম্যাগাজিন পেয়েছিল, তাতেই মেয়েটার নাম আর ফটো দেখে সে। বারবারা র‍্যাফোর্ড, সাধারণ একটা নাম। কিন্তু ম্যাগাজিনে লেখা হয়েছে, ড্যান্সার হিসেবে মেয়েটা নাকি অসাধারণ। তার নাচ দেখে আশি বছরের বুড়োও নাকি যৌবন ফিরে পায়। চার ভঙ্গিতে চারটে ছবি ছাপা হয়েছে তার, দেখে হাঁ হয়ে গেছে ডালচিমস্কি। একটা শরীরে এতো যৌবন ধরে কি করে!

বারবারা টপলেস ড্যান্সার, রীদম নাইট ক্লাবে রোজ রাতে তার প্রোগ্রাম থাকে।

রীদমের সামনে পৌঁছে সত্যি সত্যি দম আটকে এলো ডালচিমস্কির। দোতলা সমান বিকিনি পরা রঙিন পোস্টারের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকলো সে। চড়া দাম দিয়ে টিকেট কিনে লাইনে দাঁড়ালো সে।

গভীর রাতে নাইট ক্লাব থেকে ঘামে গোসল হয়ে বেরিয়ে এলো ডালচিমস্কি। মাথাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরছে। ভেতরের কলকব্জা সব যেন সচল হয়ে উঠেছে। কয়েকটা ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো সে।

এরপর যে ডীপ-কাভার এজেন্টের ঘুম ভাঙাবে তার নাম স্যালি ডানকান। নিউ ইয়র্ক, ইথাকা-য় একটা বোর্ডিং হাউস চালায় সে। প্রায় বারো বছর ধরে। তারপর ছ'দিন করে বিরতি নিয়ে আরো চারটে টেলি-বম ফাটাবে ডালচিমস্কি। এই চারটের পর বাকিগুলোর ঘুম ভাঙাবে সে প্রতি ঘণ্টায় বিশজনের। ধ্বংসের বিরতিহীন ঢেউ আতঙ্কিত করবে মানুষকে, গোটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অস্থির উত্তেজনায় ছটফট করবে। পাল্টা আঘাত হানতে বাধ্য হবে পেন্টাগন। ইউ. এস. মিসাইল আর বম্বারগুলো লক্ষ্যস্থলের দিকে একবার রওনা হয়ে গেলে ক্রেমলিনের ভিলেনরা প্রাণভয়ে ভীত ইঁদুরের মতো ছুটোছুটি করবে, কিন্তু তখন আর কারুরই কিছু করার থাকবে না।

তবে এ-সব দেখার জন্যে উপস্থিত থাকবে না ডালচিমস্কি, কারণ শেষ টেলিফোনগুলো মায়ামির একটা বুদ থেকে করবে সে। যুদ্ধ শুরু হবার আগেই প্লেনে করে রিও রওনা হয়ে যাবে। ফোন করতে মোট কতো পয়সা লাগবে হিসেব করে রেখেছে, অতিরিক্ত দশ ডলার খুচরো পয়সা সহ পকেটেই আছে সব। হ্যাঁ, গোটা পরিস্থিতি এখনো তার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ওরা হয়তো তাকে খুঁজছে, কিন্তু তার হদিশ বের করা অতো সহজ নয়, কাজেই আতঙ্কিত হবার কিছু নেই।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে হাতঘড়ি দেখলো ডালচিমস্কি। ছুটো দশ। বারবারা তার খুব উপকার করেছে, এখন একটা মেয়ে দরকার। আশপাশের রাস্তায় ছু'একটা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। আপনমনে হাসতে লাগলো ডালচিমস্কি। আবার যদি কোনো মেয়ে তার মানি-ব্যাগ হাতড়ায়, একশো ত্রিশ ডলারের বেশি পাবে না। এতো অল্প টাকার জন্যে কাউকে খুন করার দরকার কি! প্রথমবার ভুলই হয়ে

গেছে, মেয়ে দুটোকে খুন না করলেও পারতো সে। একই ভুল করে স্যান ফ্রান্সিসকো পুলিশকে খোঁচানো বোকামি হয়ে যাবে। বোস্টনের মেয়ে দুটোর ভাগ্য খারাপ, তিক্ত হেসে ভাবলো সে।

ভাগ্য তার বদলেছে। নিগ্রো এক মেয়ের সাথে দেখা হলো তার, মেয়েটার মায়াভরা চোখ। আধ ঘণ্টার জন্যে মাত্র ত্রিশ ডলার নিলো। বেশি কথা হলো না, পেশাদারী দক্ষতার সাথে মেয়েটা তার ভূমিকা পালন করলো। তাকে খুন করতে হলো না বলে বিরাট স্বস্তি বোধ করলো ডালচিমস্কি। ভাবলো, কাল রাতেও হয়তো ভাগ্য সহায়তা করতে পারে, তাকেও হয়তো খুন না করে পারবে সে।

ছয়

ইথাকা কলেজের চেয়ে চার গুণ বড় করনেল ইউনিভার্সিটি, তবে দুটোরই আলাদা ঐতিহ্য, গুরুত্ব, এবং বৈশিষ্ট্য রয়েছে। শহরটা গড়ে উঠেছে আপার নিউ ইয়র্ক স্টেটের আকর্ষণীয় একটা এলাকা জুড়ে। ইথাকা ছাত্র-ছাত্রীদের শহর হিসেবেই পরিচিত। ট্যুরিস্টরা বড় একটা এদিকে আসে না, তবে অভিভাবকদের আসা-যাওয়ার বিরাম নেই। বেশিরভাগ তারা হলিডে ইন বা শেরাটন মটর ইনেই

ওঠে, ট্যাক্সি বাদেই প্রতিদিনের জন্যে ভাড়া গুণতে হয় পনেরো থেকে বিশ ডলার। ছাত্ররা অতো পয়সা পাবে কোথায়, কাজেই তারা দলবেঁধে কোনো অ্যাপার্টমেন্ট বা সস্তাদরের কোনো বোর্ডিং হাউসে ঠাঁই করে নেয়। এ-ধরনের একটা বোর্ডিং হাউসের মালিক স্যালি ডানকান। তার বোর্ডিং হাউসটা তিনতলা, মোট নয়টা কামরা আছে, করনেল ক্যাম্পাস থেকে গাড়িতে মাত্র পাঁচ মিনিটের পথ। দালানের সামনে ছোটো লন আর চওড়া পোর্চ আছে, লনের কিনারা ঘেঁষে সার সার ঝাঁকড়া-মাথা গাছ, রোদ উঠলে প্রচুর ছায়া পাওয়া যায়।

বারো-তেরো বছর আগে মিঃ ডানকান নামে এক লোক ছিলো বটে। লোকটার দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, ফুড পয়জনিঙে অকস্মাৎ মারা যেতে হয় বেচারাকে। ফুড পয়জনিঙের কারণটা অবশ্য জানা যায়নি, তবে সে যে বাসি সসেজ খেয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মিসেস ডানকান হাসিখুশি, মোটাসোটা মহিলা। মাতৃসুলভ নানা গুণের অধিকারিণী। অচেনা অতিথিকে মুহূর্তের মধ্যে আপন করে নিতে পারে। কারো বিরুদ্ধে তার কোনো অভিযোগ নেই। কিছুটা আপনভোলা, এমন একটা পোশাক নেই যেটা তার গায়ে সুন্দর-ভাবে ফিট করে। অতিথিদের জন্যে নিজেই রান্না করে সে। ব্যক্তি-গতভাবে কামরায় কামরায় গিয়ে অতিথিদের খোঁজ-খবর নেয়। তার একটা শখ হলো মাটির হাঁড়ি-পাতিল, পেয়ালা-বাসন তৈরি করা। সবই যে বিক্রি করে তা নয়, কিছু কিছু দানও করে সে। নতুন অতিথিরা তার হাতে কাদা-মাটি দেখে বিস্মিত হলেও পুরনো অতিথি বা ইথাকার লোকজন দৃশ্যটার সাথে পরিচিত। রান্নাবান্না ভালোই করে সে, দামও তেমন বেশি নয়।

স্যালি ডানকান ঘরকুনো মানুষ, বোর্ডিং হাউস ছেড়ে কোথাও বড় একটা যায় না। পড়শিদের সবার সাথে তার সম্পর্ক ভালো। তারা জানে, স্বামী মারা যাওয়ার পর গাড়িতে চড়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছে মিসেস ডানকান। ইথাকার লোকজন পরস্পরকে সাহায্য করতে ভালোবাসে, কাজেই স্যালি ডানকানের অনেক সমস্যার সমাধান আপনাআপনি হয়ে যায়। তার বাজার করার কাজটা পড়শি-রাই খুশি মনে করে দেয়।

ইথাকার দুটো সংগঠনের সাথে জড়িত স্যালি ডানকান। নেচার ক্লাব আর বার্ড ওয়াচারস লীগ। উনিশশো তিয়াত্তর সাল থেকে লীগের ট্রেজারার সে, প্রতি বসন্তে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়ে আসছে। বছরে এক কি দু'বার মিটিঙে উপস্থিত থাকতে হয় তাকে, তখনই শুধু বোর্ডিংহাউস থেকে বেরোনো হয় তার। আর বাইরে বেরুনোর সময় অদ্ভুত একটা কাণ্ড করে সে। অতিথিদের সাথে আলোচনা করে একজনকে নির্বাচিত করা হয়, তার অনু-পস্থিতির সময়টুকু সেই লোক বোর্ডিংহাউস ছেড়ে মুহূর্তের জন্যেও কোথাও যাবে না, এবং যে কোনো টেলিফোন মেসেজ আসা মাত্র খাতায় লিখে রাখবে। বোর্ডিংহাউস ছাড়ার আগে ফোনের সামনে নিজের হাতে খাতা আর পেন্সিল রেখে যায় স্যালি ডানকান। বলে যায়, অতিথিরা নির্দিষ্ট দশ মিনিট সময়-সীমার মধ্যে বাইরে কোথাও ফোন করতে পারবে, বাকি সময় মুক্ত রাখতে হবে লাইন। নিয়মটা হাউস রুল হিসেবে মেনে চলতে হবে সবাইকে।

কারণটার সরল একটা ব্যাখ্যাও আছে। স্যালি ডানকানের অসুস্থ এক বোন আছে ওহায়োতে। হঠাৎ করে তার অসুস্থতা বেড়ে যেতে পারে, বা যে-কোনো দিন মারা যেতে পারে সে। কাজেই

সময় মতো খবর পাবার জন্যে ফোনের লাইন মুক্ত রাখা দরকার। সত্যি তার কোন বোন ওহায়োতে আছে কিনা সেটা অবশ্য আলাদা প্রশ্ন, কেউ এ ব্যাপারে কখনো কৌতূহল প্রকাশ করেনি। স্যালি ডানকানের এ-ধরনের ব্যক্তিগত গোপন ব্যাপার আরো দু'চারটে আছে বৈকি, কিন্তু সে-সব সম্পর্কে তার নিজেরও ভালো ধারণা নেই। ওডেসায় তার দুই ভাই আছে। এক বোন আছে মারমানস্ক-এ, ইনস্টিটিউট অভ আর্কটিক মেডিসিন-এর ডেপুটি ডিরেক্টর।

মিঃ ডানকান ভিয়েৎনাম যুদ্ধের সময় ইউ. এস. আর্মিতে এঞ্জি-নিয়ার ছিলো। হঠাৎ একদিন একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করে সে। স্ত্রী মাটির হাঁড়ি-পাতিল তৈরি করে, কিন্তু তার কাদা মাটিতে সি-থি প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভের গন্ধ কেন? স্বামীর কৌতূহল দমন করতে ব্যর্থ হয়ে অগত্যা তাকে বিদায় করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হলো স্যালি ডানকানকে। মনের ভেতর থেকে বলিষ্ঠ নির্দেশ পেয়ে কাজটা সারলো সে, এবং তারপর বেমালুম ভুলে গেল। সম্মোহনের এমনই জাদুকরী গুণ।

হপ্তা ঘুরে আজ আবার বৃহস্পতিবার রাত এসেছে। অতিথিরা বৃহস্পতিবার রাতের জন্যে আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করে। কারণ আজকের রাতেই স্পেশাল পর্ক চপ পরিবেশন করে স্যালি ডান-কান, সাথে ওয়াটারমেলনের খোসা দিয়ে তৈরি আচার থাকে। করনেল ইউনিভার্সিটির ভাইস-চ্যান্সেলর একবার বলেছিলেন, স্যালি ডানকানের পর্ক চপ ইথাকার একটা গর্ব।

সাড়ে ছ'টা বাজে। বড় একটা ডিশে করে পর্ক চপ নিয়ে ডাইনিং রুমে ঢুকছে স্যালি ডানকান, ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠলো ফোনটা। স্কুল অভ এগ্রিকালচারের ইনস্ট্রাক্টর ভদ্রলোক দেখলেন

স্যালি ডানকানের হাত জোড়া, কাজেই তিনিই রিসিভারটা তুললেন।

কয়েক সেকেণ্ড পর বললেন তিনি, 'নিউ ইয়র্ক থেকে কার্টল্যাণ্ড নামে এক ভদ্রলোক। একটা কামরা চান- ডাবল রুম—আঠারো তারিখ থেকে তিন রাতের জন্যে।'

ডিশটা টেবিলে রাখলো স্যালি ডানকান। 'কার্টল্যাণ্ড? পুরো নাম?'

'আলফ্রেড···না, আলবার্ট। কি বলবো ভদ্রলোককে?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কথা বলবেন না, মিসেস ডানকান?'

'দরকার নেই।' অতিথিদের বিস্মিত করে ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে গেল স্যালি ডানকান। টেবিলে বসা ক্ষুধার্ত অতিথিরা ভাবলো এখুনি ফিরে আসবে সে, হয়তো ওয়াটারমেলনের আচার আনতে গেছে। কিন্তু সেই যে গেল, আর ফিরলো না স্যালি ডানকান। স্টোররুমে ঢুকে দুই বাক্স 'কাদা' নিলো সে, তারপর গ্যারেজ খুলে গাড়িতে চড়লো—অনেক বছর পর এই প্রথম। জানালা দিয়ে সবাই তাকে চলে যেতে দেখলো। পরস্পরের দিকে বোবা দৃষ্টিতে তাকালো অতিথিরা।

এগারো মাইল গাড়ি চালিয়ে এলো স্যালি ডানকান, রাস্তার পাশে থেমে নেমে পড়লো। পিছনের বনেট খুলে ভেতর থেকে একটা স্যুটকেস বের করলো সে, মাটির বাক্স দুটো সহ তিনশো গজ ভেতরে ঢুকলো জঙ্গলের। ঘাসে খানিকটা ঢাকা পড়ে থাকলেও ম্যানহোলটা দেখতে পেলো সে। স্যুটকেস থেকে একটা যন্ত্র বের করে ম্যানহোলের ঢাকনি তুলে ভেতরে তাকালো। নিচে, কংক্রিটের

সাথে আরো একটা স্টীল প্লেট রয়েছে। দমলো না স্যালি ডান-কান। ছোটো একটা সি-থ্রি, প্লাস্টিক টুকরোর সাথে নো-নাইন ডিটোনেটর জোড়া লাগলো, ফিউজটা সেট করলো এক মিনিটে। হন হন করে হেঁটে ষাট কি সত্তর গজ দূরে সরে এলো সে, বিস্ফো-রণের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো।

বিস্ফোরণের আওয়াজ রাস্তা থেকে শুনতে পাবার কথা, কিন্তু রাস্তায় এই মুহূর্তে কোনো পথিক বা যানবাহন নেই। ম্যানহোলের কাছে ফিরে এসে উঁকি দিয়ে নিচে তাকালো স্যালি ডানকান। স্টীল প্লেটটা খুলে গেছে। আরো নিচে দেখা যাচ্ছে সরু শ্যাফট, শেষ মাথায় কেবল। রাবার গ্লাভস পরলো স্যালি ডানকান, দু'ফলা কাটিং টুল-টা হাতে নিয়ে লোহার মই বেয়ে শ্যাফটের নিচে নামলো।

ধারালো প্লায়ার্স দিয়ে আধ ঘণ্টা চেষ্টা করার পরও কেবল কাটা গেল না। কেবলের গায়ে ইস্পাতের আবরণ রয়েছে, ভারি শক্ত সেটা। লোহার মই বেয়ে আবার ম্যানহোল থেকে জঙ্গলে বেরিয়ে এলো স্যালি ডানকান। স্যুটকেস থেকে ভারি একটা কাঁচের বোতল বের করলো। আবার নিচে নামলো সে। বোতলের রঙহীন তরল পদার্থ ইস্পাতের আবরণে অল্প অল্প করে সাবধানে ঢাললো। এবার কাজ হলো, শক্ত ইস্পাত গলে গেল অ্যাসিডে। কাটার দিয়ে তার কাটতে আর কোনো অসুবিধে হলো না।

সাথে সাথে বহু দূর দু'জায়গায় জ্বলে উঠলো অ্যালার্ম লাইট। একটা জ্বললো কলোরাডো স্প্রিংসে, পাহাড়ের নিচে গভীর এক পাতালপুরীতে! আরেকটা জ্বললো গ্রীনল্যাণ্ডের থিউলে, ইলেক-ট্রনিক গিয়ারে ঠাসা অদ্ভুতদর্শন এক ভবনে। টেকনিশিয়ানরা দ্রুত

তৎপর হয়ে উঠলো।

'আই বাপ, রেড অ্যালার্ম সিগন্যাল!' কলোরাডোর নর্থ আমেরিকান এয়ার ডিফেন্স কমাণ্ডের একজন ক্যাপটেন আঁতকে উঠলো। 'ব্যাপারটা কি?'

'আরে সর্বনাশ, একি!' আর্কটিকের ইউ. এস. এয়ার ফোর্সের ব্যালিস্টিক মিসাইল আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেমের একজন ডিউটিরত লেফটেন্যান্ট চমকে উঠলো। 'কোথায় কি ঘটলো!'

ভাষা আর মুখভঙ্গি যাই হোক, দু'জনেই জানে যে লাল আলো আর বিপ বিপ বিপ অ্যালার্ম গুরুতর পরিস্থিতির ইঙ্গিতবহ না-ও হতে পারে। এন-ও-আর-এ-ডি হেডকোয়ার্টারে বসানো রাডার আউটপোস্টের সাথে মেইন ল্যাণ্ড-লাইন লিঙ্কিং বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও লাল আলো জ্বলতে পারে। অবশ্য মাত্র মাস তিনেক আগে হলে এই অ্যালার্মকে গুরুতর পরিস্থিতি বলে ধরে নিতো ওরা। তিন মাস আগে আরো কয়েক ধরনের কমিউনিকেশন সিস্টেম চালু করা হয়েছে, তার মধ্যে একটা হলো স্যাটেলাইট। কোথাও কোনো সিস্টেমে গোলযোগ দেখা দিলে অন্যান্য বিকল্প সার্কিটগুলো আপনা থেকেই সচল হলে উঠবে। ঘটলোও ঠিক তাই। স্যালি ডানকান তারটা ছেঁড়ার দশ সেকেণ্ড পর বিকল্প সার্কিটগুলো কাজ শুরু করে দিলো। পনেরো সেকেণ্ড পর কলোরাডোর ক্যাপটেন সিগারেট ফেলে দিয়ে ফোনের রিসিভার তুলে নিলো। 'মেইন্টেন্যান্স,' বললো সে, ষাট ফুট লম্বা দেয়াল-মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে আছে, 'থিউল-এর দিকে যে মেইন বী-মিউজ ল্যাণ্ড লাইনটা গেছে সেটায় কোথাও গোলযোগ দেখা দিয়ে থাকতে পারে। সার্কিট চেকিঙের ব্যবস্থা করো, তারপর রিপেয়ার ক্রু পাঠাও।' ডিসপ্লে প্যানেলের

দিকে তাকালো সে, নর্থ আমেরিকান সিকিউরিটি সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ 'ফ্যাক্টস' দেখানো হয়েছে তাতে। তিনটে বিশাল রাডার স্টেশনের—থিউল, ইংল্যাণ্ড, বা আলাস্কা—কোনোটাতেই হানাদার রকেট দেখা যাচ্ছে না। ইলেকট্রনিক প্যাট্রলে রয়েছে অসংখ্য প্লেন আর জাহাজ, সেগুলোও কোনো হামলার সংকেত দিচ্ছে না। আক্রমণ নয়, যান্ত্রিক গোলযোগ।

এন ও আর এ-ডি-র মেইন্টেন্যান্স এক্সপার্টরা কালবিলম্ব না করে লাইন চেক করার ব্যবস্থা করলো। কলোরাডো থেকে হাডসন বে পর্যন্ত লাইনটাকে কয়েক ভাগে ভাগ করে নিয়ে সিগন্যাল পাঠানো হলো। গোলযোগের নির্দিষ্ট জায়গাটা বেছে বের করতে সময় লাগলো সাত মিনিট। জায়গাটা চার্লি ফরটি-ফোর নামে পরিচিত, ইথাকার কাছাকাছি। সাতটা পঞ্চান্ন মিনিটে রিপেয়ার ট্রাক থেকে ইকুইপমেন্ট নামাতে শুরু করলো ক্রুরা। ইতিমধ্যে কাজ সেরে গাড়ি নিয়ে রওনা হয়ে গেছে স্যালি ডানকান। আইন মেনে ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে গাড়ি চালাচ্ছে সে। কানাডিয়ান বর্ডারের কাছাকাছি একটা জায়গায় পৌঁছুতে হবে তাকে।

ভোর হবার খানিক আগে লেক ওন্টারিয়োর দক্ষিণ প্রান্তে পৌঁছুলো সে। এখান থেকেই তুলে নেয়া হবে তাকে। অন্তত সে-ধরনের একটা নির্দেশের কথাই তার মনে পড়ছে। গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে সৈকতে চলে এলো সে। অন্ধকারে চোখ জ্বালার চেষ্টা করলো, হেলিকপ্টারটা যদি দেখতে পায়।

সূর্য উঠলো।

অপেক্ষা করছে স্যালি ডানকান, জানে না তাকে উদ্ধার করার জন্যে প্লেন বা হেলিকপ্টার কিছুই আসবে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে

গেল, তবু সে অপেক্ষা করে থাকলো।

লাস ভেগাসে অনেক দেরি করে ঘুম ভাঙলো রানার। কাল গভীর রাতে স্কটল্যাণ্ডে টেলিফোন করে বসের সাথে কথা বলেছে ও। রাহাত খান এখন পুরোপুরি সুস্থ, কিন্তু হরিণ শিকারের লোভে আরো কিছু-দিন ভিনসেন্ট গগলের বাড়িতে অতিথি হয়ে থাকতে রাজি হয়েছেন তিনি। ঘুম থেকে উঠেই সিদ্ধান্ত নিলো রানা, আজই একবার সার্জেন্ট টেনডেলের সাথে যোগাযোগ করবে। অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ও। বিছানা থেকে নেমে রেডিওটা অন করলো, দেখা যাক নতুন কোনো দুঃসংবাদ আছে কিনা। খবর পড়া শেষ হতে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো রানা। তারপরই কে. জি. বি. থেকে পাওয়া মেসেজটার কথা মনে পড়ে গেল। মস্কো জানিয়ে দিয়েছে, ওকে আর সময় দিতে রাজি নয় তারা, যা করার দু'একদিনের মধ্যে করতে হবে। যদি না পারে, ফিরে আসুক মস্কোয়।

মস্কোয় ?

কোথায় ফিরবে রানা, সেটা ওর ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবে ধৈর্য হারানোর জন্যে মস্কোকে দোষ দিতে পারে না ও। যথেষ্ট সময় পেরিয়ে গেছে, ডালচিমস্কিকে খুঁজে বের করা যায়নি।

ক্যাসিনোয় পাকা জুয়াড়ি যারা খেলতে আসে তাদের মধ্যে অনেক বুড়ো-বুড়িও থাকে। লাকি চান্স-এ ঢুকে একটা টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল রানা, অ্যালিস টেনডেল বাদে টেবিলটাকে ঘিরে আর যারা বসে আছে তাদের কারো বয়সই ষাটের নিচে নয়।

'পাঁচ মিনিট দেরি হয়েছে আপনার,' অভিযোগের সুরে বললো সার্জেন্ট। 'ফলে তিন ডলার বেশি হারতে হলো আমাকে।'

দশ মিনিট আগে পৌঁচেছে রানা, কেউ ওকে লক্ষ্য করছে কিনা দেখার জন্যে খরচ হয়ে গেছে পনেরো মিনিট। 'তাহলে তো আপনাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়,' বলে টেনডেলের হাতে পঞ্চাশ ডলারের একটা নোট গুঁজে দিলো ও। একশো ডলার দিলো না, কারণ তাতে লোভী হয়ে উঠতে পারে লোকটা। 'এবার বলুন, কোনো খবর আছে?'

মাথা নেড়ে স্লটে একটা ডলার ফেললো টেনডেল। ডলার গিলে ফেললো মেশিন। 'আরো হয়তো দিন দুয়েক সময় লাগবে, মিঃ প্লেয়ার। আমরা সবাই তাকে খুঁজছি—সারা দেশে। লোকাল ফোর্স-কেও কাজে নামিয়েছি আমি। প্রতিটি ইঁটই খুলে দেখা হবে।'

'যথেষ্ট করছেন আপনি,' বললো রানা। 'তবে কি জানেন, আমার পরিবার সামান্য একটু অধৈর্য হয়ে পড়েছে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে মেশিনে আরেকটা ডলার ঢোকালো টেনডেল। 'ধৈর্য জিনিসটা পুণ্যের মতো—মেয়েদের মধ্যে মাঝেমধ্যে দেখা যায়, পুরুষদের মধ্যে একেবারেই নেই।' খুচরো পয়সায় ভরে গেল কাপটা। গুণে দেখা গেল চব্বিশ ডলার। 'আমার ভাগ্য বদলাচ্ছে, মিঃ প্লেয়ার। হয়তো আপনারটাও বদলাবে।'

'তাড়াতাড়ি?'

জেতা পয়সাগুলো জ্যাকেটের পকেটে ভরলো টেনডেল। 'বলা কঠিন। আপনি হয়তো সময়টা কমিয়ে আনতে পারেন। পুরস্কার ঘোষণা করুন।'

লোভ। কিন্তু বিরক্ত হলো না রানা। লক্ষণটা শুভ, কারণ লোভী

লোকের চাহিদা মিটলে কাজ করে। 'ছু'হাজার ?'

'চলবে।'

অংকটা এরচেয়ে বড় হলে সন্দেহ দেখা দেবে, নিখোঁজ ব্যক্তি নিশ্চয়ই তাহলে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ কেউ হবে। কিংবা গোটা ব্যাপারটার সাথে কারো জীবন-মরণের প্রশ্ন জড়িত। ছু'হাজার ডলারে পেট ভরবে সার্জেন্টের, বদহজম হবার ভয় থাকবে না। আর কেউ হয়তো এক পয়সারও মুখ দেখবে না, সবটুকু একাই খাবে টেনডেল। সমস্যার সমাধান হয়ে গেলে আরো ছু'হাজার চাইবে সে। খুশি আর চুপ রাখার জন্যে দেবেও রানা।

'টাকাটা বরং আপনাকে দিয়ে রাখি,' বললো রানা। 'হালকা হবো, নিরাপদও বোধ করবো। সাথে ওই পরিমাণই আছে।'

সার্জেন্ট বললো, এখুনি একবার তাকে টয়লেটে যেতে হবে। তারমানে টাকাটা সবার সামনে নেবে না সে।

ক্যাসিনো থেকে একসাথে বেরুলো ওরা।

'আজই আমি বেতারে খবরটা ছড়িয়ে দেবো,' বললো টেনডেল। 'কোনো খবর এলেই জানাবো আপনাকে। কোথায় যেন উঠেছেন বলেছিলেন ?'

'নিস শ্যাতো।'

'রা-ই-ই-ট। আশা করি সুখবর খুব তাড়াতাড়ি দিতে পারবো। জানি পরিবারের একজন হারিয়ে গেলে মনের অবস্থা কি হয় সবার। ভারি দুঃখজনক।'

ভাড়া করা গাড়ি নিয়ে হোটেলে ফিরলো রানা, ফিরেই বিকেল পাঁচটায় রেডিওর খবরে অদ্ভুত ঘটনাটা শুনলো। লেক ওন্টারিয়োর দক্ষিণ তীরে দাঁড়িয়ে নিঃসঙ্গ এক মহিলা ঘন ঘন হাত নাড়ছিল,

অবসর উপভোগ করতে আসা একদল অ্যাংলার ফিশিং লঞ্চ থেকে তাকে দেখতে পায়। হাবভাব দেখে মনে হয় মহিলা কোনো গুরুতর বিপদে পড়েছে, কিন্তু সৈকতের কাছাকাছি পানি এতো কম আর চারদিকে এতো পাথর ছিলো যে লঞ্চ নিয়ে তারা এগোতে সাহস পায়নি। কাজেই এক ঘণ্টা পর লোকাল পুলিশকে ঘটনাটা জানায় তারা। থানা থেকে একটা রেডিও কার পাঠানো হয়।

পুলিশ কার কাছাকাছি গেলে, মধ্য বয়স্কা মহিলা পিস্তল বের করে গুলি করে বসে। রেডিও কার চালাচ্ছিল একজন অফিসার, বুকে গুলি খেয়ে সাথে সাথে মারা যায় সে, গাড়িটা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নীল একটা পুরনো মরিসের সাথে ধাক্কা খেয়ে উল্টে যায়। পরে জানা গেছে নীল মরিসটার মালিক ইথাকার অধিবাসী স্যালি ডানকান। উল্টে যাওয়া পুলিশ কার থেকে হামাগুড়ি দিয়ে অপর অফিসার বেরিয়ে আসে, তারপর আড়াল নিয়ে পয়েন্ট থ্রি এইট ক্যালিবারের স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন রিভলবার দিয়ে গুলি ছোঁড়ে। বুকে গুলি খায় মহিলা, গলা থেকে তিন ইঞ্চি নিচে।

কিন্তু গুলি খেয়ে মারা যায়নি সে। মারা গেছে বিষ খেয়ে। দ্বিতীয় অফিসার নিজের চোখে তাকে একটা পিল গিলে ফেলতে দেখেছে। ইথাকার সবাই মিসেস ডানকানকে খুব ভালো করে চেনে, কিন্তু তার এই আকস্মিক মানসিক বিপর্যয় সম্পর্কে কেউ কিছু বলতে পারেনি।

স্যালি ডানকান। টেলি-বম তালিকার একটা নাম। সাংকেতিক সিগন্যাল, ফোন নম্বর, রুশ নাম, অ্যাসাইনমেন্ট—সব মুখস্থ করা আছে রানার। এখন আর কোনো লাভ নেই। স্যালি ডানকানের বিপদ কেটে গেছে। নিহত পুলিশ অফিসারের মতোই ভাগ্যটা তার

খারাপ।

ভাগ্য আমারও খারাপ, ভাবলো রানা। একের পর এক মারা যাচ্ছে ওরা, কাউকে বাঁচাবার কোনো ব্যবস্থাই করা যাচ্ছে না। ওর মন বলছে, পরিস্থিতি আরো খারাপের দিকে গড়াবে—খুব তাড়াতাড়ি।

ঠিক করা ছিলো, দুটো টেলি-বম ফাটাবার মাঝখানে আটচল্লিশ ঘণ্টা অপেক্ষা করবে ডালচিমস্কি, কিন্তু পরদিন সকালে হাডসন এয়ারপোর্টে নামার পর আরেকটা ফোন করার ঝোঁক সামলাতে পারলো না সে। মায়ামির দক্ষিণে হোমস্টেড এয়ার ফোর্স বেস রয়েছে, ওদের পানির ট্যাংকে জীবাণু ছেড়ে দিলে খুব মজা হয়। স্ট্র্যাটেজিক এয়ার কমাণ্ড-এর বি ফিফটি-টু বিমানের ক্রুরা পাইকারীভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে খবরটা কোনোমতে চেপে রাখা সম্ভব নয়।

সত্যি চেপে রাখা গেল না। তবে এসোশিয়েটেড প্রেস এস. এ. সি.-র প্রেস রিলিজ অবিশ্বাস করলো না, তাতে বলা হলো, ফুড পয়জনিঙে ছয়জন নেভিগেটর মারা গেছে, অসুস্থ হয়ে পড়েছে আরো দুশো বাহান্ন জন। আগামী কয়েক দিন তারা বিমান চালাতে পারবে না। কিন্তু মাসুদ রানা বা কে. জি. বি. রেসিডেন্ট প্রেস রিলিজের বক্তব্য বিশ্বাস করলো না, বিশ্বাস করলো না ইউ. এস. এ. এফ.-এর স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন অফিস। এ-ধরনের 'ঘটনা'-র সংখ্যাকে খাটো করে দেখার উপায় নেই। কারা যেন গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়ার পাঁয়তারা কষছে, তাদের শাস্তি পেতে হবে। প্রতিটি ইউ. এস. এয়ার বেসে

‘অ্যালার্ট’ লেভেল ‘ডেঞ্জার’ পয়েন্টে তোলা হলো—সাবধানতা অবলম্বনের জন্যে। আবার যদি আক্রমণ করা হয়, ইউ. এস. এয়ার ফোর্স অবশ্যই পাল্টা আঘাত হানবে।

সাত

রিঙ হতেই রিসিভার তুললো রানা।

‘মিঃ প্লেয়ার?’

‘হ্যাঁ।’

‘বোধহয় একটা ভালো খবর আছে আপনার জন্যে,’ বললো সার্জেন্ট টেনডেল।

‘কি রকম ভালো?’

‘হাউস্টনে রয়েছে সে।’

চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো রানার, কিন্তু তারপরই তীক্ষ্ণকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, ‘ঠিক জানেন?’

‘ঠিক। ঘণ্টাখানেক আগে এয়ারপোর্ট পুলিশ তাকে দেখতে পায়। মিঃ ডালো পরচুলা পরে আছে, নতুন গোঁফও গজিয়েছে। কারণটা বলতে পারবো না।’

ব্যাটা ন্যাকামি করছে, ভাবলো রানা। প্রশ্নটা আবার করলো ও, 'কোথাও ভুল হয়নি তো?'

'ফটোর সাথে তার চেহারার মিল রয়েছে, আর কি চান আপনি, মিঃ প্লেয়ার, স্যার? কথার সুরে বিদেশী টান। হোটেলে ডীন বার্গার নামে উঠেছে সে। হাবভাব দেখে মনে হয়, খুব অস্থির। কামরা থেকে বেরোয় না বললেই চলে।'

'বেচারা দিশেহারা বোধ করছে,' বললো রানা। 'অনুতপ্ত কিনা। আপনি তো জানেন না, একজন সাইকিয়াট্রিস্টকে দিয়ে ওর আমরা চিকিৎসা করাচ্ছিলাম।'

আমি যেন একটা গাধা, আবোলতাবোল বোঝাচ্ছে, ভাবলো টেনডেল। মাফিয়াদের ধরন-ধারণ জানা আছে তার। নামটা ডালো হোক আর কালো হোক, ব্যাটাকে জ্যান্ত কবর নয়তো হাঙরের পেটে চালান দেয়া হবে।

'হোটেলটার নাম বলুন।'

'এয়ারপোর্টের সাথে,' বললো টেনডেল। 'স্টার। তিনশো পাঁচ নম্বর কামরা। তার ওপর চোখ রাখার জন্যে হাউসটন পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছি আমি। ওরা একজন লোককে পাঠিয়েছে, হোটেলের লবি পাহারা দিচ্ছে সে। আপনি শুধু ডেস্ক ক্লার্ককে গিয়ে বলবেন, সাথে সাথে হাউস ফোনের সাহায্যে মিঃ ল-কে ডেকে দেবে সে।'

রসিকতাটুকু গুরুত্বপূর্ণ নয়। এখন একমাত্র কাজ পরবর্তী ফ্লাইট ধরে হাউসটনে পৌঁছানো। ধন্যবাদ জানিয়ে যোগাযোগ কেটে দিলো রানা, ফোন করলো এক ট্র্যাভেল এজেন্টকে, জানতে পারলো টেক্সাসের দিকে আগামী ছ'ঘণ্টা কোনো প্লেন নেই। একটা 'একজি-কিউটিভ জেট' চার্টার করলো ও।

ছয় সিটের লকহীড পঞ্চান্ন মিনিটের মধ্যে টেক-অফ করলো। দু'-হাজার ছয় শো ডলার বেরিয়ে গেল নগদ, লিলির নিয়ে আসা টাকার ওজন আরো খানিকটা কমলো।

বেলা তিনটের সময় সঙ্গিনী আর রাইফেল নিয়ে হাউসটন এয়ার টার্মিনালে ঢুকলো রানা। পনেরোটা এয়ারলাইন্স কাজ করে এখানে, সুবেশী আরোহীদের ভিড়ে চ্যাপ্টা হবার যোগাড় হলো। বেয়োনেট চার্জে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ একজন ইনফ্যান্ট্রি লেফটেন্যান্টের মতো ভিড় ঠেলে ভেতরে সেঁধিয়ে গেল রানা। স্টার হোটেলের লবিতে ঢুকে আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে লিলির মুখোমুখি হলো ও। 'সাথে অস্ত্র আছে?'

চোখ পিটপিট করলো লিলি, কি ধরনের উত্তর পেলে খুশি হবে রবিন? 'হ্যাঁ।'

'গুড। আমি একা ওপরে উঠবো। লোকটার ছবি দেখো।' ডালচিমস্কির ফটো দেখালো রানা।

ছবিটা ভালো করে দেখে নিয়ে মাথা ঝাঁকালো লিলি। ওর ধারণা হয়েছিল পয়েন্ট থারটি-টু অটোমেটিকটা দেখে রবিন হয়তো অস্বস্তি বোধ করবে, যদিও কোল্টটা মার্কিন অস্ত্র, এবং প্রায় নিখুঁত একটা জাল লাইসেন্সও রয়েছে তার সাথে। রবিন খুশি হওয়ায় স্বস্তি বোধ করলো সে। কর্তৃপক্ষ তাকে বলে দিয়েছে, রবিনকে যে-কোনো মূল্যে হাসিখুশি রাখতে হবে।

ডেস্ক ক্লার্ককে বলতেই লাউডস্পীকার জ্যান্ত হয়ে উঠলো। পরপর দশবার ডাকা হলো মিঃ ল-কে। কিন্তু জনাব আইনের কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। রানা অনুরোধ করলো, তবু ভদ্র-লোককে বারবার ডাকা হোক। আরো প্রায় দু'মিনিট পর তীক্ষ্ণ

চেহারার এক যুবককে হন হন করে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। হালকা ব্লেজার, স্পোর্টস্ শার্ট, চেক প্যান্ট পরে রয়েছে। দশ ফিট দূরে থাকতেই নিজের পরিচয় দিলো সে, 'ল।'

ডিটেকটিভের পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে নিলো রানা। 'আমি জন প্লেয়ার। আপনি ছিলেন কোন্ চুলোয় ?'

'টয়লেটে যেতে হয়েছিল,' ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে বললো সাদা পোশাক ডিটেকটিভ। 'আপনিই ভেগাসের সেই ভদ্রলোক ?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার চাচা ওপর তলায়। স্মৃতিভ্রংশ, তাই না ?'

'মনে হচ্ছে। এক মিলিয়ন ধন্যবাদ, অফিসার। বিধবাদের ওয়েলফেয়ার ফাণ্ডে কিছু চাঁদা দিতে পারি ?'

চোখ পিট পিট করে অফিসার দেখলো, জন প্লেয়ার পকেটে হাত ভরছে। 'না-না, প্লিজ। চাঁদা নেয়ার অনুমতি নেই। একান্তই যদি দিতে চান, হেডকোয়ার্টারে চেক পাঠিয়ে দেবেন, স্যার।'

সমস্ত কথার মধ্যে 'স্যার'-টা হলো সেরা, এমন আন্তরিকতার সাথে উচ্চারণ করলো, জন ওয়েনের অভিনয়ও মার খেয়ে যাবে। 'আপনার নামটা ?' এলিভেটরের দিকে একটা চোখ রেখে জিজ্ঞেস করলো রানা।

মিঃ ল বললো, 'স্যাম মিয়ামি।'

'হাউস্টন পুলিশ বিভাগে আপনি একটা রত্ন, অফিসার মিয়ামি। ধন্যবাদ। এখন থেকে সব দায়িত্ব আমার।'

বাইশ ডলার দিয়ে কেনা প্যান্টটা টেনে কোমরের আরো একটু ওপরে তুললো স্যাম মিয়ামি। 'সাহায্য করতে পারলে খুশি হতাম, স্যার। এ-ধরনের লোক মাঝে মধ্যে ভায়োলেন্ট হয়ে ওঠে।'

'আরে না, আমাকে দেখে নরম কাদা হয়ে যাবে চাচাজান। ধন্যবাদ।'

বিদায় নিয়ে চলে গেল ডিটেকটিভ। সঙ্গিনী ঠিক জায়গায় আছে কিনা একবার দেখে নিলো রানা। লবির ভেতরই, দরজার কাছাকাছি একটা চেয়ারে বসে আছে লিলি, চেয়ারের পাশে কেসের ভেতর রাইফেলটা। এলিভেটরে চড়ে চারতলায় উঠে এলো রানা, তিনশো পাঁচ লেখা কামরাটা দেখতে পেলো। দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলো করিডরের দু'দিকে, নেই কেউ। পয়েন্ট টু-টু বের করে চ্যাপ্টা দিকটা উরুর সাথে ঠেকিয়ে রাখলো। স্টারে সাইলেন্সারের কোনো দরকার নেই, লবিতে গোটা গোটা স্থূল অক্ষরে লেখা আছে, প্রতিটি কামরা সাউণ্ড প্রুফ।

দরজায় নক করলো রানা।

ঘরে ঢুকেই ডালচিমস্কিকে গুলি করবে ও। শুরু করবে পেটে একটা বুলেট ঢুকিয়ে দিয়ে, তারপর খাতা প্রসঙ্গে কথা বলবে। ডালচিমস্কির মতো একটা পশুর সাথে কমিউনিকেট করার একমাত্র উপায় পেটে একটা ফুটো তৈরি করা।

আবার নক করলো রানা, 'রুম সার্ভিস' বলার জন্যে তৈরি হয়ে আছে। শয়তানটা যদি গা-ঢাকা দিয়ে থাকে, তাহলে সম্ভবত কামরা-তেই খাওয়া-দাওয়া সারছে, ইতিমধ্যে রুম সার্ভিসের আসা-যাওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

কামরা থেকে কোনো সাড়াশব্দ আসছে না। ভালো ঠেকলো না রানার।

'উনি তো চলে গেছেন।'

ঘাড় ফিরিয়ে ইউনিফর্ম পরা মহিলার দিকে তাকালো রানা।

নিগ্রো মেইড।

'পাঁচ কি দশ মিনিট আগে,' আবার বললো মহিলা। 'কেন তাকে খুঁজছেন, অফিসার?' রানার হাতের অস্ত্রটা দেখে ফেললো সে। 'তারমানে ভালো লোক নয়?'

'খুনী।'

'বলেন কি?' আঁতকে উঠলো মেইড। 'জানলে তো…

জ্যাকেটে পিস্তলটা ভরে এলিভেটরের দিকে ছুটলো রানা। ডেস্ক ক্লার্ক জানালো, এই তো খানিক আগে চলে গেছেন ডীন বার্গার। না, কোনো ফরওয়ার্ডিং অ্যাড্রেস দিয়ে যাননি।

'দুর্বল কিডনি নিয়ে পুলিশে চাকরি করতে এসেছে দশ সেকেণ্ড পর লিলির সামনে মনের ঝাল মেটালো রানা। মিঃ ল-কে পেলে তাকে হয়তো কষে একটা চড়ই মেরে বসতো। 'তাড়াতাড়ি এসো, এখনো হয়তো নাগালের বাইরে যেতে পারেনি!'

ছুটতে ছুটতে এয়ারপোর্টে চলে এলো ওরা। টার্মিনাল ভবনের সবখানে তন্নতন্ন করে খুঁজলো, প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে দু'জনেই ঘেমে গেছে আর হাঁপাচ্ছে। একটা ব্যাপার পরিষ্কার, শয়তানটা এই এয়ারপোর্টে নেই।

ঠিকই আন্দাজ করছে রানা। খানিক আগে হাউসটনের দু'নম্বর এয়ারপোর্টে পৌঁচেছে ডালচিমস্কি। এই মুহূর্তে একটা ডিসি-এইটে চড়ছে সে। ক্লিভল্যাণ্ডে যাচ্ছে প্লেনটা। এখনো ডালচিমা নিশ্চিত-ভাবে জানে না লবিতে যে লোকটা তার ওপর নজর রাখছিল সে শত্রুদের একজন কিনা। শত্রু হোক বা না হোক, ঠিকানা বদলের সময় হয়ে গেছে তার। সব যখন ঠিকঠাক মতো ঘটছে, তখন ঝুঁকি নেয়ার কোনো মানে হয় না। আর দিন কয়েকের মধ্যে তার কাজ

শেষ হয়ে যাবে, আহ্লাদে আটখানা হয়ে ভাবলো সে। ওরা সবাই খতম হয়ে যাবে, সব্বাই। শুধু এই চিন্তাটাই তার শরীরে শক্তি আর পুলকের জোয়ার বইয়ে দিচ্ছে।

রানা অনুভব করলো কেউ যেন তার সমস্ত শক্তি নিংড়ে বের করে নিয়েছে। লিলি ভাবলো, রবিনকে এই প্রথম এতোটা ভেঙে পড়তে দেখছি। টার্মিনালের একধারে, প্লাস্টিকের চেয়ারে বসে আছে ওরা, সামনে দিয়ে মিছিলের মতো ছুটে চলেছে জনস্রোত। সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে রবিনকে কি বলা যায় ভাবছে লিলি। রবিনের পরাজিত চেহারা দেখে বুকটা তার টনটন করছে। তার একটা হাতে হাত রাখলো সে, মৃদু চাপ দিলো। 'কফি খাবে নাকি, রবিন?' মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো সে।

'আরেকটু হলে ওকে আমরা ধরতে পারতাম,' বললো রানা। 'লোকটা যে সে-ই, আমি জানি।'

'আবার তাকে পাবে তুমি, রবিন।'

চোখ বন্ধ করে জোরে শ্বাস টানলো রানা। ভীষণ, ভীষণ ক্লান্তি লাগছে। 'একবার পেয়েছি সেটাই তো মিরাকল! আবার পাবো সে আশা না করাই ভালো। আর পেলেই বা কি, পাবার আগে সর্বনাশ ঘটতে বাকি থাকবে কিছু?'

'চলো কফি খাই,' রানার হাত ধরে উঠে দাঁড়ালো লিলি। 'মাথা গরম করে কোনো লাভ নেই।'

কমপিউটর রুম থেকে বেরিয়ে সোজা বস কর্নেল জিল ক্যাসেলের কামরায় চলে এলো চ্যারিটি উডস্টক। ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করছে, মুখ তুলে তাকালো কর্নেল। অদ্ভুত একটা চিন্তা খেলে গেল

তার মাথায়। প্রিয় নারীকে নিয়ে মানুষ যখন হাঁটে বা কোথাও বসে, তার সামনেটাই শুধু দেখার সুযোগ মেলে। অন্তত হাঁটার সময় নিয়মটা যদি এমন হতো যে পুরুষ পিছনে থাকবে, তাহলে বোধহয় ভালোই হতো। কিন্তু না, তখন আবার সামনেটা দেখার জন্যে হাহাকার করতো মন···। চ্যারিটি এগিয়ে আসছে দেখে নড়েচড়ে বসলো সে, সংযত করলো বেয়াদপ দৃষ্টি।

চ্যারিটি উডস্টকের হাতে দুটো কমপিউটর প্রিন্ট-আউট রয়েছে, চেয়ারে বসে ডেস্কের ওপর রাখলো সেগুলো। জিল ক্যাসেল লক্ষ্য করলো, আজও চ্যারিটি ব্রেসিয়ার পরেনি। মেয়েটা কি তার ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছে? প্রতিশোধের ধরনটা অবশ্য খারাপ নয়। এরপর হয়তো দেখা যাবে, ব্লাউজ বা ফ্রকও পরছে না। আশায় উজ্জীবিত হয়ে উঠলো কর্নেল, ঈশ্বর মুখ তুলে চাইলে কতো কিছুই তো ঘটতে পারে। হয়তো সেদিন বেশি দুরে নয়, দেখবো প্রিয়দর্শিনী চ্যারিটি নিরাবরণ হয়ে আমার কণ্ঠে ঝুলে আছে।

'আপনার মুখের ভেতর মাছি ঢুকতে পারে।'

এতো দ্রুত মুখ বন্ধ করলো ক্যাসল, কপ্ করে একটা আওয়াজ হলো। 'কাজের কথা বলো,' কর্কশ শোনালো তার কণ্ঠস্বর।

ডেস্ক থেকে একটা প্রিন্ট-আউট তুলে ঠেলে দিলো উডস্টক। 'সি. আই. এ. ডিরেক্টর থেকে শুরু করে বেন সুইটল্যাণ্ড পর্যন্ত কর্মকর্তাদের সন্তুষ্ট করার জন্যে এটাই যথেষ্ট। বারো লাখ ডলারের কমপিউটর মিথ্যে কথা বলে না।'

'কি বলেছে শোনাও।'

'ধ্বংসাত্মক যে ক'টা ঘটনা ঘটেছে সেগুলো পরস্পরের সাথে সম্পর্ক যুক্ত হতে পারে,' বললো উডস্টক। 'তবে তার সম্ভাবনা

ছাপান্ন হাজার চারশো ভাগের এক ভাগ। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে এই ফলাফল জানিয়ে দিতে পারেন আপনি।'

'গবেষণাটা তুমি করেছো এ-কথা বললে ওরা বিশ্বাস করবে। তোমার ওপর ওদের ভারি আস্থা।' দ্বিতীয় প্রিন্ট-আউটের দিকে তাকালো জিল ক্যাসেল। 'ওটা?'

'বিগ রড সম্পর্কে নতুন কিছু ডাটা পাবার পর ব্যক্তিগতভাবে আরেকটা প্রোগ্রাম তৈরি করি আমি,' বললো উডস্টক। লক্ষ্য করলো, বরাবরের মতো তার বুকের দিকে চোরা চোখে তাকাচ্ছে কর্নেল। রাগ নয়, শিরশিরে একটা শীতল অনুভূতি হলো তার। এতো যার কৌতূহল, সব যদি কোনোদিন দেখার সুযোগ পায়, কি করবে তাই ভাবি!

'রেজাল্ট?'

'লোকটা তার নাম সই করছে,' বলে দ্বিতীয় প্রিন্ট-আউটটাও বসের দিকে ঠেলে দিলো উডস্টক।

ভালো করে পড়লো জিল ক্যাসেল। তারপর মুখ তুলে হাসতে লাগলো। 'দারুণ, চ্যারিটি, তুলনাহীন। তোমার প্রমোশন হওয়া উচিত।'

'প্রমোশনের কথা বলবেন না,' ম্লান কণ্ঠে বললো উডস্টক। 'একটা তো দশ মাস আগেই পাওনা হয়েছে।'

কর্নেল জানে, বেন সুইটল্যাণ্ড ফাইলটা চেপে রেখেছে। বেন লোকটা নারী-বিদ্বেষী, অথচ হেডকোয়ার্টারের মেয়েরা তার পিছু পিছুই ঘুরঘুর করে। 'তোমার ফাইল নিয়ে এবার সরাসরি ডিরেক্টরের কাছে যাবো আমি,' জেদের সুরে বললো সে। 'তোমার মতো একটা প্রতিভাকে ওরা মর্যাদা দেবে না, ইয়ার্কি নাকি!'

অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল উডস্টক। 'আপনার কাজিন নতুন কোনো খবর দিয়েছে ?'

মাথা নাড়লো কর্নেল। 'শেষ খবরটা তোমাকে আমি জানিয়েছি।'

'উঠি তাহলে··· ।'

'এক মিনিট,' বলে নিজেই উঠে দাঁড়ালো জিল ক্যাসেল। 'তোমাকে একটা নোটিস দিয়েছিলাম, ভুলে গেছো বুঝি ?'

মৃদু হেসে মাথা নাড়লো উডস্টক। 'না, ভুলবো কেন। তবে আগে আপনি আমার চোখের দিকে তাকাতে শিখুন, তারপর ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে কথা হবে।' দাঁড়ালো সে। টান টান করলো শরীরটা। ব্লাউজ ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইলো সুগঠিত স্তন জোড়া।

জানে নিজেকে সামলাতে পারবে না, তাই চোখ বন্ধ করে ফেললো জিল ক্যাসেল। খিল খিল করে হেসে উঠে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল চ্যারিটি উডস্টক। দরজা বন্ধ হবার শব্দ শুনে চোখ খুললো কর্নেল, ধপাস করে চেয়ারে বসলো সে। বিড়বিড় করে বললো, 'কি বিচ্ছু মেয়ে রে, বাবা !'

সাথে ফ্রেঞ্চ পাসপোর্ট থাকলেও রাউল ক্ল্যারমণ্ট একজন রাশিয়ান, মন্ট্রিঅলে ছোটোখাটো একটা চাকরি করে সে। চেহারায় ভোঁতা একটা ভাব আছে, বয়স বত্রিশ, দশ বছর আগে রুশ মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স তাকে ট্রেনিং দেয়ার জন্যে বাছাই করে। দু'বছর ট্রেনিং পাবার পর গত আট বছর ধরে বিভিন্ন দেশে দায়িত্ব পালন করেছে। সেকেণ্ড গ্রেডের এজেন্ট সে, তারমানে গ্রুর নির্দেশে ইতিমধ্যে কমপক্ষে বারোজন শত্রুকে খুন করেছে। ফার্স্ট গ্রেড এজেন্ট হতে

হলে কমপক্ষে বিশজন মানুষের প্রাণ নিতে হয়। মাসুদ রানাকে খুন করার নির্দেশ পেয়ে আনন্দে লাফিয়ে উঠলো ক্ল্যারমন্ট, কারণ আর মাত্র একজনকে খুন করতে পারলেই ফার্স্ট গ্রেড পেয়ে যাবে সে।

অফিসে ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়ে দিয়ে হোটেলে বসে থাকলো ক্ল্যারমন্ট। তিন দিন অপেক্ষা করার পর পরবর্তী নির্দেশ এলো। শিকাগো-য় যেতে হবে তাকে, উঠতে হবে শেরাটন হোটেলে। স্যুটকেস গুছিয়ে নিয়ে সেদিনই রওনা হয়ে গেল সে, শিকাগোর শেরাটনে পৌঁছুলো রাত এগারোটায়। রাত দুটোয় একটা টেলিফোন পেলো ক্ল্যারমন্ট, কাল সকালে চিড়িয়াখানায় যেতে হবে তাকে।

পরদিন সকালে চিড়িয়াখানায় তার সাথে দেখা হলো কণ্ট্যাক্ট-এর। সুন্দরী একটা মেয়ে, ফ্রেঞ্চ এয়ারলাইন্সে স্টুয়ার্ডেস। বিদায় নেয়ার সময় সিগারেটের প্যাকেটটা বেঞ্চের ওপর ফেলে গেল সে, যেন ভুল করে। হোটেল রুমে ফিরে এসে প্যাকেট খুলে ভেতর থেকে একটা ফটো বের করলো ক্ল্যারমন্ট।

মাসুদ রানার ফটো। সাথে ছোট্ট একটা চিরকুট, 'সশস্ত্র, অভিজ্ঞ, অত্যন্ত বিপজ্জনক।' একটা চ্যালেঞ্জ অনুভব করলো রাউল ক্ল্যারমন্ট। লোকটা কে, কি তার অপরাধ, এ-সব বিষয়ে মাথা ঘামালো না। কখনোই ঘামায় না। নিয়ম নেই।

ফটোটা জ্যাকেটের পকেটে রেখে দিয়ে স্যুটকেস খুললো ক্ল্যারমন্ট, তার আগে দরজা আর জানালা বন্ধ করে নিয়েছে। স্যুটকেস থেকে কাপড়চোপড় বের করে ফলস বটমের ঢাকনি তুললো, ভেতর থেকে বের করলো প্লাস্টিক মোড়া কয়েকটা ইস্পাতের টুকরো—কোনোটা চ্যাপ্টা, কোনোটা টিউব আকৃতির। ওগুলো জোড়া লাগাবার কাজে

ব্যস্ত হয়ে পড়লো সে।

আড়াই মিনিট পর দেখা গেল ক্ল্যারমন্টের হাতে একটা L34A1 সাবমেশিন গান রয়েছে, ব্রিটেনে হার ম্যাজেস্টি-র সশস্ত্র বাহিনী যে L2A3 ব্যবহার করে এটা তারই সাইলেন্সার লাগানো সংস্করণ। স্টক বাড়ানো অবস্থায় চৌত্রিশ ইঞ্চি লম্বা, ভয়ংকর দর্শন সাত পয়েন্ট আট ইঞ্চি ব্যারেল সহ। মোটা সাইলেন্সার কেসিং ব্যারেল জ্যাকেট ঢেকে রেখেছে, ফলে ব্যারেলের যেখান থেকে গ্যাস বেরোয় সেটাও চোখের আড়ালে থাকলো। তিন সেট ফায়ারিং মেকানিজম। এস.—সেফটি পজিশন। আর.—সেমি-অটোমেটিক ফায়ার। এ.—ফুল অটোমেটিক।

এস. সুইচ টিপে সাবমেশিন গানটাকে সেফটি পজিশনে সেট করলো ক্ল্যারমন্ট, তারপর ম্যাগাজিন ভরলো। ফুল অটোমেটিক দিয়ে ট্রিগার টানলে গানটা থেকে প্রতি মিনিটে পাঁচশো পঞ্চাশটা নাইন-মিলিমিটার প্যারাবেলাম বুলেট বেরুবে। এটা দিয়ে চারজন লোককে খুন করেছে ক্ল্যারমন্ট, একটা লাশও সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।

স্লিং-টা কাঁধে গলিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়ালো ক্ল্যারমন্ট, এক ঝাঁকিতে ফায়ারিং পজিশনে নিয়ে এলো গানটাকে। আপনমনে হাসতে লাগলো সে। 'কোথায় ভাই তুমি, মাসুদ রানা? না-না, তোমাকে আসতে হবে না, আমিই তোমার কাছে যাবো!'

ক্ল্যারমন্ট জানে, এখানেও তাকে অপেক্ষা করতে হবে। মাসুদ রানা কোথায় আছে সময় মতো জানানো হবে তাকে। তার ডান পায়ের সাথে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো আছে পয়েন্ট থ্রি এইট ওয়ালথার পি-পি-কে পিস্তল, কিন্তু সেটা চেক না করলেও চলে।

শিকার যদি সশস্ত্র আর অভিজ্ঞ হয়, তার কাছাকাছি পৌঁছুবার সুযোগই সে পাবে না, কাজেই স্মল আর্মস ব্যবহারেরও প্রশ্ন উঠবে না।

টেলিভিশন অন করে চেয়ারে বসলো ক্ল্যারমন্ট। হোটেল ছেড়ে কোথাও বেরুনো চলবে না তার। কেউ বলতে পারে না কোন্ দিক থেকে কখন নির্দেশ আসবে।

আট

সান ডিয়াগো-র কাছে মার্কিনীদের বড়সড় একটা ন্যাভাল এয়ার স্টেশন রয়েছে, সেটার সেন্ট্রাল কন্ট্রোল টাওয়ার আর মেইন জেনারেটরে আগুন লাগলো। সরকারী প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ আন্দাজ করা হলো, ছাব্বিশ কোটি ডলার। কেউ নিহত হয়নি, তবে চৌত্রিশ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, তাদের মধ্যে ছ'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। আগুন লাগার কারণ জানা যায়নি, পুরোদমে তদন্ত চলছে।

মেইন জেনারেটর অকেজো হয়ে গেলেও, এয়ার স্টেশন তাতে অচল হয়ে পড়েনি। গত বছর নতুন ইমার্জেন্সী জেনারেটর যেটা

বসানো হয়েছিল, আপনাআপনি সেটা চালু হয়ে যায়। লাস ভেগাস সান পত্রিকায় খবরটা পড়ার সময় রানার চেহারায় কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না, শুধু চোখ জোড়ায় নগ্ন ঘৃণা আর ক্রোধ ফুটে উঠলো।

দেখে ফেললো লিলি। রবিনকে চিনে ফেলতে শুরু করেছে মেয়েটা। এখন সে রবিনের অনেক দুর্বোধ্য আচরণের তাৎপর্য ধরে ফেলতে পারে। দু'জন প্রফেশনাল একটু বেশি সময় কাছাকাছি থাকলে যা ঘটার তাই ঘটছে। লিলি বোঝে, এতোটা ঘনিষ্ঠতার পরিণতি ভালো হতে পারে না। আজ বাদে কালই হয়তো মস্কোয় ফিরে যেতে হবে রবিনকে। আর তাকে হয়তো হপ্তা শেষ হবার আগেই চলে যেতে হবে টোকিও বা মিউনিকে। এক মিনিট বা এক মাস পর মারা যেতে পারে দু'জনেই। এ-সব ব্যাপারে সচেতন না থেকে পারা যায় না, কাজেই প্রশ্ন না করে স্বস্তি কোথায়! 'কি ব্যাপার, রবিন?'

'আমাদের সেই লোক।' কাগজে টোকা দিলো রানা।

খবরটা পড়লো লিলি। 'এবার খুব একটা সুবিধে করতে পারে-নি,' অনেকটা যেন সান্ত্বনা দেয়ার সুরে বললো সে।

'পরের বার কি হবে? জানো কি আছে তার হাতে? কল্পনা করতে পারো কতো কি ধ্বংস করতে পারে সে? শুধু একবার ডায়াল করে?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো লিলি। 'জানি না, রবিন—এবং সম্ভবত আমার জানা উচিতও নয়।'

'ভাবতে পারো কাকে দিয়ে কাজটা করিয়েছে সে? এমন এক-জন ভালোমানুষকে দিয়ে, যে তেরো-চোদ্দ বছর ভুলে আছে

নিজের আসল পরিচয়, জানে না আসলে সে কে. জি. বি.-র এক-জন ডীপ-কাভার এজেন্ট। তেরো-চোদ্দ বছর আগে তাকে বলা হয়েছিল, শুধু যুদ্ধ লাগলে তোমাকে ব্যবহার করা হবে। কাজটা করার পর হুঁশ ফিরবে তার, ধরে নেবে রাশিয়ার সাথে আমেরি-কার পারমাণবিক যুদ্ধ বেধে গেছে।'

মন দিয়ে শুনছে লিলি, চেহারায় সহানুভূতি।

'টাওয়ার আর জেনারেটর ধ্বংস করে দিয়েই বেচারা হয়তো মেক্সিকো সীমান্তের দিকে ছুটেছে, পারমাণবিক বিস্ফোরণ যাতে তার নাগাল না পায়। জানি, কিছুই বুঝছো না তুমি। প্রশ্ন করতে চাইছো। কিসের পারমাণবিক বিস্ফোরণ? তাহলে শোনো,' রানা যেন জনান্তিকে কথা বলছে। 'মিসাইল ওঅরহেড, বুঝলে। আর কি জানতে চাও, বলো।' কার ওপর লিলি জানে না, কিন্তু বুঝতে পারছে ভয়ানক রেগে গেছে রানা। ব্যর্থ আক্রোশে ফুঁসছে।

লিলি জানতে চায়। 'মিসাইল ওঅরহেড?'

'অথচ,' হোটেল কামরায় পায়চারি শুরু করলো রানা, 'কৌতুক-টা কি জানো? একটা রকেট বা মিসাইলও ছোঁড়া হয়নি। ভ্লাডিভোস্টকের পাঁচশো মাইল পশ্চিমের সাইলো-গুলোয় সব নিরাপদে আছে। হেঁয়ালি মনে হচ্ছে, লিলি?'

'করছো বলেই মনে হচ্ছে,' শান্ত সুরে বললো লিলি। 'আমার কথা হলো, এতোটা অস্থির না হলেও চলে। তুমি দেখো পুলিশ আবার লোকটাকে খুঁজে পাবে।'

'প্রায় অসম্ভব। একবার পেয়েছিল সেটাই তো আশ্চর্য।'

'পুরস্কারের টাকা বাড়িয়ে দিলে হয় না?'

'তা-ও ভেবেছি। দশ বা বিশ হাজার ডলার দেয়া যায় কিনা।

কিন্তু অংক যতো বড়ো হবে, ততোই কৌতূহল বাড়বে মানুষের। টেনডেল নিজেও দিশেহারা বোধ করতে পারে। তার ধারণা হবে, ডালচিমস্কি সাধারণ কেউ নয়, ব্যাপারটার সাথে নিশ্চয়ই রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত। হয়তো ভয় পেয়ে এফ. বি. আই.-কে সব জানিয়ে দেবে সে।'

'তা যদি জানিয়ে দেয়ও,' বললো লিলি, 'এখনকার চেয়ে বেশি বিপদে পড়বে না তুমি। আরেকটু সাবধানে থাকলেই কেউ তোমার নাগাল পাবে না। আর লাভের দিকটা ভেবে দেখো—বেশি টাকার লোভে টেনডেল হয়তো আরো ভালোভাবে খুঁজবে লোকটাকে।'

'ওটা আমার সাত নম্বর প্ল্যান।'

'এক থেকে ছয়গুলো কি, রবিন?'

'জানলে তো কথাই ছিলো না।' সিগারেট ধরালো রানা।

'বড় বেশি সিগারেট খাচ্ছো।'

'এবং উপভোগ করছি না। মেজাজ খারাপের আরো কারণ ঘটেছে, লিলি। দেশের ওরা আমার সাথে কথা বলতে চেয়েছে। কেন আমি কোনো জাদু দেখতে পারছি না সরাসরি আমার মুখ থেকে শুনতে চায় ওরা।'

'তোমাকে ওরা ডেকে পাঠিয়েছে, রবিন?' লিলির চোখে পলক নেই।

'তারচেয়েও খারাপ,' বললো রানা। 'ওদের উদ্দেশ্য আমি টের পেয়ে গেছি। প্ল্যান বদলাচ্ছে ওরা।'

'কি রকম?' ভুরু কুঁচকে উঠলো লিলির।

'ওরা চাইছে এখন থেকে কে. জি. বি. রেসিডেন্ট আমার কাজ তদারক করবে। নির্দেশ দিয়েছে, আমি যেন তাকে ফোন করি।'

'নির্দেশ যদি দিয়ে থাকে…।'

'হ্যাঁ, আমাকে সেটা মানতেই হবে। কিন্তু আমি যদি কোনো নির্দেশ না পাই?'

'মানে?'

'কাল আবহাওয়া ভালো ছিলো না, ভালো করে শুনতেই পাইনি খবর,' বললো রানা। 'রিসিভারটাকে হয়তো মেরামত করতে পাঠাতে হবে।'

বিছানার ওপর উঠে বসলো লিলি। রানার একটা হাত ধরে টানলো। 'কিন্তু রবিন, মেসেজটা বারবার রিপিট করবে ওরা!'

'কাল হয়তো আমার রিসিভার ভালো থাকবে। আজ আমি ব্যস্ত। ম্যানিয়াকটা এরপর কি করবে আন্দাজ করার চেষ্টা করছি। প্যাটার্ন একটা না থেকেই পারে না।'

'যা যা জানো সব লিখে ফেলছো না কেন?' রানাকে টেনে বিছানার ওপর নিজের পাশে বসালো লিলি। 'গুরুত্বপূর্ণ সব তথ্য একটা কাগজে সাজাও তো দেখি। বিভিন্ন তথ্য বিভিন্ন কলামে সাজিয়ে দেখো কোথাও কোনো মিল পাওয়া যায় কিনা।'

লিলির ওপর ঝুঁকে তাকে চুমো খেলো রানা। 'নয়বার চেষ্টা করেছি, লিলি।'

'তবু এসো না, আরেকবার চেষ্টা করে দেখি,' অনুরোধ করলো লিলি। 'চেষ্টা করার দায়ে কেউ আমাদের ফাঁসিতে লটকাবে না।'

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালো রানা। ওর নাকে নাক ঘষে আদর করলো লিলি, বিছানা থেকে নেমে গিয়ে দেরাজ থেকে বের করে আনলো কাগজ আর কলম।

বিছানায় উপুড় হয়ে শুলো ওরা, পাশাপাশি। প্রথমে রানা ডীপ-

কাভার এজেন্টদের আমেরিকান নামগুলো লিখলো কাগজে। এই টেলি-বোমাগুলোকে ইতিমধ্যে ফাটিয়ে দিয়েছে ডালচিমস্কি।

কোনো প্যাটার্ন চোখে পড়লো না।

আরেকটা তালিকা তৈরি করলো রানা, শুধু নামের শেষ অংশ দিয়ে। তিন নম্বর তালিকায় থাকলো নামগুলোর শুধু প্রথম অংশ। চার নম্বর তালিকায় নামের দুই অংশই থাকলো, কিন্তু শেষ অংশ প্রথমে আর প্রথম অংশ শেষে। ত্রিশ মিনিট ধরে তালিকাগুলো নাড়াচাড়া করে ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়লো একটা। 'এবার ওদের আসল নামগুলো সাজানো যাক।'

নতুন আরেকটা তালিকা তৈরি হলো। এক, দুই করে আটটা নাম লিখলো রানা। একটার নিচে আরেকটা। পাঁচ মিনিট পর বললো, 'চার বার চেক করলাম, কোনো অর্থ বেরুচ্ছে না।'

'কিন্তু তুমি বলছো প্যাটার্ন একটা না থেকেই পারে না। তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি।' রানাকে উৎসাহ দিতে চাইছে লিলি। 'আরো চেষ্টা করো।'

'তুমি কিন্তু সত্যি আমার লক্ষ্মী বউ! বেশ, এবার তাহলে রাজ্য-গুলোর নাম লিখি।'

কলোরোডা।

মেইন

উইসকনসিন

ক্যানসাস

ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া

নিউ ইয়র্ক

ফ্লোরিডা

ক্যালিফোর্নিয়া

'কিছু দেখতে পাচ্ছো ?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

অনেকক্ষণ চুপচাপ তালিকাটার দিকে তাকিয়ে থাকার পর মাথা নাড়লো লিলি। 'না। আর কি বাকি থাকলো ?'

'তুমিই বলো।'

'প্রতিষ্ঠানগুলোর নাম ?'

'আগে চেষ্টা করেছি… ।'

'আগের কথা বাদ দাও,' বাধা দিলো লিলি। 'সব নতুন করে পরীক্ষা করবো আমরা।'

'বেশ।'

আরেকটা তালিকা তৈরি হলো। এতে সময় অনেক বেশি লাগলো। লিখতে লিখতে দু'বার থামলো রানা, সামরিক স্থাপনার নামগুলো মনে করতে সময় নিলো। শেষ পর্যন্ত তৈরি হলো তালিকাটা। 'কই, কিছুই তো হচ্ছে না !' গম্ভীর হয়ে উঠলো ও। সবগুলো কাগজ ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে অ্যাশট্রেতে ফেলে আগুন ধরালো। 'টয়লেটে যাচ্ছি।'

'রবিন… ।'

'ওখানে আমার বুদ্ধি খোলে।'

'সত্যি ?'

মৃদু হেসে টয়লেটে গিয়ে ঢুকলো রানা।

বিছানায় চিৎ হয়ে শুলো লিলি, সিলিঙের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছে। টয়লেট থেকে পানির আওয়াজ আসছে। একটু পর কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে বেরিয়ে এলো রানা, ক'দিন আগে লিলিই ওকে কিনে দিয়েছে ওটা।

আবার উপুড় হলো লিলি, বিছানা থেকে প্যাড আর কলম তুলে নিলো।

'কি করছো?'

'পরের তালিকাটা আমি লিখবো,' বললো লিলি। 'আর কি বাকি আছে বলো।'

'তুমি যেন একটু রহস্যময় আচরণ করছো,' বললো রানা। 'আসলে কি চাও বলো তো?'

হেসে ফেললো লিলি। 'কি আবার চাইবো! বন্ধ একটা ঘরে দু'জন মানুষ কি চাইতে পারে?'

'ঢং ঢং ঢং ঢং!'

'তারমানে?'

বিছানায় বসলো রানা। 'তারমানে, এক ঘণ্টা ছুটি। এই এক ঘণ্টা কোনো কাজ নয়। শুধুই অকাজে ব্যস্ত থাকবো আমরা।' বিছানার আরেক কিনারার দিকে লিলি সরে যাচ্ছে দেখে খপ্ করে তাকে ধরে ফেললো রানা। শুরু হলো ধস্তাধস্তি, টানা-হ্যাঁচড়া।

ঠিক এক ঘণ্টা পর আবার কাজে হাত দিলো ওরা।

'আসল নাম আর ছদ্মনাম লেখা হয়ে গেছে। বাকি থাকলো কি?'

'ফোন নম্বর?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'বলে যাও।'

ফোন নম্বরগুলো লেখা হলো। লাভ হলো না কোনো। এমনকি প্রতি সেট নম্বর এদিক ওদিক করে সাজিয়েও কোনো ফায়দা হলো না।

'আর কি, রবিন ?'

'তুমি দেখছি একটা ফ্যানাটিক। এক সময় স্কুল মাস্টারনী ছিলে নাকি ?'

'ব্যক্তিগত ব্যাপার। তোমার কাজ আরেকটা তালিকা তৈরি করা। এরপর কি বলো।'

'মুখরা রমণী, দজ্জাল স্ত্রী···।'

'টয়লেটে তাহলে শুধু শুধু গিয়েছিলে ? আমাকে বলা হয়েছে তুমি নাকি সেরাদের অন্যতম। মাথায় শুধুই বুদ্ধি আর আইডিয়া গিজ গিজ করছে। কিছু বের করো, তা না হলে যে মান-সম্মান কিছু থাকে না !'

'খোঁচা দিচ্ছো। নাম, রাজ্য, স্থাপনা, ফোন নম্বর...এবার তাহলে শহরগুলোর নাম লেখো। যে শহরে স্থাপনাগুলো আছে।'

'বলে যাও।' রানা বলতে শুরু করলো, লিলি লিখে নিচ্ছে।

ডেনভার

আগাস্টা

লাক দু ফ্ল্যামবিউ

চ্যানিউট

হান্টিংটন

ইথাকা

মিয়ামি

সান ডিয়াগো

'তুমি একবার পড়ো তো,' নির্দেশ দিলো রানা। হঠাৎ নিঃশব্দে হাসতে শুরু করলো ও।

নির্দেশ পালন করলো লিলি।

মাথা ঝাঁকালো রানা। 'আমি একটা গাধা,' প্রায় চিৎকার করে ঘোষণা করলো ও। 'বেগম সা'ব, ব্যাটাকে বোধহয় পেয়েছি! মানে, প্যাটার্নটা পাওয়া গেছে, বুঝলে!'

তালিকার দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে বললো লিলি, 'কি বলছো!'

'মস্কো থেকে বলা হয়েছিল, ওরা তার নাম দুনিয়ার বুক থেকে মুছে ফেলবে। কিন্তু বাস্তবে উল্টোটা ঘটছে! মাই গড! ও মাই গড!'

'রবিন!'

'দেখতে পাচ্ছো না? ম্যানিয়াকটা নিজের নাম লিখছে! ইউনাইটেড স্টেটস অভ আমেরিকার ওপর নিজের নাম সই করছে ডালচিমস্কি।'

'রবিন!' চোখ বিস্ফারিত করে একবার তালিকা, একবার রানার দিকে তাকালো লিলি।

'ডেনভার—ডি। অগাস্টা—এ। লাক ডু ফ্ল্যামবিউ—এল। চ্যানিউট—সি। বারে শালা, বাহ্! কমরেড ডালচিমস্কি, তুমি ফাঁস হয়ে গেছো!'

আবার তালিকার দিকে তাকালো লিলি। 'কিন্তু আটটা শব্দে শুধু ডালচিমস পড়া যাচ্ছে, রবিন। ডি, এ, এল, সি, এইচ, আই, এম, এবং এস।'

'বাকি থাকলো কে এবং আই,' ব্যাখ্যা করলো রানা। 'খাতায় একটাই মাত্র কে আছে, সেখানেই এরপর আঘাত হানবে ডালচিমস্কি। সে ধরা পড়ে গেছে। চলো যাই চলো।'

নয়

বিকেল সাড়ে চারটেয় ডেট্রয়েট এয়ারপোর্টে নামলো ওরা, টার্মিনাল ভবনে এসে ফোন করলো রানা, তারপর আবার পাঁচটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে একটা কনভেয়ার প্লেনে চড়লো—কালামাজু, মিশিগানে পৌঁছে দেবে ওদের।

ছিয়াশি হাজার লোকের বাস কালামাজু-তে। চারটে ব্যাংক আছে।

ছিয়াশি হাজারের একজন হলো জন ফিদারহফ, একটা কেমিক্যাল সাপ্লাই ফার্মের মালিক। এলাকার কোড নম্বর ছয়শো ষোলো, কোম্পানীর ফোন নম্বর ৩২৫-৯৯৮৯। এসব তথ্য জানা আছে রানার, ডীপ-কাভার এজেন্টের মিশনটা কি তাও অজানা নয়। কিন্তু জানে না লোকটার সাথে কিভাবে আলাপ করবে ও। নামকরা এক ব্যবসায়ী ভদ্রলোককে যদি বলা হয়, আপনি একটা কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের স্পাই, একজন অন্তর্ঘাতক, ব্যাপারটাকে কিভাবে নেবেন তিনি? বলার পর কিভাবে প্রমাণ করবে রানা যে সে উন্মাদ নয়? জন ফিদার তার কথা বিশ্বাস করবে না! হয়তো পুলিশ ডাকবে সে।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো রানা, ডেট্রয়েট এয়ারফিল্ড থেকে আকাশে উঠছে প্লেন। একটা উপায় অবশ্য আছে, কিন্তু সেটা খুব বিপজ্জনক। লোকটার সামনে দাঁড়িয়ে কোড মেসেজটা উচ্চারণ করতে পারে ও। সাথে সাথে খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসবে আসল লোকটা, জন ফিদারহফ বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু তাতেও সমস্যার পুরোপুরি সমাধান হবে না। লোকটা নিজেকে কে. জি. বি.-র ডীপ-এজেন্ট হিসেবে চিনতে পারার সাথে সাথে সে তার মিশন সফল করার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠবে। বহু বছর আগে বহু টাকা খরচ করে এই ব্যাকুলতার বীজ তার মনের ভেতর বপন করে দেয়া হয়েছে। কোড সংকেতটা উচ্চারণ করার পর রানা যদি তাকে বলে, আগের সেই প্ল্যান বাতিল হয়ে গেছে, আমেরিকার সাথে রাশিয়ার যুদ্ধ বাধেনি, মিশনের কথা ভুলে যান—কি প্রতিক্রিয়া হবে তার? সে কি রানার কথা বিশ্বাস করবে?

তাকে সিনিয়র কে. জি. বি. কর্মকর্তাদের দোহাই দেবে রানা, যারা টেলি-বম প্রজেক্ট চালু করেছিলেন। রুশ ভাষায় কথা বলবে রানা। তাতেও যদি কাজ না হয়, জোর খাটাবে ও। অচল, অকেজো করে দেবে তাকে। দরকার হলে—হ্যাঁ, এমনকি লোকটাকে মেরে ফেলবে রানা।

তিক্ত মেজাজ নিয়ে এসব কথা ভাবছে ও, লাউডস্পীকারে পাইলটের গলা শোনা গেল। ছ'টা দশ বাজে। কালামাজু-তে ল্যাণ্ড করতে যাচ্ছে প্লেন।

'ঠিক জানো তো লোকটাকে পাওয়া যাবে ওখানে?' জিজ্ঞেস করলো

লিলি।

'জানি,' বললো রানা। রেন্ট-এ-কার কোম্পানীর অফিসে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা, একটা মেয়ে কাগজ-পত্র ঠিকঠাক করছে।

হাতঘড়ি দেখলো লিলি। 'শুধু শুধু দাঁড়িয়ে আছো কেন, তোমার দেরি হয়ে যাবে না?'

'দেরি হতে পারে বুঝেই তো ডেট্রয়েট থেকে ফোন করলাম তাকে,' বললো রানা। 'এক লাখ সত্তর হাজার ডলারের অর্ডার দেবো বলেছি, সব কাজ ফেলে অপেক্ষা করবে। দেখা করার কথা পৌনে সাতটায়।'

'ছ'টা বিশ বাজে, রবিন।'

লিলি ঠিকই বলছে, রানার আর দেরি করা উচিত নয়। বরং সময়ের আগে পৌঁছুতে পারলে ভালো হয়। 'ঠিক আছে, গাড়ি যখন ছুটো, আমি আগে রওনা হয়ে যাই।' লিলিকে ঠিকানাটা জানিয়ে দিলো রানা, বলে দিলো কোথায় দেখা হবে দু'জনের। বাইরে ট্যাক্সি অপেক্ষা করছিল, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে তাতে চড়ে বসলো ও।

দক্ষ ড্রাইভার, চেহারায় চালাক-চতুর ভাব। এলাকার সমস্ত রাস্তা খুব ভালো করে চেনে। একটু বেশি কথা বলে, কিন্তু রানার কাছ থেকে তেমন উৎসাহ না পেয়ে বেশি কথা বললো না। সাদা চুনকাম করা অফিস আর ওয়্যারহাউস এলাকা পেরিয়ে এলো ট্যাক্সি, ড্রাইভারকে থামতে বললো রানা। ভাড়া নিয়ে, 'হ্যাভ এ গুড ডে,' বলে চলে গেল লোকটা।

রাস্তার ধারেই গেট, গাড়ি-বারান্দায় গ্রে রঙের একটা পিন্টো কার দাঁড়িয়ে রয়েছে। কে জানে জন ফিদ.রহফ লোকটা কেমন।

বিখ্যাত একটা ফার্মের মালিক, আরো দামী গাড়ি ব্যবহার করা উচিত। মিসেস ফিদারহফ হয়তো মার্সিডিজ ব্যবহার করে। কিংবা পিণ্টোটা হয়তো চাকর-বাকররা বাজার-সওদা করার জন্যে ব্যবহার করে।

লোকটা বিবাহিত কিনা জানা নেই রানার। বিবাহিত হলে বোধহয় ছেলেমেয়েও আছে। কিন্তু বেচারা জানে না, সবই তাসের ঘর!

ঠেলা দিতেই খুলে গেল গেট। গেটের পাশেই আউটার অফিস। ভেতরে ঢুকে এক মহিলার সামনে দাঁড়ালো ও। সামনে ডেস্ক নিয়ে বসে আছে, বয়স হবে ত্রিশ-বত্রিশ, হাতের তালুতে ছোটো একটা আয়না নিয়ে ঠোঁটে আরেকবার লিপস্টিকের প্রলেপ লাগাচ্ছে। মোচা আকৃতির চুলের স্টাইল আজকাল অচল হয়ে গেছে, তবে বয়স লুকাতে কৌশলটার জুড়ি নেই। চোখ তুলে রানাকে দেখলো সে। শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল সাথে সাথে। 'মিঃ বিউমণ্ট?' এই নামেই ডেট্রয়ট থেকে ফোন করেছিল রানা।

'হ্যাঁ। মিঃ ফিদারহফ আছেন?'

'অত্যন্ত দুঃখিত। জরুরী একটা কাজে কিছুক্ষণের জন্যে বাইরে যেতে হয়েছে।'

বিপদ সংকেত বেজে উঠলো রানার মনে। 'অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট থাকা সত্ত্বেও চলে গেলেন? এখুনি ফিরবেন তিনি?'

আশ্বাস দিয়ে হাসতে চেষ্টা করলো মহিলা, কিন্তু পারলো না। 'জানি—জানি, মিঃ বিউমণ্ট। কিন্তু জরুরী একটা ব্যাপারে…।'

রানার মনে সাইরেন বাজতে শুরু করলো। 'কোথায় গেছেন তিনি? আপনাকে বলে গেছেন? কেউ ফোন করেছিল?'

ফার্ম এবং মালিকের সুনাম রক্ষার চেষ্টা করছে পার্সোনাল সেক্রেটারী। 'আপনি অস্থির হবেন না, প্লিজ! দাঁড়িয়ে কেন, বসুন না…।'

রানার ইচ্ছে হলো কষে একটা চড় লাগায়। সোজা প্রশ্নের সোজা উত্তর দেয় না কেন। 'আমার কথার জবাব দিন। কেউ ফোন করেছিল? আপনার বসের আমি একটা বিপদ আশঙ্কা করছি। তাড়াতাড়ি বলুন। ফোন এসেছিল?'

'জ্বী…জ্বী, হ্যাঁ। ফোন পেয়েই…।'

'কখন? কতোক্ষণ আগে?' রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইলো রানা।

'দশ…পনেরো মিনিট আগে। আপনি এতো উত্তেজিত কেন বলুন তো? কিসের বিপদ?'

'কে ফোন ধরেছিল? লোকটার কথায় কি বিদেশী টান ছিলো?'

'জ্বী, ছিলো!' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো মহিলা। 'কি ব্যাপার বলুন তো?'

'ফোন পেয়েই মিঃ ফিদারহফ তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেলেন, তাই না? যেন ভয়ানক জরুরী কিছু একটা ঘটে গেছে?'

মাথা ঝাঁকালো মহিলা। 'কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি বলবেন না আমাকে?'

'প্র্যাকটিক্যাল জোক, এ ব্যাড প্র্যাকটিক্যাল জোক—আই হোপ,' মিথ্যে কথা বললো রানা। 'যে লোকটা ফোন করেছিল সে একটু পাগলাটে। তাড়াতাড়ি তার ওখানে গিয়ে তাকে সামলাই, তা না হলে কি করে বসে কে জানে। ওটা তো আপনাদের গাড়ি, তাই না, পিন্টোটা?'

'হ্যাঁ। মিঃ ফিদারহফ সবুজ পন্টিয়াক চালান। বলেন তো আপ-

নাকে আমি লিফট দিতে পারি। তিন মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে যাবো আমিও।'

'আমি বরং ফোন করে একটা ট্যাক্সি ডাকি।'

ফোনটা দেখিয়ে দিয়ে টয়লেটে গিয়ে ঢুকলো পার্সোনাল সেক্রেটারী। সরাসরি অপারেটরকে ডায়াল করলো রানা, পুলিশ স্টেশনের সাথে যোগাযোগ দেয়ার অনুরোধ করলো।

'পুলিশ হেডকোয়ার্টার।'

'ভাববেন না কৌতুক করছি। এটা একটা ইমার্জেন্সী কল। জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন। পনেরো মিনিট হলো একজন ম্যানিয়াক ওয়াটসন ইলেকট্রনিক ল্যাব-এর দিকে রওনা হয়েছে। সবুজ একটা পন্টিয়াক চালাচ্ছে সে। তার সাথে বিস্ফোরক আছে। সে সশস্ত্র। আমি আবার বলছি—ভাববেন না কৌতুক করছি···।'

'আপনি কে?'

'ক্যাপটেন রুথম্যান, মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স। লোকটা অত্যন্ত বিপজ্জনক। দেখা পেলে সাবধানে এগোতে হবে। হোমিসাইডাল টাইপ, সামনে যাকে পাবে তাকেই খুন করতে চাইবে। ওয়াটসন ইলেকট্রনিক ল্যাবে যাচ্ছে স্যাবোটাজ করার জন্যে।'

'ঈশ্বর-পুত্র যীশু, এসব কি!'

'আমিও ওদিকে রওনা হচ্ছি,' বললো রানা। 'আপনারা আপনাদের রেডিও কারগুলোকে সতর্ক করে দিন। ল্যাবের সিকিউরিটি অফিসারদের জানান। আমার পৌঁছুতে বিশ মিনিট লাগবে।' রানা দেখলো টয়লেট থেকে বেরিয়ে আসছে মহিলা।

'লোকটা কমিউনিস্ট নাকি?'

'হ্যাঁ,' বলেই যোগাযোগ কেটে দিলো রানা। মহিলাকে বললো,

'ট্যাক্সি আসছে, আমি বরং বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করি।' দু'জনে ওরা এক সাথেই অফিস থেকে বেরুলো। পিন্টো নিয়ে চলে গেল মহিলা।

গেটের বাইরে বেরিয়ে এসে অস্থিরভাবে পায়চারি শুরু করলো রানা। ইংরেজী, রাশিয়ান, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, স্প্যানিশ, এবং এমনকি কিছু কিছু আরবীতেও গাল পড়তে লাগলো—ভাগ্যকে। লাভের মধ্যে সময়টা কাটলো। দু'মিনিটের মাথায় ভাড়া করা গাড়ি নিয়ে পৌঁছুলো লিলি।

'সব ঠিক আছে?' জানতে চাইলো সে।

'কিছুই ঠিক নেই! আমি পৌঁছুবার পনের মিনিট আগে ফোন করেছিল ডালচিমস্কি। ফিদারহফের পিছনে আমি পুলিশ লেলিয়ে দিয়েছি।'

পাশের সিটে সরে গেল লিলি, হুইলের পিছনে বসে গাড়ি ছেড়ে দিলো রানা।

'পুলিশ? পুলিশ কি করবে, রবিন?'

'আটকাবে। আহত করবে। গুলি করে মারবে। বলেছি, লোকটা হোমিসাইডাল ম্যানিয়াক। সাথে অস্ত্র আর বিস্ফোরক আছে। কে জানে বিশ্বাস করেছে কিনা।'

কালামাজু পুলিশ হেডকোয়ার্টারও ব্যতিক্রম নয়, এখানেও মাঝে মধ্যে ভুয়া ফোন কল আসে। কিন্তু রানার কণ্ঠস্বরে এমন কিছু একটা ছিলো, ডেস্ক ক্লার্ক ব্যাপারটাকে গুরুত্বের সাথে না নিয়ে পারেনি। সবুজ পন্টিয়াকে এক উন্মাদ আছে, এই জরুরী খবর সব ক'টা রেডিও কারকে জানিয়ে দেয়া হলো। চারটে কার নির্দেশ পেলো,

পন্টিয়াককে ওভারটেক করতে হবে। সম্ভবত হাইওয়ে ধরে ওয়াট-সন ইলেকট্রনিক ল্যাবের দিকে দিচ্ছে সে। সরাসরি ল্যাবের দিকে যেতে হলে ওটাই সবচেয়ে সোজা রাস্তা। ল্যাবের সিকিউরিটি অফিসারকেও বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হলো।

ডেঞ্জার অ্যালার্ম সিস্টেমের বোতামে চাপ দিয়ে স্পীকার তুলে নিলো সিকিউরিটি অফিসার, অনুপ্রবেশ ঠেকাবার জন্যে প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিলো আটটা গার্ড পোস্টকে।

মেইন গেটের সামনে ব্যারিকেড হিসেবে ব্যবহার করা হলো দশ টনী এক ট্রাক, আড়াআড়িভাবে পথ আগলে রাখলো সেটা। গার্ডরা তৈরি হয়ে পজিশন নিয়েছে, পাঁচ-ছয়টা অটোমেটিক রাইফেলের ম্যাগাজিন ক্লিক ক্লিক শব্দ করলো। দূরে শোনা গেল সাইরেনের আওয়াজ। সশস্ত্র প্রহরীরা আড়াল থেকে দেখলো, সবুজ একটা বিন্দুকে দুটো নীল বিন্দু ধাওয়া করে আসছে।

প্রতিরক্ষা স্থাপনার দিকে তীর বেগে ছুটে আসছে পন্টিয়াক! পিছু পিছু আশি মাইল বেগে আসছে এক জোড়া পুলিশ কার।

'ওপেন ফায়ার!' আধমিনিট পর বজ্রকণ্ঠের নির্দেশ বেরিয়ে এলো স্পীকার থেকে।

লাল আগুনে রেখা তৈরি করে ছুটে গেল তপ্ত সীসাগুলো, পাঁচটা এম-ফোরটিন একসাথে গর্জে উঠেছে। চোখের পলকে অদৃশ্য হলো উইণ্ডশীল্ড। ক্ষতবিক্ষত হলো এঞ্জিন। অকস্মাৎ ইহলোক ত্যাগ করে চলে যাওয়া মিঃ ফিদারহফের গায়ে বত্রিশটা বুলেট বিদ্ধ হলো। তারপর প্রতি মুহূর্তে ঘটতে শুরু করলো রোমহর্ষক ঘটনা। গ্যাসোলিন আর তেল বেরিয়ে এলো ফিনকি দিয়ে, চোখ ধাঁধানো গোলাপি আগুন আলিঙ্গন করলো গাড়িটাকে।

মৃত ড্রাইভারকে নিয়ে তারপরও এগিয়ে আসতে লাগলো পন্টিয়াক। ঝাঁক ঝাঁক বুলেটের বাধা পেয়ে তুমুল গতি মন্থর হয়েছে মাত্র, সামনে এগোবার ঝোঁকটা রয়ে গেছে। আড়াআড়িভাবে রাখা দশ টনী ট্রাকের সাথে ধাক্কা খেলো সেটা।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে আরো চারবার উথলে উঠলো আগুন। ফুয়েল ট্যাংক বিস্ফোরণের পরপরই আরেকটা প্রচণ্ড আওয়াজ শোনা গেল, এক নিমেষে দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল পন্টিয়াক। খানিক আগে খ্যাতনামা ব্যবসায়ী ছিলো যে লোকটা, পোড়া কয়লার টুকরো হয়ে বৃষ্টির ফোঁটার মতো রাস্তার চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো তার ধ্বংসাবশেষ। দেহটা সনাক্ত করার আর কোনো উপায়ই থাকলো না, দাঁত পরীক্ষা করে যদি বা চেনা যায় অন্তত তিন দিন সময় লাগবে। দু'টুকরো গাড়ি আরো দু'বার বিস্ফোরিত হলো। আওয়াজ শুনেই বলে দেয়া যায়, ডিনামাইটের বিস্ফোরণ।

আয়োজনটা ডালচিমস্কির। কাছেপিঠে উপস্থিত থাকলে দৃশ্যটা উপভোগ করতো সে, রোমাঞ্চিত হতো। কিন্তু এই মুহূর্তে চারশো মাইল দূরে রয়েছে সে। রানা রয়েছে এগারো মাইল দূরে, ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে পশ্চিমে, শিকাগোর দিকে যাচ্ছে ও। জানে, আগন্তুকদের থামানো হবে, জেরা করা হবে, সন্দেহ হলে আটকও করা হবে। কাজেই কালামাজু থেকে আশি মাইল না এগিয়ে কোথাও থামলো না ও। ধারণা করলো, সবগুলো রোডব্লকই ওর পিছনে।

রাস্তার ধারের একটা কফি হাউস থেকে কফি খেয়ে আবার গাড়ি ছাড়লো রানা। ফাঁকা হাইওয়েতে উঠে এসে ব্যাটারি চালিত শর্ট-ওয়েভ রিসিভারটা অন করলো।

সেই একই মেসেজ। ভাষাটা শুধু আগের চেয়ে কঠোর।

দু'ঘণ্টার মধ্যে কে. জি. বি. রেসিডেন্টের কাছে রিপোর্ট করতে হবে ওকে।

দশ

পার্কিং লটে গাড়ি, গাড়িতে লিলিকে রেখে একা একটা বারে ঢুকলো রানা। বুধবার রাত আটটা আটত্রিশ মিনিটে ফোন করতে হবে কে. জি. বি. রেসিডেন্টকে। আর দু'মিনিট পর।

বারে লোকজন প্রচুর, তবে ভাগ্য ভালো যে ফোন বুদে কেউ নেই। কারো দিকে সরাসরি না তাকিয়ে বুদে ঢুকলো রানা, দরজাটা বন্ধ করলো। আটটা সাঁইত্রিশে ডায়াল করতে শুরু করলো, ধীরে ধীরে, সাবধানে। শেষ নম্বরটা ঘোরাবার সাথে সাথে ক্লিক করে একটা আওয়াজ হলো, হাত ঘড়িতে বাজলো কাঁটায় কাঁটায় আটটা আটত্রিশ। 'রুম নম্বর পাঁচশো উনিশ,' রানা যেন কোনো হোটেল অপারেটরের সাথে কথা বলছে।

'তারমানে মিঃ লিপটনকে চাইছেন আপনি,' কর্কশ একটা কণ্ঠস্বর, ক্ষীণ বিদেশী সুর চাপা থাকলো না।

'মিঃ লিপটন ?'

'লাইন এনগেজড।'

তারমানে লাইন নিরাপদ, সাংকেতিক ভাষার সাহায্যে পরস্পরকে চিনতে পেরেছে ওরা।

'এদিকের সব খবর ভালো,' বললো রানা।

'বেচাকেনায় মন্দা যাচ্ছে, খবর ভালো হয় কি করে ?'

রানা বললো, 'ছ'দিন আগে হাউসটনে বড় একটা কনসাইনমেণ্ট বিক্রি হতে যাচ্ছিলো। দশ মিনিট দেরি হওয়াতে ব্যাপারটা ভণ্ডুল হয়ে যায়। তবে হতাশ হবার কিছু নেই, এখনো প্রচুর সম্ভাবনা আছে সব মাল বিক্রি করা যাবে।'

'কমপিটিটরের খবর কি ?'

'সাংঘাতিক ব্যস্ত। আমার ধারণা ঘণ্টা দুই আগে কালামাজু-তে কি ঘটেছে আপনি জানেন।'

'এখনো জানি না।'

'জানবেন। বোকার মতো যেখানে সেখানে ফোন করছে নিক, তার সাথে দেখা করে কারণ জিজ্ঞেস করবো আমি।'

'কোথায় ?'

'কাল বাদে পরশু যেখানে যাচ্ছে সে। ওখানে তার সাথে আমার দেখা হবে,' বললো রানা।

'তা কি সম্ভব ? কিভাবে তা সম্ভব ? জেনারেল ম্যানেজার কিন্তু পরিস্থিতি নিয়ে ভারি উদ্বেগের মধ্যে আছেন।'

'জেনারেল ম্যানেজারকে বলুন, নিক তার নাম সই করছে। হিসেব করে বের করেছি, এরপর সে ইণ্ডিয়ান গর্জে যাবে।'

'অসম্ভব। ইতিমধ্যে ওখানে চেষ্টা করা হয়ে গেছে তার। বর্ত-

মানে ওখানে কেউ নেই, গিয়ে লাভ কি? তাছাড়া, তাকে যেতে হবে কেন, যে-কোনো জায়গা থেকে ফোন করলেই তো পারে সে।'

'এক্ষেত্রে কোনো কাজ হবে না ফোন করে,' বললো রানা। 'অন্তত এই একটা ক্ষেত্রে লোকটার সাথে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করে কথা বলতে হবে তাকে। এ-কথা কেন বলছি পরে আপনাকে ব্যাখ্যা করবো।' কে. জি. বি. রেসিডেন্টের ব্রেন যে বিদ্যুৎবেগে কাজ করছে, আন্দাজ করতে পারলো রানা।

'তাহলে তো ভালোই। আপনার সাহায্যের জন্যে এদিক থেকে আমরা কিছু করতে পারি?'

'আপনি শুধু অন্যান্য সেলসমেনদের মার্কেট থেকে ডেকে নিন। আমি চাই না ওদের ভয়ে কম্পিটিটর পালিয়ে যাক।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আপনি এখন কোথায়?'

যোগাযোগ কেটে দিয়ে বার থেকে বেরিয়ে এলো রানা, গাড়িতে উঠে লিলিকে বললো, 'হারামজাদা জানতে চাইলো আমরা কোথায়।' এঞ্জিন স্টার্ট দিলো ও।

'কার কথা বলছো।'

'তোমার বস।'

'ও। তা কি বললে তুমি?'

স্পীড বাড়িয়ে দিয়ে পর পর দুটো গাড়িকে ওভারটেক করলো রানা, জবাব দিলো না।

আবার প্রশ্ন করলো লিলি, 'আমার কথা কিছু জিজ্ঞেস করলেন?'

'না।'

'কি কি কথা হলো?'

কাঁধ ঝাঁকালো রানা। 'ভয় হচ্ছে, হয়তো বেশি কথা বলে

ফেলেছি, লিলি। আমি যা বুঝেছি, ওরাও তা বুঝে নেবে। তালি-কায় আর একটা মাত্র 'আই' আছে, সইটা সম্পূর্ণ করার জন্যে ডালচিমস্কির দরকার ওটা। আয়রন রিভার না হয়ে যায় না।'

'বসকে নিশ্চয়ই তথ্যটা দাওনি তুমি?'

'না, এবং সে আমাকে জিজ্ঞেসও করেনি। সেজন্যেই দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছি। অবশ্য, জিজ্ঞেস করার আগেই যোগাযোগ কেটে দেই আমি···উঁহুঁ, ব্যাপারটা আমার ভালো ঠেকছে না।'

'মন খারাপ করো না তো। ফোন না করেও তো উপায় ছিলো না।'

হেডলাইটটা বারবার জ্বাললো আর নেভালো রানা, উল্টোদিক থেকে ছুটে আসা একটা গাড়ির ড্রাইভারকে সংকেত দিচ্ছে ও—হেডলাইট ডিম করতে বলছে।

'ওরা আমাকে নিয়ে খেলছে, লিলি,' বললো রানা। 'তা না হলে রেসিডেন্টের সাথে যোগাযোগ করতে বলবে কেন? রেসিডেন্টই বা জানতে চাইবে কেন আমরা কোথায়?'

'রবিন—।'

'ওরা যদি নাক গলায়, তার পরিণতি ভালো হবে না,' গম্ভীর সুরে বললো রানা। 'ডালচিমস্কিকে ধরার এটাই আমার শেষ সুযোগ। এবার যদি ব্যর্থ হই, ভাবতে পারো কি অবস্থায় পড়বো? এরপর সে কোথায় আঘাত করবে আমরা জানি না। পেন্টাগনে হতে পারে, হোয়াইট হাউসে হতে পারে, হতে পারে এস. এ. সি. হেডকোয়ার্টারে, কিংবা নরফোকের আটলান্টিক ফ্লীট কমাণ্ড পোস্টে হতে পারে—যুক্তরাষ্ট্রের নয় ডজন নার্ভ পয়েন্টের যে-কোনো একটায় হতে পারে। আমরা জানি কি ভাবছে সে? যদি ভেবে

থাকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বিশ জায়গায় ফোন করবে? কি মনে করো, আমেরিকানরা হাত-পা গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকবে?'

'এ-সব কথা ওরাও বুঝবে, রবিন। চিন্তা করো না। আমি বলছি, ওরা নাক গলাবে না, তুমি দেখো।'

সেই রাতেই দশটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি থাকতে রাউল ক্ল্যারমন্ট আয়রন রিভার, ওয়াইওমিঙ-এ পৌঁছুবার নির্দেশ পেলো।

গোটা ওয়াইওমিঙ স্টেটে মাত্র সাড়ে তিন লাখ লোকের বাস। দেখার মতো অনেক জিনিসই রয়েছে এখানে, তার মধ্যে একটা হলো রকি মাউণ্টেন। রাজ্যের পশ্চিম অংশের অর্ধেক পুরোপুরি পার্বত্য এলাকা বলা চলে। টেটন্‌স্ আর ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্কও ট্যুরিস্টদের জন্যে বিরাট দুটো আকর্ষণ। তিনটে বড় নদীর উৎসও রয়েছে এখানে।

চার নম্বর এবং অপেক্ষাকৃত ছোটো নদীটার নাম আয়রন রিভার। ঠাণ্ডা, স্বচ্ছ পানিবাহী নদীটার দুই তীরে প্রচুর খনিজ সম্পদ রয়েছে, তাই এই নামকরণ। শুধু মাছ ধরার জন্যে নয়, স্কি আর শিকারের জন্যেও প্রচুর লোক আসে এখানে। পর্যটকদের জন্যে সরকারী বেসরকারী অনেক লজ তৈরি করা হয়েছে, সারা বছরই লোকজন গিজগিজ করে এলাকাটায়। মাঝখানে কয়েক মাইলের ব্যবধানে অনেক র‍্যাঞ্চও আছে। আর আছে আয়রন রিভার শহর থেকে বিশ কি পঁচিশ মাইল দূরে অমূল্য কিছু গর্ত। এ-সব গর্ত কয়লা, তেল, লোহা বা জিপসামের উৎস নয়। ওগুলো আসলে সাইলো, ইউ. এস. এয়ারফোর্সের ইন্টারকন্টিনেণ্টাল রকেট রাখার জন্যে আণ্ডারগ্রাউণ্ড মিসাইল ইন্‌স্টলেশন। ওয়াইওমিঙে

আরো রয়েছে আই. সি. বি. এম. কমপ্লেক্স, অনেকেই সেগুলোর কথা জানে। কিন্তু একশো দুই নম্বর স্ট্র্যাটেজিক মিসাইল উইং-এর আশিটা মিনিটমেন মারণাস্ত্রের কথা কারো জানার কথা নয়, ও-গুলোর মাথায় পারমাণবিক বোমা ফিট করা আছে।

জানার কথা নয়, কিন্তু রাশিয়ান সামরিক বাহিনীর সিনিয়র কমাণ্ডাররা ঠিকই জানেন। আর সেজন্যেই আয়রন রিভার সহ আশপাশের রকেট কমপ্লেক্স টেলি-বম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তবে রকেট বা আনবিক বোমাবাহী মিসাইলগুলোকে অকেজো করে দেয়ার দায়িত্ব কাকে দেয়া হবে সে সিদ্ধান্ত তাঁরা ননি, নিয়েছিলেন কে. জি. বি. কর্মকর্তারা। লেফটেন্যান্ট ইগর পদো-ভিচকে অ্যাসাইনমেন্টটা দেয়া হয়, ট্রেনিং দিয়ে তাকেও একটা টেলি-বম বানানো হয়েছে।

ইগর পদোভিচ এঞ্জিনিয়ার্স ব্যাটালিয়নে ছিলো। ভালো আমে-রিকান ইংরেজী শেখানো হয় তাকে। তবে স্কীয়ার হিসেবে আগে থেকেই খ্যাতি ছিলো তার। আয়রন রিভার এলাকায় নিজেকে সে সুন্দরভাবে খাপ খাইয়ে নেয়। উপত্যকার দু'হাজার একশো আট-জন লোকের সাথে ভারি সম্ভাব তার। আমেরিকান নাম আলবার্ট হুবার্ট, এক ডাকে চেনে সবাই। মাঝারি আকারের একটা হোটে-লের মালিক সে, হোটেলটার নাম রেড ড্রাগন। একসাথে বসে পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন জন লোক খেতে পারে, সাথেই একটা বার রয়েছে। শহরের এক ধারে সুন্দর একটা পরিবেশ, ট্যুরিস্টরা এখানে থাকার সুযোগ পেলে স্বস্তি বোধ করে। কুক লোকটা খুব রসিক, নাম অস্কার অটারম্যান, এক কালে এলাকার নামকরা বক্সার ছিলো। রেস্তোরাঁয় কাজ করে দু'জন ওয়েট্রেস – এলা আর লিল। এলার

বয়স হবে ছত্রিশ, আঠারো বছর বয়েসের এক ছোকরার সাথে খুব মাখামাখি তার, তবে সবাই জানে ওরা বিয়ে করবে না। লিল মেক্সিকান মেয়েদের মতো দেখতে, বয়স ওই ছত্রিশ-সাঁইত্রিশই হবে। তার প্রেমিকের বয়স ষাট, বউ মারা গেলে লোকটা তাকে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছে।

রেড ড্রাগনের নিয়মিত খদ্দেরদের মধ্যে রয়েছে পুলিশ অফিসার, খনি শ্রমিক, র‍্যাঞ্চার, দোকান কর্মচারী আর সরকারী অফিসার। একশো দুই নম্বর উইং-এর কমিশনড বা নন কমিশনড অফিসাররাও আসে, তবে নিয়মিত নয়। অনেক বছর আগে অবশ্য এক মহিলা ক্যাপটেন নিয়মিত কিছুদিন আসা-যাওয়া করেছিল। এয়ার ফোর্স কমপ্লেক্সে ডেপুটি কমিউনিকেশন অফিসার ছিলো সে। আলবার্ট হুবার্টের সাথে তার খুব ঘনিষ্ঠতা হয়, মেয়েটার দাঁতের পিছন দিক ছাড়া বাকি সবই দেখা হয়ে গিয়েছিল হুবার্টের। কিন্তু সম্পর্কটা থেকে শুভ কোনো ফলাফল বেরিয়ে আসেনি। প্রণয় পরিণয় পর্যন্ত গড়াবে না বুঝতে পেরে নিজের চেষ্টায় ক্যালিফোর্নিয়ায় বদলি হয়ে যায় মেয়েটা। কেউ পরিষ্কারভাবে জানে না কেন তাকে বিয়ে করেনি হুবার্ট। মেয়েটা নিজেও বুঝতে পারেনি। হুবার্ট জানতো না, তার অবচেতন মনে একটা বাধা-নিষেধ রয়ে গেছে, কোনোভাবেই এমন কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি করা যাবে না যার ফলে সিকিউরিটি চেকিঙের সাবজেক্ট হতে হয় তাকে। এয়ার ফোর্সের একজন অফিসারকে বিয়ে করতে চাইলেই তার অতীত ঘাঁটাঘাঁটি শুরু হবে, তাই তার অবচেতন মন নাক গলিয়ে বসে।

এরপর আলবার্ট হুবার্টের জীবনে দ্বিতীয় আরেকটা মেয়ে আসে। বোস্টন থেকে স্থানীয় স্কুলে চাকরি নিয়ে আসে মেয়েটা, নাম এপ্রিল

ওয়েনেসডে। উনিশ শো পঁচাত্তর সালে বিয়ে হয় ওদের। স্বামীর মতোই দক্ষ স্কীয়ার সে, আউটডোর লাইফ পছন্দ করে, এবং পুরনো দিনের গানের ভক্ত। শুক্র আর শনিবার রাতে রেড ড্রাগনে গিটার বাজায় সে।

কিন্তু স্বামীর থাকলেও, এপ্রিল হুবার্টের কোনো ট্রাইপড নেই।

বিয়ে বার্ষিকীতে স্বামীর কাছ থেকে উপহার পাওয়া সাদা ঘোড়া নিয়ে প্রায় সারাটা দিন বাইরে বাইরে কাটায় এপ্রিল হুবার্ট, হোটেল ব্যবসা নিয়ে তার তেমন কোনো মাথাব্যথা নেই। হোটেল-টার ওপর, দোতলায় সুসজ্জিত আপার্টমেন্টে থাকে তারা। তাদের কোনো ছেলেমেয়ে নেই।

গ্যাস স্টেশনটাকে আয়রন রিভার শহরের কেন্দ্রবিন্দু বলা হয়, সেখান থেকে রেড ড্রাগন মাত্র এক মাইলের পথ। রকি পর্বতমালার কয়েকটা নয়নভোলানো চূড়ার দিকে মুখ করে আছে হোটেলটা। রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে সূর্যোদয় দেখার জন্যে পাহাড়ে চড়ে মিসেস হুবার্ট। নিরীহ দর্শন, শান্ত স্বভাবের স্বামীকে নিয়ে খুব সুখী জীবন তার। সচ্ছল আলবার্ট হুবার্টও এপ্রিলের মতো হাসিখুশি বউ পেয়ে ভারি সন্তুষ্ট।

বিকেল পাঁচটা, আয়রন রিভারের পথে রয়েছে ওরা।

সব রকম বিপদ আর বিপত্তির জন্যে তৈরি হয়ে আছে রানা। ওর গম্ভীর চেহারায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ একটা ভাব লিলির দৃষ্টি এড়ায়নি। এই মুহূর্তে লিলি অবশ্য তিন শো গজ পিছনে রয়েছে, আরেকটা গাড়িতে। সাবধানের মার নেই, তাই দুটো গাড়ি ভাড়া করেছে রানা। একটা অচল হয়ে গেলে তাড়াতাড়ি আরেকটা যাতে নাগা-

লের মধ্যে থাকে। রানা জানে, ডালচিমস্কিকে ধরার এটাই ওর শেষ সুযোগ। আটচল্লিশ ঘণ্টায় একটা করে ফোন কল, উন্মাদটা যদি এখনো এই নিয়মে টেলি-বম ফাটায়, তাহলে পরবর্তী হিউম্যান বোমা ফাটার আগেই আয়রন রিভারে পৌঁছে যাবে ওরা। ডীপ-কাভার এজেন্ট আলবার্ট হুবার্ট সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য জানা আছে রানার।

রানার একটা প্ল্যান আছে, তীর বেগে গাড়ি ছুটিয়ে সেটার কথাই বারবার ভাবছে ও। বিস্তীর্ণ প্রেয়ারী এলাকার ওপর দিয়ে সরু ফিতের মতো চলে গেছে রাস্তা দূর পাহাড়ের দিকে। উপত্যকায় এসে চূড়াগুলোকে আরো অনেক বড় দেখলো ওরা, রাস্তার পাশে এই প্রথম মাইলস্টোন দেখা গেল—আয়রন রিভার আর মাত্র এগারো মাইল সামনে। রাস্তার পাশে গাড়ি থামালো রানা, ওর পিছনে থামলো লিলি। গাড়ি থেকে নেমে রানাকে হেঁটে আসতে দেখে জানালার কাঁচ নামালো সে।

'সব মনে আছে তোমার?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'আগে আমি পৌঁছুবো,' বললো লিলি। 'মোটেলে ঘর ভাড়া করবো। মনে থাকবে না কেন?'

'ব্লু ঈগল মোটেল,' নামটা বললো রানা। 'রেড ড্রাগন থেকে তিন শো গজ দূরে।'

'জানি,' বিরক্তি চেপে বললো লিলি। 'তুমি ওদের ফোন করেছিলে, ওরা বলেছে মোটেলে খাবার পরিবেশন করা হয় না, তবে অতিথিরা রেড ড্রাগনে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করতে পারে। এই নিয়ে সাত বার আলোচনা হয়েছে।'

'আট বার হলেও ক্ষতি নেই। ঘর ভাড়া করে ওদের বলবে,

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পৌঁছুবো আমি।'

'তাও জানি। এক ঘণ্টা ঘুরে ঘুরে জায়গাটা দেখবে তুমি। পরে হয়তো কাজে লাগবে—ডিনারের পর রাতে. তাই না, মিঃ গর্ডন? আর কিছু?'

'চোখ-কান খোলা রাখবে। অস্বাভাবিক কিছু ঘটতে দেখলে ওয়াকি-টকি অন করে আমার সাথে যোগাযোগ করবে। ওটার রেঞ্জ ছুই থেকে তিন মাইল।'

'জানি, মিঃ গর্ডন।'

মিসেস গর্ডনকে অবাক করে দিয়ে ঝুঁকলো রানা, জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে গাড়ির ভেতর চুমো খেলো লিলিকে। তারপর সিধে হয়ে ফিরে এলো নিজের ফোর্ডের কাছে, স্টার্ট দিয়ে ছেড়ে দিলো গাড়ি।

বিশ মিনিট পর ব্লু ঈগল মোটেলে ঢুকলো লিলি। একতলা একটা বাড়ি, অফিস সহ পনেরোটা কামরা। অফিসে একটা কাউ-ন্টার আর খানকয়েক আর্মচেয়ার রয়েছে, ভেণ্ডিং মেশিন থেকে পাঁচ রকমের ঠাণ্ডা সোডা ওয়াটার পাওয়া যেতে পারে। কামরা-গুলোর প্রতিটির আলাদা এয়ার-কণ্ডিশনিং ইউনিট আছে। ভাড়া নেয়ার পর নিজেদের কামরাটা দেখলো লিলি। জোড়া বিছানা, চেয়ার-টেবিল, ওয়ার্ডরোব, শাওয়ারসহ সংলগ্ন বাথরুম। আটটা বাজতে বিশ মিনিট বাকি থাকতে পৌঁছুলো রানা।

'কোথায় ছিলে তুমি, রবিন?' রানার হাত ধরে জিজ্ঞেস করলো লিলি। 'আমার দুশ্চিন্তা হচ্ছিলো। ওয়াকি-টকিতে তোমার সাথে আমি পাঁচবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করলাম···।'

'শহরটা এক চক্কর ঘুরে উপত্যকায় গিয়েছিলাম, ড্যাম দেখতে,'

বললো রানা। 'রেঞ্জের বাইরে ছিলাম।' শার্টের বোতাম খুলতে শুরু করলো ও।

'ড্যাম ?'

'ডানবার ড্যাম। ওটাই ডালচিমস্কির টার্গেট।'

'ও মাই গড !'

'ড্যামটা যদি ভাঙা যায় গোটা উপত্যকা ডুবে যাবে।'

'রবিন !'

'রকেট সাইলো, কয়েক শো ক্রু, কমাণ্ড পোস্ট, দু'হাজার সিভিলিয়ান—আমরাও বাদ পড়বো না। উনিশ মিনিটের ব্যাপার, লিলি। ড্যাম বিস্ফোরিত হবার উনিশ মিনিটের মধ্যে গোটা উপত্যকা দশ ফিট পানির তলায় তলিয়ে যাবে। চমৎকার একটা আইডিয়া, তাই না ?'

লিলির চোখে পলক নেই। অবিশ্বাসে মাথা নাড়লো সে।

সিঙ্কের সামনে দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডা পানিতে মুখ ধুলো রানা। লিলির হাত থেকে তোয়ালে নিয়ে ঘষলো মুখে। 'চলো খেতে যাই।'

'জায়গাটা খুঁজে পেয়েছো ?'

'সম্ভবত। চলো যাই।'

'স্টেকটা খেয়ে দেখুন,' পরামর্শ দিলো ওয়েট্রেস লিল।

'স্টেকটা বোধহয় তোমাদের স্পেশাল, মিস ?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'সবাই আমাকে লিল বলে।'

'স্টেকটা বুঝি খুব ভালো, লিল ?' সহাস্যে আবার জিজ্ঞেস করলো রানা।

'খেলে ভুলতে পারবেন না। এই রাজ্যের সবচেয়ে ভালো রিব- ও পরিবেশন করি আমরা। এই দুটো জিনিস রান্না করার সময় মিঃ হুবার্ট নিজে দাঁড়িয়ে থাকেন কিচেনে।'

'মিঃ হুবার্ট ?'

'আমাদের মালিক,' সমীহের সাথে বললো লিল। 'সাংঘাতিক নিষ্ঠা ভদ্রলোকের। বুঝতে পারছেন না, তা না হলে একার চেষ্টায় এলাকার সেরা হোটেলের মালিক হলেন কিভাবে!'

ডিনারের আগে দুটো ড্রিঙ্ক নিল ওরা। রান্নাটা সত্যি ভালো। আশপাশে যারা বসে আছে তারা সবাই শান্তশিষ্ট, ভদ্র ,এবং ভোজনরসিক। সবাই সুবেশী, খাওয়ার ফাঁকে নিচু গলায় আলাপ করছে। এয়ারফোর্সের ইউনিফর্ম পরা বেশ কয়েকজন লোককে দেখলো রানা। লিলির সাথে আয়রন রিভার, উপত্যকা, মোটেল বা হোটেল, প্রাকৃতিক দৃশ্য, পরিবেশ, আবহাওয়া, ইত্যাদি কোনো বিষয় নিয়ে আলাপ করলো না ও। তবে অনেকেই লক্ষ্য করলো নিচু গলায় রানা যা বলছে, ঘন ঘন মাথা নেড়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছে লিলি। রানার আলাপের বিষয় হলো পোশাক। ওর ধারণা, দু'- ধরনের পোশাক পরা উচিত মেয়েদের। যখন বাইরে বেরুবে তখন আপাদমস্তক ঢাকা থাকবে। আর যখন চার দেয়ালের ভেতর থাকবে তখন কিছুই ঢাকা থাকবে না।

এক সময় সুদর্শন, স্মার্ট এক লোককে লক্ষ্য করলো রানা। চল্লিশের কাছাকাছি হবে বয়স, যে-বয়সে অনেক পুরুষই কিশোরী বা কম বয়েসী যুবতীদের প্রেমে পড়ার ঝোঁক সামলাতে পারে না। দ্বিতীয় ওয়েট্রেসকে কি যেন নির্দেশ দিচ্ছে লোকটা।

'মালিক,' বিড়বিড় করে বললো রানা।

'ওই তাহলে হুবার্ট ?'

'হতেই হবে। আরেকটা ড্রিঙ্ক নেবে ?'

লিলের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে রানা, ব্যাপারটা লক্ষ্য করলো হুবার্ট। অর্ডার নেয়ার জন্যে নিজেই এগিয়ে এলো সে। 'বলুন কি দরকার ?'

'আপনিই বুঝি মিঃ আলবার্ট হুবার্ট ?'

হাসতে লাগলো লোকটা। 'সবাই আমাকে ড্রাগন বলে। আয়-রন রিভারে আমরা কেউ ফরমালিটির ধার ধারি না। বলুন কি দরকার আপনাদের।'

লোকটাকে আশ্চর্য সপ্রতিভ এবং নিরীহ বলে মনে হলো লিলির। এরকম শান্ত, সুদর্শন একজন মানুষ দু'হাজার লোককে ডুবিয়ে মারতে পারে বলে বিশ্বাস হয় না। সহজ ভঙ্গিতে হেঁটে চলে গেল হুবার্ট, মার্টিনির অর্ডারটা ওয়েট্রেসকে জানিয়ে দিয়ে কাউন্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। বারম্যানের হাত থেকে হুই-স্কির গ্লাস নিলো সে।

কামরাটা ভালো করে আরেকবার দেখে নিলো রানা। কামরা থেকে বেরুবার আর ঢোকার পথগুলো মনে গেঁথে রাখলো। 'জানা-লার বাইরে অন্ধকার,' ফিসফিস করে বললো লিলিকে। 'ভয় পাও-য়াতে চাইছি না, তবে ওদিক থেকে বিপদ আসা অসম্ভব নয়। যতোটা সম্ভব সাবধানে থাকা দরকার।'

'তুমি কোনো বিপদের আশঙ্কা করছো ?'

'সব সময়, লিলি, সব সময়।' হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো রানা। 'এক মিনিটের জন্যে মাফ করবে ?' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে ঘুরে হাঁটা ধরলো ও।

পুরুষদের টয়লেটে ঢুকলো রানা, ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে জানালার সামনে চলে এলো। ফ্রেমে আটকানো কাঁচের কবাট খুলে বাইরে উঁকি দিলো ও। কাউকে দেখলো না।

কোমরে হাত দিয়ে পিস্তলের অস্তিত্ব অনুভব করলো রানা। তার-পর জানালার কার্ণিশে উঠে বসলো, ছোট্ট লাফ দিয়ে টয়লেটের বাইরে ঘাসের ওপর নামলো প্রায় নিঃশব্দে।

ঘাড় আর মাথা নিচু করে শিকারী বিড়ালের মতো এগোলো রানা। মাথার ওপর টেলিফোনের তার, সেটাকে অনুসরণ করছে ও। এই তারই রাস্তার ধারের পোলের সাথে রেড ড্রাগনকে সং-যুক্ত করেছে। পকেট থেকে ছোটো একটা মেটাল টুল বের করে কি যেন করলো রানা, তারপর সেই জানালা পথেই ফিরে এলো নিজেদের টেবিলে। দেখলো ওদের টেবিলে কফি পরিবেশন করছে লিল। হাতঘড়ি দেখলো রানা। ন'টা চল্লিশ।

রাত দশটা বিশ। ফিনিক্স, আরিজোনা।

একটা থিয়েটারের লবি থেকে ডায়াল করতে শুরু করলো নিকো-লাই ডালচিমস্কি। পাঁচ মিনিটে তিন বার ডায়াল করলো সে। কোনো উত্তর নেই। নর্থ সেন্টাল এভিনিউয়ে, তার হোটেলে ফিরে এলো সে। একটা পাঁচে ডায়াল করলো আবার। খুঁত খুঁত করতে লাগলো মনটা। রুম সার্ভিসকে বললো সকাল সাতটায় তার ঘুম ভাঙাতে হবে। শুয়ে পড়লো সে, কিন্তু ঘুম এলো আরো প্রায় এক ঘণ্টা পর। একটুতেই অধৈর্য হয়ে পড়া স্বভাব, ঘুমের মধ্যেও উদ্বেগে ভুগলো ডালচিমস্কি। কি কি সব দুঃস্বপ্ন দেখলো, সকালে ঘুম ভাঙার পর কিছুই মনে করতে পারলো না। ঘুমের মধ্যে অস্থির

একটা সময় কেটেছে, শরীরটা বিশ্রাম পায়নি, সারা গায়ে ব্যথা। ব্যাপারটা হয়তো অস্বস্তিকর, দাড়ি কামাবার সময় নিজেকে বললো সে, কিন্তু ঘাবড়াবার মতো কিছু নয়। নিজেকে অভয় দেয়ার চেষ্টা করলেও, দু'জায়গায় গাল কেটে ফেললো। ক্ষতের জ্বালা নিয়ে ব্যস্ত হাতে কাপড় পরলো, তর তর করে সিঁড়ি ভেঙে সরাসরি নিচের বুদে এসে ঢুকলো। ঘড়িতে তখন সাতটা পঁচিশ।

কোনো সাড়া নেই।

ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিলো, কিন্তু মুখে রুচলো না। আঙুরের জুস গেলার সময় মনে হলো তেতো কোনো ওষুধ খাচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে আয়রন রিভারের টেলিফোনটার কথা ভাবছে সে। নম্বরে কোনো ভুল নেই। জানে সে, তবু একজন লং ডিসট্যান্স অপারে-টরকে জিজ্ঞেস করে নিশ্চিত হয়ে নেবে। কফি শেষ করে অপারে-টরকে ফোন করলো। তার জানা নম্বরটাই আউড়ে গেল মেয়েটা। আবার ডায়াল করলো ডালচিমস্কি।

রিসিভার তুলছে না কেউ।

খারাপ কি যেন একটা ঘটতে শুরু করেছে।

চুরুট ধরালো ডালচিমস্কি। হাত কাঁপছে দেখে গালিগালাজ করলো নিজেকে—মর শালা!

এগার

এঞ্জিনের কাঁপা কাঁপা শব্দে চট করে ঘুম ভেঙে গেল রানার। বিপদের মধ্যে থাকার সময় ঘুম ওর কখনোই গভীর হয় না। কিভাবে অস্তিত্ব রক্ষা করতে হয় সে-সম্পর্কে অভিজ্ঞতা এবং ট্রেনিং, দুটো এক হয়ে ঘুমের মধ্যেও সচেতন রাখে ওকে। আয়রন রিভারের পরিস্থিতি এমনিতেই সংকটময়, মাথার ওপর আওয়াজটা আরো বেশি উত্তেজনাকর।

সব হেলিকপ্টারকেই বাঁকা, সন্দেহের চোখে দেখে রানা। ওগুলোর সাথে পুলিশ বা এফ. বি. আই.-এর সম্পর্ক আছে।

বিছানার ওপর শিরদাঁড়া খাড়া করে বসে থাকলো রানা। দশ সেকেণ্ড পর মেঝেতে নেমে টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। নিউ ইয়র্কে কেনা রেডিওটা অন করলো, কিনেই ছিলো এফ. বি. আই. ফ্রিকো-য়েন্সি ধরার জন্যে। সতর্কতার সাথে ধীরে ধীরে কাঁটা ঘোরালো, হেলিকপ্টার থেকে কোথাও কোনো মেসেজ পাঠানো হলে জানতে পারবে।

কিছুই শোনা গেল না।

জানালা দিয়ে বাইরে ভোরের আবছা অন্ধকারে তাকিয়ে থাকলো রানা। ক্লান্ত চোখে সহজে ধরা পড়লো না যান্ত্রিক ফড়িংটা। যখন ধরা পড়লো, অনেকটা দূরে সরে গেছে। অলস ভঙ্গিতে উত্তর অর্থাৎ শহরের দিকে যাচ্ছে ওটা। এতোটা দূর থেকে 'কপ্টারের গায়ে কোনো চিহ্ন থাকলেও দেখতে পাবার কথা নয়। হতে পারে এয়ারফোর্সের 'কপ্টার, একটা এস. এ. সি. পাখি, মিসাইল ক্রু বা মেইন্টেন্যান্স টিমকে সাইলোতে পৌঁছে দিচ্ছে। কিংবা এক শো ছুই নম্বর কমাণ্ড পোস্টে ফিরে যাচ্ছে। অথবা ধনী, সৌখিন কোনো শিকারী এলো আয়রন রিভারে। এরিয়াল সার্ভের জন্যে জিওলজিস্টরাও মাঝে মধ্যে আসে এদিকে।

কিন্তু কোনোভাবেই মনটাকে শান্ত করা গেল না। কেন যেন মনে হতে লাগলো, হেলিকপ্টারটায় ওর শত্রু আছে, ওটা তার জন্যে একটা হুমকি। সুন্দরী মেয়েটা ঘুম ঘুম চোখে বিছানা থেকে তার দিকে তাকিয়ে আছে, কিন্তু তাকে কিছু বললো না রানা। লিলি হয়তো শুধু তাকিয়েই আছে, কিছুই বোঝেনি। তাছাড়া, ব্যাখ্যা করার মন নেই তার।

ধীরে ধীরে দূর আকাশে হারিয়ে গেল হেলিকপ্টারটা। তারপরও জানালার সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলো রানা।

'রবিন।'

'বলো।'

'এখানে আসবে, আমার কাছে?'

জানালার দিকে পিছন ফিরে সিগারেট ধরালো রানা। ক্লান্তিতে ঝুলে আছে ওর কাঁধ ছুটো। সব চুল এলোমেলো হয়ে আছে মাথায়। ব্যর্থতা এবং বিরতিহীন উত্তেজনা কাহিল করে ফেলেছে

ওকে। প্রতি মুহূর্তে উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তার চাপ, কতো আর সহ্য হয়। লিলির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলো ও। এখনো মেয়েটা পুরোপুরি প্রফেশনাল হয়ে উঠতে পারেনি। ওর সাথে কারচুপি করছে মেয়েটা, নির্দিষ্ট একটা ক্ষেত্রে এবং একটা পর্যায় পর্যন্ত। রবিনের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছে, চেষ্টা করেও ব্যাপারটা চেপে রাখতে পারেনি। প্রফেশনাল হয়ে উঠতে আরো দেরি আছে তার।

'কি দেখছো রবিন?' কোমল সুরে জিজ্ঞেস করলো লিলি।

'তোমাকে।'

'আমি কি নতুন?'

কাঁধ ঝাঁকালো রানা। 'পুরনো হবার আগেই যে চলে যাবে বলে জানি তাকে কি বলা যায়?' পাল্টা প্রশ্ন করলো রানা।

সাথে সাথে কিছু বলার মতো খুঁজে পেলো না লিলি। সে-ও একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলো। 'সত্যিই তো, কি বলা যায়। তারপর চলে যাবার পর যখন জানবে মেয়েটা সুবিধের ছিলো না তখনই বা কি বলবে?'

'এ-কথা বলছো কেন?' এগিয়ে এসে বিছানার কিনারায় বসলো রানা। 'মেয়েটা তুমি সুবিধের নও—মানে?' হাসিটুকু লুকিয়ে রাখলো ও।

'তোমার প্রতি আমি দুর্বল এটা তোমাকে বুঝতে দিয়েছি, কিন্তু চলে যাবার পর তোমার কথা বেমালুম ভুলে যাবো—সুবিধের হলাম কি করে?'

'ভুলে যাবে?'

'যেতে হবে।'

'কেন ?'

'এখন জানতে চেয়ো না,' জোর করে হাসলো লিলি। 'বিদায়ের আগে আমি নিজেই তোমাকে উত্তরটা দিয়ে যাবো। এখন কাজের কথা হোক। তার আগে বলো, তুমি ঘুমাতে পারোনি কেন ?'

'কি করে বুঝলে··· ?'

'রাত চারটের সময় বাইরে গিয়েছিলে—কোথায় ?' জিজ্ঞেস করলো লিলি। 'আধ ঘণ্টা পর আবার ফিরে আসো।'

'গিয়েছিলাম—ছোট্ট একটা বীমা করে রাখলাম। ম্যানিয়াক-টাকে এখানে আনতে হলে আটচল্লিশ ঘণ্টা ফোন সার্ভিস অচল করে রাখা দরকার। লাইনের দুটো ইন্স্যুলেটরে একটু কারিগরি বিদ্যা ফলিয়েছি। তাতে একটা দিন অতিরিক্ত সময় পাবো হাতে। এই সময়ের মধ্যে যদি ও না আসে, ফোন লাইন আরো একদিন অচল রাখার জন্যে আবার আমাকে বিদ্যা ফলাতে হবে। দরকার হলে মেইন কেবল-ই উড়িয়ে দেবো আমি।'

'তুমি সিরিয়াস ?'

'সিরিয়াস নই মানে! দরকার হলে হুবার্টকে আমি খুন করতে পারি তা জানো! একের পর এক খুনগুলো ঘটতে দেখে নিজের ওপর ঘেন্না ধরে গেছে আমার, লিলি! কোনো বুদ্ধিই খেলছে না মাথায়, ভোঁতা হয়ে গেছি! বোকা আর অসহায় লোকের শেষ অবলম্বন ভায়োলেন্স—পরিস্থিতি আমাকেও ভায়োলেন্ট হয়ে যাবার দিকে নিয়ে যাচ্ছে!'

'তুমি বোকা নও, হানি। নামকরা স্পাইদের জীবনী পড়োনি? একটানা দশ বছর কঠোর পরিশ্রম করার পর এক আধটা অ্যাসাইন-মেন্টে সফল হয় তারা। স্পাইরা জাদু দেখায় শুধু থ্রিলারে, সব

গাঁজা। বোকা নও, তবে তুমি ক্লান্ত।'

হেসে উঠলো রানা। 'লোকটাকে আমার ঈর্ষা হচ্ছে।'

'কার কথা বলছো?' সুরেলা কণ্ঠে বিস্ময় প্রকাশ করলো লিলি।

'যার সাথে তোমার বিয়ে হবে,' বললো রানা।

'বিয়ে হবেই এমন কোনো কথা··· ।'

'কাউকে ভালোবাসো না?'

'জানি আমার জন্যে নাকি অনেকেই পাগল-ছাগল, কতোটুকু বা কেন তা জানি না। জানতে কখনো চেষ্টাও করিনি। কী লাভ শুধু শুধু কষ্ট কুড়োনোর?'

'তারমানে আমি পাগল হলেও আমার কোনো সুযোগ নেই?'

'তোমার পাগল হবার দরকার আছে কি? দেবার মতো এমন কিছু আছে যা তোমাকে দেইনি আমি? কিন্তু প্রসঙ্গ থেকে সরে যাচ্ছি আমরা। আমরা ডালচিমস্কির কথা বলছিলাম।'

'চিন্তা করো না। হার তাকে মানতেই হবে। প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আমি গ্রেট।'

'আমি তা জানি, রবিন।'

'আর কেন আমি জিতবো, জানো? কারণ আমি খুব কম ভুল করি। তার চেয়ে বেশি প্রফেশনাল আমি, বেশি সতর্ক। সব কিছু যাচাই করে দেখি, বারবার। এই কাজটায় তোমার সাহায্য দরকার হবে আমার। কাপড় পরে তৈরি হয়ে নাও। হেলিকপ্টারটা সম্পর্কে জানতে হবে আমাকে। কাজটা তোমাকে দিয়ে করাবো, আর এখান থেকে রেড ড্রাগনের ওপর নজর রাখবো আমি।'

দশটা পঞ্চাশ মিনিটে ফিরে এলো লিলি, তখনো রানা রাস্তার দিকে তাকিয়ে টেলিফোন কোম্পানীর ট্রাকের জন্যে অপেক্ষা

করছে। হেলিকপ্টারটা চার্টার করেছে একজন স্পোর্টসম্যান-হান্টার, ডালচিমস্কির চেয়ে কমকরেও দশ বছরের ছোটো, আর কয়েক ইঞ্চি বেশি লম্বা। রুট একশো এগারোয়, ভ্যালি লজ-এ উঠেছে লোকটা, প্রায় তিন মাইল উত্তরে। হোটেলে নাম লিখিয়েছে, টিম ম্যাক-ফারলন। পাহাড়ে আসা-যাওয়া করার জন্যে একটা জীপও ভাড়া করেছে সে।

'বিশ্বাস করি না। এটা শিকারের মরশুম নয়। প্রচণ্ড গরম। সে কি একা?'

মাথা ঝাঁকালো লিলি।

'কিছুই প্রমাণ হয় না। অন্যান্যরাও হয়তো এখানে পৌঁছে গেছে।'

'অন্যান্যরা, রবিন?'

'কেন, তোমাকে আমি বলিনি এফ. বি. আই. এজেন্টরা দল বেঁধে অভিযানে বেরোয়? কেউ তার সাথে দেখা করেছে?'

মাথা নেড়ে কালো কফির কাপটা রানার দিকে বাড়িয়ে ধরলো লিলি। 'নাও।'

ধূমায়িত কাপে চুমুক দিলো রানা। 'দরকার বটে। ধন্যবাদ। তুমিও জানো আমার ঘুমানো চলবে না।'

'রেজিস্টার দেখে জানলাম, টিম ম্যাকফারলন সল্ট লেক সিটি থেকে এসেছে।'

'তুমি বললে, কিন্তু আমি শুনতে পাইনি! ফর গডস সেক, এতো পানির মতো সোজা! কেন, রেজিস্টারে আমরা কি লিখিয়েছি? নিউ ইয়র্কের মিঃ আর মিসেস গর্ডন, তাই না? সে হয়তো সত্যি সত্যি সল্ট লেক সিটির টিম ম্যাকফারলন, কিন্তু বিশ্বাস করতে আমি

বাধ্য নই—আমার পোষাবে না। আমি জানি, সে কে. জি. বি. রেসিডেন্টের প্রতিনিধি নয়?'

ফিনিক্স এয়ারপোর্টের ফোন বুদে রয়েছে ডালচিমস্কি, রেড ড্রাগনের মালিক আলবার্ট হুবার্টের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে—এবার নিয়ে সাতবার। সরাসরি ডায়াল করে যখন কোনো লাভ হলো না, আয়রন রিভার অপারেটরের সাহায্য চাইলো সে।

'দুঃখিত, স্যার,' শব্দজটের ভেতর থেকে মিষ্টি গলায় বললো মেয়েটা। 'মনে হচ্ছে লাইনে কোনো গোলমাল আছে। আমাদের ইমার্জেন্সী সার্ভিসে রিপোর্ট করেছি, কাল ওরা চেক করে দেখবে বলেছে।'

'কাল?' তিরস্কারের সুরে জিজ্ঞেস করলো ডালচিমস্কি।

'দুঃখিত, স্যার। আমাদের রিপেয়ার ক্রুরা এই মুহূর্তে সাংঘাতিক ব্যস্ত। ডিউটিতে এসেছেই কম লোক, তার ওপর পুলিশ হেডকোয়ার্টারের লাইনে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয়ায় ওদিকে কাজ করতে হচ্ছে…।'

'আচ্ছা!'

'আপনার কলটা যদি খুব জরুরী হয়, স্যার…।'

উত্তর না দিয়ে যোগাযোগ কেটে দিলো ডালচিমস্কি, কারণ স্পীকারে তার ফ্লাইটের কথা ঘোষণা করা হচ্ছে। প্লেনে চড়ার সময় ভাবলো সে, আয়রন রিভার পুলিশ হেডকোয়ার্টারের ফোন লাইনে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেবে কেন? তার জানার কথা নয়, দুটো অকেজো ইনসুলেটর এর জন্যে দায়ী।

রানার বীমা।

হিসেবে কোনো ভুল করেনি রানা। জানতো, পুলিশ লাইন আগে মেরামত করা হবে।

ঠাণ্ডা মাথায় অপেক্ষা করার ধৈর্য ডালচিমস্কির নেই। লোকটা এজেন্ট নয়, স্রেফ একটা উন্মাদ। ধ্বংস করার প্রচণ্ড নেশায় অস্থির হয়ে আছে, কোথায় ভুল করে বসছে সেদিকে খেয়াল তার না থাকারই কথা। এই অস্থিরতাই তাকে ধ্বংস করবে। মোটেল কামরায় সারাটা দিন বসে থাকলো রানা, পর্দার ফাঁক দিয়ে রেস্তোরাঁর দিকে তাক করে রাখলো বায়নোকিউলারটা সারাক্ষণ হাঁটুর ওপর রয়েছে রাইফেল, কাজটায় এতো বেশি মনোযোগ যে রেডিওর মিউজিকও শুনতে পাচ্ছে না। এদিকে লোকজনের আসা-যাওয়া খুব বেশি নয়, ছোট্ট একটা স্টেশন থাকায় কাজ চলে যায়।

বেলা একটার দিকে শহরের এক হোটেল থেকে দুটো স্যাণ্ডউইচ নিয়ে এলো লিলি। রবিনের ধৈর্য আর নিষ্ঠা দেখে অবাক হলো সে, কিন্তু কোনো মন্তব্য করলো না। একবার একটা চেয়ার টেনে ওর পাশে বসলো সে, 'তোমার কাজ তুমি করো, আমার কাজ আমি,' বলে রানার কাঁধে মাথা রাখলো, হাত দুটো জ্যাকেটের ভেতর ঢুকে গিয়ে নগ্ন বুকে কিলবিল করতে লাগলো। তারপর রানার কণ্ঠলগ্ন হয়ে ঝুলে পড়লো, চুমো খেলো গালে।

চারটের সময় আবার কফি পেলো রানা।

বসে বসেই আড়মোড়া ভাঙলো ও। পা দুটো লম্বা করলো, মাথার ওপর তুলে টান টান করলো হাত দুটো। 'আমার খিদে পেয়েছে।'

'তাহলে আবার আমাকে শহরে যেতে হয়।'

'সে খিদে নয়। অন্য রকম খিদে।'

'খাবারটা তোমার খোরাক হবার জন্যে সব সময় ঘুর ঘুর করছে আশপাশে, কিন্তু তুমি কাজের সময় খেতে-টেতে চাইবে না ভেবে···।'

'বিছানাটা জানালার ধারে টেনে আনা যায় না?'

'ধ্যেৎ!'

রাত আটটার মধ্যেও যখন টেলিফোন কোম্পানীর ট্রাক এলো না, রানা ধারণা করলো তাহলে কাল সকালের আগে ওদের আর আসার সম্ভাবনা নেই। হাঁটু থেকে রাইফেলটা নামালো ও। তার-মানে রাতের জন্যে অসতর্ক থাকবে তা নয়। শিকাগোর একটা স্পোর্টস স্টোর থেকে ফ্লেয়ার গান আর রকেট কিনেছিল ও, পায়ের কাছ থেকে মাত্র এক গজ দূরে রয়েছে ওগুলো। না, ডালচিমস্কি রাতে আসবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু আজ রাতে সে আসবে না।

'কাল রাতে,' রেড ড্রাগন থেকে ডিনার খেয়ে বেরুবার সময় লিলিকে বললো রানা।

মুহূর্তের জন্যে হলেও রবিনের ওপর লিলির বিশ্বাসে সামান্য একটু চিড় ধরলো। ঠিক বুঝতে পারলো না ডালচিমস্কির জন্যে এভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করাটা বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে কিনা। তারপর ভাবলো, ডালচিমস্কির মতো একটা পাষণ্ডকে একা একজন লোক সামলাতে পারবে তো এমনকি রবিনের মতো দারুণ একজন এজেন্টেরও ভুল হতে পারে, তারও দুর্বলতা আছে। স্রেফ দুর্ভাগ্যের কারণেও ব্যর্থ হতে পারে রবিন। তার কি বাইরের সাহায্য চাওয়া উচিত? ডাকলেই চলে আসবে লোকজন। তারাও

যোগ্য প্রফেশনাল, চমৎকার সব অস্ত্র নিয়ে আসবে সাথে করে।

'কাল রাতে আসবে সে,' গাড়িতে উঠে কথাটা আবার বললো রানা।

'কিভাবে নিশ্চিত হচ্ছো?'

'যুক্তির বিচারে।'

'এবং তুমি ঠিক জানো, একা তুমি তাকে সামলাতে পারবে?'

'কাজটাই একার, লিলি। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে চেয়ো না।' হঠাৎ করে কঠোর হয়ে উঠেছে রানার চেহারা।

'আমি শুধু জিজ্ঞেস করছি। যাই বলো, একা একজন মানুষ··· ।'

'একা নই, আমরা দু'জন,' বললো রানা। 'প্ল্যানটায় তোমারও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তোমার ওপর আমি নির্ভর করছি।'

'তুমি যা বলো। তারমানে প্ল্যান একটা তৈরি করেছো তুমি?'

মোটেলের সামনে গাড়ি থামালো রানা। 'দু'একটা বিষয় এখনো আমাকে অস্বস্তির মধ্যে রেখেছে। সল্ট লেক সিটি থেকে আসা লোকটা সম্পর্কে আরো কিছু জানতে পারলে ভালো হতো। যদি জানতে পারতাম ট্রাইপড-টা কোথায় আছে তাহলে ভালো ঘুম হতো রাতে।'

'ট্রাইপড? কিসের ট্রাইপড? ম্যাকফারলনের কাছে কোনো ট্রাইপড আছে বলে তো শুনিনি।'

কাঁধ ঝাঁকালো রানা, বন্ধ করলো এঞ্জিন। 'ম্যাকফারলনের কাছে নয়, হুবার্টের কাছে। ওটা যদি অন্য কোনো লোক পেয়ে যায়, মহা সর্বনাশ ঘটে যেতে পারে।'

'কি বলছো! তোমার কথা কিছুই আমি বুঝতে পারছি না!'

'আমাদের ট্রাইপড, বুঝতে পারছো না ?' রাশিয়ানদের, মস্কোর। এখানে যদি সেটা দেখা যায়, কি তুলকালাম কাণ্ড বেধে যাবে কল্পনা করতে পারো ?'

'তুমি বোধহয় রুশ ক্যামেরার কথা বলছো, তাই না ? দুঃখিত, রবিন, ক্যামেরা সম্পর্কে বেশি কিছু জানি না আমি।'

অবাক হয়ে চোখ পিট পিট করলো রানা।

লিলি জানে না।

তারমানে ওর কথা কিছুই বুঝতে পারেনি লিলি। সেজন্যে অস্বস্তি বোধ করছে মেয়েটা। জানার অবশ্য কথাও নয়। হুবার্টের কাছে যে মডেলটা আছে সেটা অনেক দিন আগের।

কোথায় ?

আয়রন রিভার ছেড়ে যাবার আগেই ওটা তাদেরকে পেতে হবে, কাজেই ওটার কথা লিলিকে বলতে হবে রানার। আজ নয়, কাল। কাল ডিনারের পর ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করবে ও।

ডালচিমস্কিও, ধারণা করা যায়, কাল ডিনারের পর আসবে এখানে। ডিনারের পর যে-কোনো সময়। দিনের বেলা আসবে না, তাতে চেহারা দেখাবার ঝুঁকি নিতে হবে। তাছাড়া, চিন্তা করলে সে বুঝবে যে মাঝরাত থেকে সকালের মধ্যে ড্যামটা উড়িয়ে দেয়া অনেক বেশি সহজ হবে হুবার্টের জন্যে। তবে, এ-কথা জোর করে বলা যায় না যে ইতিমধ্যে উপত্যকায় পৌঁছায়নি ডালচিমস্কি। হয়তো কাছেপিঠে কোথাও গা ঢাকা দিয়ে আছে। টিম ম্যাকফারলন যে হোটেলে উঠেছে সেখানেই হয়তো উঠেছে সে।

কামরায় ঢুকে রানা বললো, 'আজ রাতে পালা করে জাগবো আমরা। চার ঘণ্টা করে, ঠিক আছে ?'

'জাগবো ?'

'রেড ড্রাগনের ওপর নজর রাখবো। আর একটু পরই বন্ধ করে দেবে ওরা। আজ রাতে যদি আসে ডালচিমস্কি, বেশি রাতে আসবে। প্রথমে আমার পালা।'

আজ রাতে পরস্পরকে নিয়ে সুখী হওয়ার সময় বা উৎসাহ কোনোটাই ওদের নেই। লিলি ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ছে, সেটা চোখে দেখে উপভোগ করা থেকেও নিজেকে বঞ্চিত করলো রানা। ওর সমস্ত মনোযোগ রেড ড্রাগন আর হাইওয়ের ওপর। মনোযোগ এক আধবার ছুটলো শুধু যখন ট্রাইপডের কথা মনে পড়ে গেল। রাত চারটের সময় লিলিকে জাগিয়ে দেয়ার সময়ও ওটার কথাই ভাবছিল ও।

তবে ওর স্বপ্নের মধ্যে ট্রাইপড থাকলো না।

দুঃস্বপ্ন একটা দেখলো বটে রানা, টেলিফোন কোম্পানীর একটা ট্রাককে নিয়ে। উপত্যকার দুর কিনারাকে সূর্যের প্রথম আলো তখন রাঙা করে তুলছে, লিলি দেখলো বিছানার ওপর ছটফট করছে রবিন।

বেলা দশটা পর্যন্ত রবিনকে ঘুমাতে দিলো লিলি। এতোক্ষণ সে-ও একটানা হাইওয়ে আর রেড ড্রাগনের দিকে তাকিয়ে থাকলো, ভাবলো সত্যিই কি আসবে ডালচিমস্কি ? নাম সই করাটাকে সে কি অতোটাই গুরুত্ব দিচ্ছে ? ফোনের লাইন পাওয়া যাচ্ছে না, বিরক্ত হয়ে সে যদি ভাবে, থাক, দরকার নেই, বরং অন্য যে-কোনো একটা টেলি-বম ফাটানো যাক ?

কিন্তু না, ফ্যানাটিকরা এভাবে চিন্তা করে না। ডালচিমস্কি মানসিকভাবে অসুস্থ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। একটা মাত্র অক্ষর

বাকি আছে, 'আই'। খাতায় এই একটাই আই আছে। সইটা পুরো করতে হলে হিউম্যান বোমা আলবার্ট হুবার্টকে কোড মেসেজ-টা তার দিতেই হবে।

কিন্তু ফ্যানাটিক হোক বা উন্মাদ, ধরে নিতে হবে তারও ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে। ফাঁদটা যদি টের পেয়ে যায় ডালচিমস্কি? তার মন যদি তাকে সতর্ক করে দেয়? সেক্ষেত্রে ফোন মেরামত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে সে।

কোড মেসেজটা পেলে আলবার্ট হুবার্ট আর মানুষ থাকবে না। ড্যানবার ড্যাম উড়িয়ে দেবে সে। তা যদি দিতে পারে, কয়েক হাজার লোক ডুবে মারা যাবে।

তারাও।

বারো

পরদিন দুপুরেও যখন টেলিফোন কোম্পানীর ট্রাক এলো না, বিকল্প উপায়গুলো নিয়ে আরেকবার চিন্তা ভাবনা করলো রানা। খুবই সম্ভাবনা রয়েছে সূর্য ডোবার আগে কোনো এক সময় হাইওয়ে ধরে পৌঁছে যাবে রিপেয়ার ক্রুরা, আর তখন হুবার্ট যাতে ফোন

কলটা না পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে রানাকে।

শহরে গিয়ে মেইন সুইচবোর্ড বিকল করতে পারে ও। নিজে না গিয়ে কাজটা লিলিকে দিয়েও করানো যায়, ছোটো একটা বোমা ফিট করে দিয়ে আসবে সে।

হাইওয়ে ধরে খানিকটা এগিয়ে কোনো ঝোপ বা পাথরের আড়ালে ওত পেতে থাকতে পারে রানা, সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল দিয়ে ফাটিয়ে দিতে পারে ট্রাকের চাকা। চাকা ফেটে গেলে ট্রাকের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলবে ড্রাইভার, কিনারা থেকে খাদে খসে পড়বে ট্রাক। নিরীহ মানুষ মারা পড়বে।

এতো কিছুর মধ্যে না গিয়ে আরো সহজ উপায় বেছে নিতে পারে রানা। হুবার্টকে খুন করা কোনো সমস্যা নয়। ওর জায়গায় একজন সি. আই. এ. বা কে. জি. বি. এজেন্ট হলে এই সহজ সমাধানটাই হয়তো পছন্দ করতো। আর কোনো উপায় না দেখলে, শেষ পর্যন্ত হয়তো রানাকেও তাই করতে হবে। তবে সেক্ষেত্রে খুন না করে লোকটাকে আহত করার চেষ্টা করবে রানা।

তবে বড় কোনো ঝুঁকি নেবে না ও। নেয়া উচিত হবে না। কয়েক শো কোটি মানুষের জীবন-মরণের প্রশ্ন এটা। এটাই শেষ সুযোগ রানার, এখান থেকে পালাতে পারলে নির্ঘাৎ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়ে দেবে ডালচিমস্কি।

কয়েক সেকেণ্ড পর বিড়বিড় করে বললো রানা, 'না, আমি করবো না।'

'কি করবে না তুমি, রবিন?'

'তুমি করবে। যদি কাজ হয়, কেউ আহত হবে না।'

কাজ হলো, এবং কেউ আহত হলো না। গাড়ি চালিয়ে আয়রন

রিভারে গেল লিলি, একটা ফোন বুদে ঢুকে ডায়াল করলো ফোন কোম্পানীর রিপেয়ার সার্ভিস অফিসে। ওদেরকে বললো, রেড ড্রাগনে ক্রু পাঠানোর দরকার নেই, ফোন লাইন আবার চালু হয়ে গেছে। ডিউটি অফিসার লিলিকে ধন্যবাদ জানালো, কথা দিলো রিপেয়ার ট্রাককে রেডিওর মাধ্যমে এখুনি সে ব্যাপারটা জানিয়ে দিচ্ছে। সার্ভিস ট্রাকটা ইতিমধ্যে রেড ড্রাগনের কাছাকাছি, এক মাইলের মধ্যে পৌঁছে গেছে, এই সময় মেসেজটা পেলো ড্রাইভার। রানার রাইফেল রেঞ্জের মধ্যে আসতে আর বিশ সেকেণ্ড বাকি ছিলো, ট্রাক ঘুরিয়ে নিলো সে। হান্টিং রাইফেলের স্কোপে চোখ রেখে ট্রাকটাকে ঘুরাতে দেখে পরম স্বস্তি বোধ করলো রানা। দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল সেটা।

একটা ঝামেলা এড়ানো গেছে, কিন্তু আসল কাজ থেকে ছুটি নেই রানার। রাস্তার প্রতিটি গাড়িকে খুঁটিয়ে দেখলো ও। বিশেষ করে একটা জীপের অপেক্ষায় আছে ও। চালিয়ে আসবে যে লোক-টা নিজেকে টিম ম্যাকফারলন বলে দাবি করছে। তিনটে পঞ্চাশ মিনিটে সত্যি একটা জীপকে আসতে দেখা গেল, ক্যানভাস দিয়ে ঢাকা। ঘণ্টায় পঁয়তাল্লিশ মাইল বেগে আসছে, আগাগোড়া একই গতিতে। ড্রাইভিং সিটে বসা লোকটাকে ভালো করে দেখতে পেলো না রানা, তবে বুঝতে পারলো ডালচিন্স্কি নয়। রেড ড্রাগনের সামনে জীপ থামলো না, এমনকি গতি একটু কমলো না পর্যন্ত।

তাতে অবশ্য কিছু প্রমাণ হয় না।

পরিস্থিতি বোঝার জন্যে এসে ট্রেনিং পাওয়া কোনো এজেন্ট টার্গেটের প্রতি আগ্রহ দেখাবে না। টিম ম্যাকফারলন যদি এফ. বি. আই. বা কে. জি. বি. রেসিডেন্টের এজেন্ট হয়, নিশ্চয়ই খুব ভালো

ট্রেনিং পেয়েছে সে। তাতে অবশ্য কিছু এসে যায় না, অভিজ্ঞ প্রফেশনালদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার প্রচুর অভিজ্ঞতা রয়েছে ওর, প্রফেশনালদের ধরন-ধারণ বা কৌশল কি রকম হয় জানা আছে। ডালচিমস্কির মতো উন্মাদ অ্যামেচারদের নিয়েই বিপদ, ওরা কখন যে কি করে বসবে আগে থেকে বলা অসম্ভব। নিজের ওপর বিশ্বাস আছে রানার, সঙ্গিনী বেঈমানী না করলে প্রফেশনালদের সামলাতে পারবে ও।

আজ রাতেই অবশ্য সব জানা যাবে।

ডালচিমস্কি তো আসবেই, এবং টিম ম্যাকফারলনের সাথে অন্যান্যরাও সম্ভবত আসবে। ম্যাকফারলন যদি নাক গলায়, তাকেও ডালচিমস্কির ভাগ্য বরণ করতে হবে। দু'জনকে একই দাওয়াই দেবে রানা। এই একঘেয়ে, ক্লান্তিকর মিশনের সমাপ্তি টানতে চায় ও। কেউ বাধা হয়ে দাঁড়ালে তার প্রতি কোনো দয়া নয়। আরেকটা সমস্যা হুবার্ট। তার ব্যাপারটা বিশেষ বিবেচনার দাবি রাখে। বেচারা একটা ভিক্টিম, ঘটনাচক্রের অসহায় শিকার, তাকে বাঁচানোর জন্যে সাধ্যের অতীত চেষ্টা করবে রানা। তারপর লিলির কথা ভাবলো ও। এতো দেরি করছে কেন সে? কারো সাথে যোগাযোগ করছে নাকি? কাউকে ডাকছে?

লিলি ফিরে আসায় রানার চিন্তায় বাধা পড়লো। তাকে ট্রাক আর জীপের কথা শোনালো রানা, সময় মতো টেলিফোন কোম্পানীকে খবর দেয়ায় প্রশংসা করলো। রাতের প্ল্যান নিয়ে দু'বার আলোচনা করলো ওরা, তারপর অস্ত্র আর অন্যান্য ইকুইপমেন্ট সতর্কতার সাথে আবার একবার পরীক্ষা করলো রানা। সম্পূর্ণ তৈরি থাকতে চাইছে ও। সামান্য, ছোট্ট একটা ভুল করলেও প্রাণের

বিনিময়ে তার খেসারত দিতে হতে পারে। আজ রাতে সফল হওয়ার ওপর নির্ভর করছে আরো অনেক মানুষের জীবন-মৃত্যু।

তৈরি হচ্ছে রানা, একটা চোখ রেড ড্রাগনের দিকে। চারটে পনেরো মিনিটে হুবার্টকে যেতে দেখলো ও। সবুজ একটা মরিস চালাচ্ছে, নতুন না হলেও তাগড়া ঘোড়ার মতো তেজী বলে মনে হলো। পাঁচটা দশ মিনিটে আবার ফিরে এলো সে, গাড়ি থেকে নামলো দু'হাত ভরা প্যাকেট আর ব্যাগ নিয়ে। কেনাকাটা করতে বেরিয়েছিল।

সাতটা চল্লিশ মিনিটে লিলিকে তার গাড়িতে করে শহরটা এক-বার চক্কর দিয়ে আসতে পাঠালো রানা। অন্য গাড়িটা নিয়ে রেস্তোরাঁয় চলে এলো নিজে।

'আজ রাতে একা বুঝি?' কটাক্ষ হেনে জিজ্ঞেস করলো লিল, টেবিলে হুইস্কির গ্লাস রাখলো সে।

'একটু পর আসবে ও।'

চারদিকে চোখ বুলিয়ে তিন চারটে দম্পতি, এয়ার ফোর্স অফিসারদের দুটো দল, আর তিনজন নিঃসঙ্গ পুরুষকে দেখলো রানা। পাশের জানালা দিয়ে মাঝে মধ্যে বাইরে তাকালো ও। কিছু লোক বেরিয়ে গেল, নতুন কেউ কেউ ঢুকলো। হঠাৎ করেই জীপটা দেখতে পেলো রানা। একটা গাছের আড়ালে, গাঢ় ছায়ার মধ্যে রয়েছে বলে এতোক্ষণ দেখতে পায়নি। সেই আগের জীপ-টাই। রেস্তোরাঁর চারদিকে দ্রুত দৃষ্টি বুলালো রানা। এদের মধ্যে কেউ একজন টিম ম্যাকফারলন। কে হতে পারে?

টিম ম্যাকফারলন ওরফে রুশ মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট রাউল ক্ল্যারমন্ট যাকে খুন করতে চায় তার দিকে পিছন ফিরে বসে

আছে। একমনে মুরগীর রান চিবাচ্ছে সে, ভুলেও রানার দিকে তাকাচ্ছে না। চিত্তে কোনো উদ্বেগ নেই তার, সে-ও আজ রাতের প্ল্যান ঠিক করে রেখেছে। রানাকে সে দশ মিনিট আগেই লক্ষ্য করেছে, কিন্তু কোনো রকম অস্থিরতা বোধ করেনি। তার নার্ভ ইস্পাতের মতো শক্ত, সেজন্যেই তো তিন তিনটে কমাণ্ডো গ্রুপ ব্যর্থ হবার পর মাসুদ রানাকে নিশ্চিহ্ন করার দায়িত্ব এতো থাকতে তাকেই দেয়া হয়েছে। আনন্দের সাথে ডিনার খাচ্ছে সে। জানে, তাকে চিনতে পারার কোনো উপায় নেই মাসুদ রানার।

আটটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি থাকতে ফিরে এলো লিলি। রানাকে হাসতে দেখে খুশি হলো সে। হাসিটুকুর মানে সব কিছু ঠিকঠাক মতো ঘটছে।

রানার মুখোমুখি বসলো লিলি। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে নিচু গলায় বললো, 'শুধু আমার দিকে তাকিয়ে থাকো। আমাদের সাথে বসে আছে সে।'

ছোট্ট প্রশ্ন করলো লিলি, 'কে ?'

'জীপের ড্রাইভার। বাইরে দেখোনি ওটা ?'

গ্লাসে চুমুক দিলো রানা। সিগারেট ধরিয়ে বাতাসে রিঙ তৈরি করলো, যেন মোটেও উত্তেজিত নয়।

'অনেক লোকই জীপ চালায়, রবিন।'

হেসে উঠলো রানা, লিলি যেন দারুণ একটা রসিকতা করেছে। খানিক পর বললো, 'এ সে-ই। আমি তার গন্ধ পাচ্ছি। তাকিয়ো না—দেখতেও পাচ্ছি

লিলি তাকালো না। এক মুহূর্ত পর জানালার কাঁচে তার প্রতি-বিম্ব দেখলো সে। কি করে জানছো এ সে-ই লোকই ?'

'বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করে। এতো মনোযোগ দিয়ে কেউ ডিনার খায়? নাহয় খাচ্ছে, কিন্তু তাই বলে ভুলেও একবার মুখ তুলে বা ঘাড় ফিরিয়ে তাকাবে না? আগে কখনো দেখেছো কিনা বলো।'

মাথা নাড়লো লিলি।

'সম্ভবত তোমার বসের শিষ্য,' মেনু তুলে নিয়ে বললো রানা। 'মনে করে দেখো, কোথাও দেখোনি আগে?'

'দেখিনি।'

চোখের দিকে তাকিয়ে রানা ঠিক বুঝতে পারলো না লিলি মিথ্যে কথা বলছে কিনা।

'আমরা এখন কি করবো, রবিন?'

'আমরা' বললেও, ডিনারের পর রানা যা করতে চায় তাতে লিলির কোনো অবদান রাখার সুযোগ বোধহয় থাকবে না। 'রাজকীয় ডিনারের অর্ডার দেবো,' বললো রানা। 'হাতে সময়ের কোনো অভাব নেই আমাদের।'

খদ্দেররা আসা-যাওয়া করছে, অস্বাভাবিক কিছুই রানার চোখে পড়লো না। ওদের মেইন কোর্স শেষ হয়ে এসেছে, ইতিমধ্যে বাইরে আরো গাঢ় হয়েছে অন্ধকার। আবার চোখ তুলে তাকালো রানা, ক'মিনিট পরপরই একবার করে দেখছে—যেন ওয়েট্রেসকে খুঁজছে। লোকটা নেই।

'পালিয়েছে,' ফিসফিস করে বললো রানা।

'কোথায় যেতে পারে?'

'কিছু এসে যায় না। ফিরে আসবে।'

ঠিক দশটার পর বিল মিটিয়ে দিয়ে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এলো ওরা। রাতটা বেশ গরম। একটু টলমল করছে রানা, যারা

ওকে হুইস্কি খেতে দেখেছে তারা কেউ অবাক হবে না।

'আজ কিন্তু তুমি গাড়ি চালাতে চেয়ো না, ডিয়ার,' বললো লিলি।

'ধ্যেৎ, আমার কি নেশা হয়েছে!'

'আমি কি তাই বললাম! তবে জানি, সব কিছু তুমি ডুটো করে দেখছো—আমাকেও!' হাসি চাপার চেষ্টা করলো লিলি।

'একটাই সামলাতে পারি না...।'

মিনিট দুয়েক স্বামী-স্ত্রী সুলভ টক-ঝাল মেশানো ঝগড়া করার পর হার মেনে লিলির গাড়িতে উঠে বসলো রানা। গাড়িটা ব্যাক করলো, রেস্তোরাঁয় জানালার ধারে যারা বসে রয়েছে তাদের চোখের আড়ালে চলে এলো। তারপর নাক ঘুরিয়ে ছোট্ট গাড়ি-পথ ধরে বেরিয়ে গেলো রাস্তায়। মোটেলের দিকে যাচ্ছে গাড়িটা।

পরবর্তী দেড় ঘণ্টা নতুন কোনো লোক রেড ড্রাগনে ঢুকলো না, এক এক করে সবাই বেরিয়ে এলো। সবশেষে বেরুলো তিনজনের একটা দল, মিসাইল ক্রু। প্রত্যেকেই ওরা প্রচুর হুইস্কি খেয়েছে, হাঁটতে গিয়ে পরস্পরের গায়ে ঢলে পড়লো বারবার। তাদের মধ্যে একজন বারবার হাত নেড়ে বিদায় জানালো লিলকে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে হাসতে লাগলো লিল। মাঝরাতের সামান্য একটু পর ওয়েট্রেস আর রেস্তোরাঁর অন্যান্য কর্মচারীরা বিদায় নিয়ে চলে গেল। আরো কয়েক মিনিট পর অন্ধকার হয়ে গেল ডাইনিং রুম। দোতলার অ্যাপার্টমেন্টে আলো জ্বলে উঠলো।

রাস্তায় কোনো যানবাহন নেই বললেই চলে। পরবর্তী একশো মিনিট মাঝে-মধ্যে দু'একটা গাড়ি হাইওয়ে ধরে ছুটে গেল, একটাও মোটেল বা রেড ড্রাগনের সামনে থামলো না। গাড়িগুলোর স্পীড

দেখেই বোঝা যায়, হয় কোনো সতেজপ্রাণ যুবক চালাচ্ছে নয়তো ড্রাইভিং সিটে বসে আছে কোনো মাতাল। একটা পঞ্চাশ মিনিটে এ-ধরনের আরো একটা গাড়ি গেল, তবে এটার স্পীড আগেরগুলোর চেয়ে অনেক কম। এটাও থামলো না। তবে ক'মিনিট পর আবার ফিরে এলো। রানা যেখানে নিজের গাড়িটা রেখেছে সেখান থেকে দশ গজ দূরে পার্ক করলো ড্রাইভার।

ড্রাইভার একজন পুরুষ। তার পা দেখতে পেলো রানা। ঘণ্টা কয়েক আগে লিলির গাড়ি থেকে গড়িয়ে নেমে এসেছিল ও, গড়াতে গড়াতে নিজের গাড়ির তলায় ঢুকে শুয়ে আছে। হাতে পিস্তল নিয়ে মশা আর পিঁপড়ের কামড় খাচ্ছে সেই থেকে। ঘামে জবজবে হয়ে গেছে কাপড়চোপড়।

এ লোক ডালচিমস্কি না হয়ে যায় না।

দরজায় ধাক্কা মারার আওয়াজ শুনলো রানা। ভালো করে দেখতে পাবার আশায় এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে এগোলো ও। ক্ষীণ একটু সম্ভাবনা আছে লোকটা হুবার্টের কোনো বন্ধুও হতে পারে, কিংবা হয়তো কোনো ক্ষুধার্ত খদ্দের, অথবা তৃষ্ণার্ত মাতাল, যার কোনো সময়জ্ঞান নেই। কিন্তু দেখে মনে হলো লোকটা বেশ টান টান হয়েই দাঁড়িয়ে আছে, দরজায় ধাক্কা দেয়ার ভঙ্গির মধ্যেও কোনো রকম অস্থিরতা প্রকাশ পেলো না। মাতাল নয়, আত্মবিশ্বাসী একজন লোক।

দোতলার জানালা গলে চৌকো একটা আলো পড়লো নিচে। কারো ঘুম ভেঙে গেছে, সম্ভবত সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে সে। আগের চেয়ে দ্রুত হলো রানার নিঃশ্বাস। পিস্তলের সেফটিক্যাচ রিলিজ করলো ও। উত্তেজনায় টান টান হয়ে আছে পেশী। এখন

থেকে যে-কোনো মুহূর্তে উন্মোচিত হবে সত্য। ক্লান্তিকর অ্যাসাইনমেন্টটা ব্যর্থ হতে যাচ্ছিলো, এখন আবার আশার আলো জ্বলি জ্বলি করছে। ডালচিমস্কিকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে এক পয়সা দাম দেয় না রানা। যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর যোগ্য সম্মান দিতে জানে ও, কিন্তু ডালচিমস্কি স্রেফ হৃদয়হীন, নীচ একটা পশু। তার জন্যে রানার মনে কোনো দয়া নেই। এমনকি তাকে করুণাও করা চলে না।

পাঁচ গজ দূরে দরজা খোলার আওয়াজ হলো।

'রাত দুপুরে কিসের এতো ঝামেলা, শুনি?' ঝাঁঝের সাথে জিজ্ঞেস করলো হুবার্ট। 'মাথায় বাজ পড়েছে, নাকি সাপের পেট থেকে বেরুলেন? রেস্তোরাঁ তো কয়েক ঘণ্টা আগেই বন্ধ হয়ে গেছে, মিঃ জ্যাক।'

'আমার নাম জ্যাক নয়,' নিচু গলায়, ফিসফিস করে বললো লোকটা। কথার সুরে বিদেশী টান।

'কাল দুপুরে আসুন, প্লিজ।'

'আপনার জন্যে একটা মেসেজ আছে।'

বুঝতে আর কিছু বাকি থাকলো না রানার। গড়িয়ে গাড়ির বাইরে বেরিয়ে এলো ও। হাতের পিস্তল তুলে সাবধানে লক্ষ্যস্থির করলো। 'ডালচিমস্কি!' গর্জে উঠলো ও।

লোকটা এক কি দু'সেকেণ্ডের জন্যে ইতস্তত করলো, তারপর ঘাড় ফেরাতে শুরু করে হাত বাড়ালো পকেটের দিকে। তিনবার গুলি করলো রানা, সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল থেকে মৃদু খক খক কাশির আওয়াজ বেরিয়ে এলো। দুটো বুলেট ডালচিমস্কির চওড়া বুকে লাগলো। তৃতীয়টা কপালের নিচের দিকে, দুই চোখের মাঝখানটা ফুটো করলো। তৃতীয় নয়নের মতো লাগলো ওটাকে

রানার। ডালচিমস্কির সমস্ত উন্মাদনা আর উন্মত্ততা, নীচতা আর হিংস্রতা, বিকৃতি আর নিষ্ঠুরতা গলগল করে বেরিয়ে এলো ওই ফুটো দিয়ে। দড়াম করে আছাড় খেলো সে। স্যাঁৎ করে সামনে বাড়লো রানা। খাতাটা পেতে হবে ওকে।

অকস্মাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো রানা, হুবার্টের চোখ দেখে শিউরে উঠলো। এক পলকে বুঝে নিলো ও, কোড সংকেতটা হুবার্টকে শুনিয়ে দিয়েছে ডালচিমস্কি।

'লেফটেন্যান্ট ইগর পদোভিচ,' দ্রুত বললো রানা, 'আমি মস্কো থেকে আসছি, কে. জি. বি.-র একজন এজেন্ট। কর্নেল বিকারেন আর মেজর জেনারেল কায়কোভস্কি পাঠিয়েছেন আমাকে। আপনার মিশন বাতিল করা হয়েছে।' মাটিতে পড়ে থাকা লাশটার দিকে তাকালো ও। 'এই লোকটা সোভিয়েত ইউনিয়নের শত্রু ছিলো। টেলি-বম বাতিল করা হয়েছে।'

খানিক আগে যে লোকটা আলবার্ট হুবার্ট ছিলো, চোখে রাজ্যের সন্দেহ আর অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে থাকলো সে রানার দিকে। কথাগুলো আবার বললো রানা, রুশ ভাষায়। ব্যাখ্যা করলো, রেড আর্মির চীফ অভ স্টাফের নির্দেশে নিকোলাই ডালচিমস্কিকে ধ্বংস করতে এসেছে ও। নিকোলাই ডালচিমস্কি একজন বেঈমান, পলিটব্যুরোর সদস্য থেকে শুরু করে প্রিমিয়ার, জেনারেল সেক্রেটারী, সেনাবাহিনী প্রধান, সবাইকে খুন করার ষড়যন্ত্র করেছিল সে।

'আই সী,' অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর মৃদু কণ্ঠে ইংরেজীতে বললো হুবার্ট।

'গুড। এবার আমি খাতাটা খুঁজবো।'

লাশের কাপড়চোপড়ে হাত চাপড়ে সার্চ করলো রানা। চ্যাপ্টা, শক্ত, আর চারকোণা কি যেন একটা রয়েছে জ্যাকেটের পকেটে। হাত গলিয়ে দিয়ে জিনিসটা বের করে আনলো ও। বিজয়ীর হাসি ফুটলো মুখে। হাসিটা মাঝপথে থেমে গেল, নিখুঁত একটা কারাতে চপ মেরে মাসুদ রানাকে অজ্ঞান করে ফেললো লেফটেন্যান্ট পদোভিচ। যে লোকটা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধাতে চেয়েছিল তার লাশের ওপর পড়লো রানা। গাড়ির এঞ্জিন গর্জে উঠলো, তখনো রানা পুরোপুরি জ্ঞান ফিরে পায়নি। তারপর যখন এক হাঁটুতে ভর দিয়ে উঁচু হবার চেষ্টা করছে, দেখলো সবুজ মরিসটা হাইওয়েতে উঠে গেছে, ঝড়ের বেগে ছুটে চলেছে উত্তর দিকে।

ড্যামটা উত্তর দিকে, ট্রাইপড নিয়ে সেদিকেই যাচ্ছে হুবার্ট। খাতাটা রানার কাছে, কিন্তু ট্রাইপডটা সময় থাকতে কেড়ে নিতে না পারলে হু'হাজার লোকের সাথে লিলিকেও বাঁচানো যাবে না, নিজেও মারা পড়বে। হুবার্ট সাধারণ কোনো এজেন্ট নয়, ডীপ-প্রোগ্রামড টেলি-বম এজেন্ট। সে এখন আর হুবার্ট নয়। নামটা 'ট্রাইপড'-এর মতোই সেকেলে হয়ে গেছে। আজ আর রেড আর্মির কেউ মিনিয়েচার অ্যাটমিক উইপনকে ট্রাইপড বলে না। এই মডেলের আণবিক বোমা আর তৈরিই করা হয় না, কারণ আজকাল আরো অনেক উন্নত বোমা তৈরি হচ্ছে। তবু সেকেলে এই ট্রাইপ-ডের রয়েছে পাঁচ হাজার টন হাই এক্সপ্লোসিভের সমান বিস্ফোরণ-ক্ষমতা—ড্যানবার ড্যামটাকে গুঁড়িয়ে পাউডার করে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো রানা। ভয় পেয়ে গেছে ও। হুবার্টকে যেভাবে হোক থামাতে হবে। গাড়িতে বসে যখন স্টার্ট দিলো রানা, হাইওয়ের শেষ মাথাতেও সবুজ মরিসটা নেই।

তেরো

কোথায় যাচ্ছে জানা আছে রানার। রেড ড্রাগন থেকে ড্যামের দিকে অনেকগুলো রাস্তা চলে গেছে, দু'দিন আগে সবগুলো পরীক্ষা করেছে ও, বেছে বের করেছে সবচেয়ে সোজা রাস্তাটা। অন্তর্ঘাতকও সম্ভবত এই রাস্তাটাই ব্যবহার করবে, কারণ সম্ভাব্য অল্প সময়ের মধ্যে টার্গেট ধ্বংস করার তাগিদ থাকবে তার ভেতর। গ্যাস পেডালে আরো জোরে পা চেপে ধরে রানা ভাবলো, প্রশ্ন হচ্ছে মেয়েটাকে নিয়ে। কি করবে লিলি?

'জুলিয়েট টু রোমিও। জুলিয়েট টু রোমিও,' পাশের সিটে রাখা ওয়াকি-টকি থেকে যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর বেরিয়ে এলো।

সেটটা এক হাতে নিয়ে 'সেণ্ড' সুইচটা অন করলো রানা। 'গো অ্যাহেড। গো অ্যাহেড, জুলিয়েট।'

'দশ সেকেণ্ড আগে এদিক দিয়ে ছুটে গেল তার গাড়ি। উত্তর দিকে যাচ্ছে। উত্তর দিকে!'

লিলির ধারণা গাড়িটা ডালচিমস্কি চালাচ্ছে, ভাবলো রানা। তা ভাবুক, ক্ষতি নেই। ক্ষতি হয়ে যাবে এখন যদি ওর নির্দেশ অমান্য

করতে শুরু করে লিলি। যদি বেঈমানী করে বসে।

'প্রসিডিং নর্থ। প্রসিডিং নর্থ। ফলো মি ইমিডিয়েটলি।'

মোটেল, আর মোটেলের সামনে দাঁড়ানো লিলির গাড়িটাকে একটু পরেই পেরিয়ে এলো রানা। গাড়িতেই রয়েছে লিলি, ব্যাক আপ টিম হিসেবে। রানা ব্যর্থ হলে ম্যানিয়াকটাকে লিলির খুন করার কথা ছিলো। প্ল্যানটা সেভাবেই করা হয়। সমস্যা এখনো তাই আছে, শুধু ম্যানিয়াক বদল হয়েছে। হুবার্টকে এখন উন্মাদ বলে ধরে না নিয়ে উপায় নেই ওদের।

সমস্যা হবে সময় নিয়ে। চারটে সুইচ বন্ধ করতে হবে—সিকোয়েন্স যথাযথ হওয়া চাই—তবেই ট্রাইপডের টাইম মেকানিজম চালু হবে। মেয়াদী ডিটোনেটরের সাহায্যে ওঅরহেডটাকে তিন, সাত, বা এগারো মিনিট পর বিস্ফোরিত করা যেতে পারে, নির্ভর করছে এই বিশেষ ট্রাইপডটাকে কিভাবে তৈরি করা হয়েছে তার ওপর।

তবে তাৎক্ষণিক বিস্ফোরণের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না। রানার যতোদূর জানা আছে, এই মডেলের ট্রাইপডগুলোর কোনো কোনোটায় পাঁচটা করে সুইচ থাকে—পঞ্চম সুইচটা সুইসাইড মিশনের জন্যে। তা যদি হয়, শেষ রক্ষা করা সম্ভব হবে না। অনেক আগে রওনা হয়ে গেছে হুবার্ট, মরিসের স্পীডও খুব বেশি।

জীপ আরোহী টিম ম্যাকফারলন আরেকটা হুমকি। এখনো তাকে আশপাশে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু সময় মতো ঠিকই উদয় হবে সে, জানে রানা। তবে জীপ চালিয়ে আসবে বলে মনে হয় না। তার জায়গায় রানা হলে আরো বেশি গতি পাবার জন্যে এবং পরিচয় গোপন করার জন্যে জীপের বদলে অন্য গাড়ি ব্যবহার করতো। যে-কোনো প্রফেশনালই তাই করবে।

ঘন্টায় ষাট, পঁয়ষট্টি, সত্তর মাইল বেগে উত্তর দিকে ছুটছে রানা। ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিতে হয়, সামনে অনেক দুর পর্যন্ত উপত্যকা বরাবর রাস্তাটা তীর চিহ্নের মতো সরল কংক্রিট। চোখ কুঁচকে সামনের দিকে ঝুঁকে অন্ধকারে মরিসের টেইল লাইট দেখতে চেষ্টা করলো রানা। মনে হলো অনেক দুরে লাল একটা বিন্দু যেন দেখতে পেলো একবার। এই ছিলো, এই নেই। হাইওয়ে থেকে বাঁক নিয়ে আরেক রাস্তায় চলে এলো গাড়ি, এদিকে উপত্যকার মেঝে উঁচু-নিচু, সারি সারি পাহাড়গুলোকে এড়িয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়েছে রাস্তাটা। রানা আন্দাজ করলো, গাড়ির আলো নিভিয়ে রেখেছে হুবার্ট। নিজেও জানেনি কেন, সে হয়তো গত এক যুগ কমকরেও পাঁচ-সাত শো বার এই রাস্তা দিয়ে ড্যাম পর্যন্ত আসা-যাওয়া করেছে। গোটা এলাকা তার নখদর্পণে, রানা বা ম্যাকফারলনের চেয়ে অনেক ভালো করে চেনে।

কাছে পিঠেই কোথাও আছে ম্যাক।

কোথায়?

'জুলিয়েট টু রোমিও। জুলিয়েট টু রোমিও। আমরা একা নই। রিপিট, আমরা একা নই।'

রিয়ার-ভিউ মিররে তাকালো রানা। হেডলাইট দেখতে পেলো পিছনে। ওয়াকি-টকি তুলে নিলো ও। 'রোমিও টু জুলিয়েট। আমার পিছনে তুমি? নাকি আগন্তুক?'

'আগন্তুক। গাড়িটায় একজনই লোক। তার পিছনে রয়েছি আমি, চার কি পাঁচ শো গজ পিছনে।'

'তাই থাকো। প্ল্যান মতো চলবে সব। আমার কথা বুঝতে পারছো?'

'ঠিক আছে, রোমিও। ঠিক আছে। সাবধানে থেকো।

উত্তর দেয়ার সুযোগ পেলো না রানা। একেবারে সামনে হঠাৎ একটা বাঁক দেখতে পেয়েছে, ওয়াকি-টকি হাত থেকে ফেলে দিয়ে দু'হাতে হুইল ধরতে হলো। চট্ করে একবার ড্যাশবোর্ডে চোখ বুলিয়ে নিলো ও। আট মাইলের চেয়ে একটু বেশি পেরিয়ে এসেছে ওরা। তিন বা সাড়ে তিন মাইল বাকি আর। অথচ হুবার্ট এখনো অনেক দূর এগিয়ে আছে। এখন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, ট্রাইপডটা কি জায়গা মতো ফিট করা আছে, নাকি সাথে করে নিয়ে যাচ্ছে আত্মঘাতক ?

গাড়িতেই থাকার কথা।

ড্যামে ফিট করে রাখাটা বোকামি, হুবার্টও তা বুঝবে। যখন তখন যে-কেউ দেখে ফেলতে পারে। তাছাড়া, বছরের পর বছর ধরে রোদ-বৃষ্টি-ঝড়ের মধ্যে জিনিসটা ফেলে রাখা চলে না। না, গাড়িতেই আছে ওটা।

ফিট করবে কোথায় ?

গাড়ির নিয়ন্ত্রণ ঠিক রাখার জন্যে এদিক ওদিক বনবন করে হুইল ঘোরালো রানা, দাঁতে দাঁত চাপলো। এতো ঘন ঘন বাঁক পড়ছে, গাড়িটাকে রাস্তার ওপর রাখা দায় হয়ে উঠলো। বাধ্য হয়ে ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইলে নামিয়ে আনতে হলো গতি। রাস্তার ধারে এদিকে এখন খাদ নেই, তবে বড় বড় বোল্ডার রয়েছে। বাঁক নেয়ার সময় হিসেবে একচুল ভুল হলে বোল্ডারে ধাক্কা খেয়ে চুরমার হয়ে যাবে গাড়ি, লাশ সনাক্ত করারও কোনো উপায় থাকবে না।

ফিট করবে কোথায় ?

ড্যামের ভিতটা বিশাল, এতো বিশাল যে হয়তো বা পাঁচ হাজার

টন শক্তি সম্পন্ন বিস্ফোরণের ধাক্কাও সামলে নিতে পারবে। বুদ্ধিমানের কাজ হবে একেবারে ওপরে উঠে যাওয়া, ওখানে ডিটোনেটর সেট করে মারণাস্ত্রটা পানিতে ফেলে দেয়া। শক-ওয়েভের মাত্রা কয়েক শো গুণ বাড়িয়ে তুলবে পানি, প্রচণ্ড তোড়ের ধাক্কায় গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে ড্যাম। মনটা বলছে ঠিক তাই করবে হুবার্ট, কাজেই কিভাবে তাকে বাধা দেবে সে সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেললো রানা।

কাজটা হবে ঝুঁকিবহুল, কিন্তু রানার সামনে আর কোনো বিকল্প নেই। আন্তর্ঘাতকের খোঁজে অন্ধকার হাতড়ে বেড়ানোর সময় নেই এখন। আগেই আন্দাজ করে নিতে হবে কোথায় তাকে পাওয়া যাবে, সরাসরি সেখানে পৌঁছুতে হবে ওকে। হিসেবে যদি ভুল হয়ে থাকে, কপালের দোষ।

খানা-খন্দে ভরা রাস্তা ধরে বাস্কেট বলের মতো ড্রপ খেতে খেতে ছুটছে গাড়ি। তারপর সামনে শুধু নুড়ি পাথর দেখা গেল, রাস্তা বলা চলে না। বার কয়েক পাথরে আটকে গেল চাকা, পিছু হটে তারপর সামনে বাড়ার পথ করে নিতে হলো। মিনিট খানেক পর ফাঁকা একটা বিস্তৃতি দেখে বাঁক নিতে গিয়ে অকস্মাৎ ব্রেক করলো রানা। আরেকটুর জন্যে মরিসটার সাথে ধাক্কা খেতো। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে মরিস, কেউ নেই ভেতরে। ইতস্তত না করে এঞ্জিন বন্ধ করেই দরজা খুলে লাফ দিলো রানা। গাড়ির মেঝে থেকে রাইফেলটা হাতে তুললো, কেস থেকে বের করে হুডের ওপর লম্বা করে রাখলো। এরপর ফ্লেয়ার গানটা বের করলো ও, লোড করলো দ্রুত হাতে। স্পেয়ার রকেটটা গুঁজে রাখলো বেল্টে।

মুখ তুলে ড্যানবার ড্যামের দিকে তাকালো রানা। টাওয়ারের

মতো উঁচু হয়ে আছে দুশো গজ দূরে।

কোথায় সে? কোথায় হুবার্ট?

ওই যে!

আর কে হতে পারে, নিশ্চয়ই হুবার্ট! ছোটোখাটো একজন মানুষ, ড্যামের কিনারা ধরে ছুটছে, কি যেন ধরে আছে দু'হাতে।

ট্রাইপড!

পিছনে গাড়ির আওয়াজ পেলো রানা। ঘাড় না ফিরিয়ে সিদ্ধান্ত নিলো, লিলির ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে। সে যদি বেঈমানী করে, এখনই সময়। মুখ তুলে তাকালো রানা, হুবার্টের জন্যে দুঃখ বোধ করলো, তারপর একটা ফ্লেয়ার ফায়ার করলো ও। মোটাসোটা পিস্তল থেকে ফ্লেয়ারটা বেরিয়ে যেতেই আবার সেটা দ্রুত হাতে রিলোড করলো রানা।

তারপর রাইফেল তুললো।

ফসফরাস জ্বলে উঠলো, নিমেষে দূর হয়ে গেল অন্ধকার। উজ্জ্বল আলোটা চোখে সয়ে আসতে এক সেকেণ্ড সময় লাগলো। রঙিন ফ্লেয়ার শূন্যে ভাসছে, ধীরে ধীরে নেমে আসছে নিচের দিকে। রানা দেখলো, আনবিক বোমাটা নামিয়ে রাখলো হুবার্ট, নিচের দিকে ঝুঁকে কি যেন করছে সে।

দু'বার গুলি করলো রানা। প্রথম গুলিটা ডীপ-কাভার এজেন্টকে বোমার কাছ থেকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে নিয়ে গেল। দ্বিতীয় গুলিটা লম্বায় ছোটো হতে বাধ্য করলো তাকে—হাঁটুর ওপর দাঁড়ালো সে।

ধীরে ধীরে সামনের দিকে ঝুঁকলো হুবার্ট। হাত দুটো মাটিতে ঠেকলো, হামাগুড়ি দিয়ে ওঅরহেডের দিকে ফিরে আসছে সে। প্রচণ্ড রাগের সাথে রানা ভাবলো, যে-কোনো এসপিওনাজ

এজেন্সির গর্ব হতে পারতো লোকটা। দক্ষ, নিবেদিতপ্রাণ একজন নিরীহ এজেন্টকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে হচ্ছে ওকে। এই পেশার এই রেওয়াজ, কর্তব্যের মুখ চেয়ে এড়িয়ে যাবার কোনো উপায় নেই। বৃহত্তর স্বার্থে অমানবিক কাজও তোমাকে করতে হবে।

এরপরই রানা সরাসরি হুবার্টের মাথায় গুলি করলো। ড্যানবার ড্যাম থেকে পড়ে গেল লেফ্‌টেন্যান্ট পদোভিচ, স্বদেশের জন্যে নিতান্তই তাৎপর্যহীন মৃত্যু তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল দুনিয়ার বুক থেকে।

'অভাগা!' খেদ প্রকাশ করলো রানা।

আর ঠিক তখন চল্লিশ গজ দূরে গাড়ি থামালো টিম ম্যাকফারলন ওরফে রাউল ক্ল্যারমণ্ট, জানালা দিয়ে L34A1 বের করে এক সেকেণ্ড দেরি করলো, তারপর ফায়ার করলো রানাকে লক্ষ্য করে। টলে উঠলো রানা, নুড়ি পাথরের ওপর মুখ থুবড়ে পড়লো শরীরটা। দেহটার দিকে তাকালো ক্ল্যারমণ্ট, মনে পড়লো খাতাটা খুঁজতে হবে তাকে। গাড়ি থেকে নেমে নিহত লোকটার দিকে হেঁটে এলো। গাড়ির আওয়াজটা কাছে চলে এসেছে, হঠাৎ করে শুনতে পেলো সে। চোখের পলকে ঘুরে দাঁড়িয়েই প্রফেশনালদের অভ্যস্ত গুলি করার ভঙ্গিতে হাঁটুর ওপর দাঁড়ালো। লিলির গাড়ির হেডলাইট এক কি দু'সেকেণ্ডের জন্যে অন্ধ করে রাখলো তাকে। সরাসরি তার দিকেই গাড়ি ছুটিয়ে আসছে লিলি। হেডলাইটের দিকে সাব-মেশিন গান তাক করলো ক্ল্যারমণ্ট।

মাত্র একটা গড়ান দিলো রানা। রাইফেলটা হাতেই ছিলো। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে প্রথমবার লক্ষ্যভেদ করতে ব্যর্থ হয়েছে ক্ল্যারমণ্ট, কিন্তু রানা ব্যর্থ হলো না। ক্ল্যারমণ্টের মাথার পিছন দিকের

খুলি উড়িয়ে নিয়ে গেল বুলেট। একটাই ভুল করেছিল ক্ল্যারমন্ট, রানা কোনো ভুল করেনি।

ছুটে এলো মেয়েটা। 'রবিন, রবিন তুমি··· ?'

'অক্ষত নই, তবে বেঁচে আছি,' জোর করে হেসে উঠে বললো রানা। বাঁ দিকের পাঁজর ছুঁয়ে বেরিয়ে গেছে বুলেট, তবে ভাগ্য ভালো ভেতরে ঢোকেনি। তারচেয়েও বড় স্বস্তি, বেঈমানী করেনি লিলি। সব প্ল্যান মতোই ঘটেছে। ধীরেসুস্থে ড্যামের ওপর উঠে এলো ওরা। ট্রাইপডটা উদ্ধার করলো। নেড়েচেড়ে জিনিসটা কিছুক্ষণ দেখলো ওরা। তারপর ড্যামের কিনারা থেকে ফেলে দিলো নিচের গভীর পানিতে। কেউ আর কোনো দিন খুঁজে পাবে না ওটা।

চোদ্দ

সকালের মধ্যে—লাশগুলো কেউ দেখতে পাবার অনেক আগেই—দুশো পনেরো মাইল দূরে চলে এলো ওরা। পথে গাড়ি বদল করলো কয়েকবার, তারপর প্লেনে করে সান ফ্রান্সিসকো-য় পৌঁছুলো বেলা তিনটেয়। পাঁচটার খানিক পর দেখা গেল এয়ারপোর্টের

ষোলো নম্বর গেটের সামনে রানার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে লিলি। আবার প্লেনে চড়ার জন্যে অপেক্ষা করছে রানা, লিলি দাঁড়িয়ে রয়েছে ওকে বিদায় দেবে বলে। বিজয়ী হয়ে ফিরে যাচ্ছে মাসুদ রানা।

খাতা সহ।

কে. জি. বি. হেডকোয়ার্টারে ওরা সবাই সন্তুষ্ট হবে। সোভিয়েত নাগরিক নয়, তাই হয়তো কোনো পদক বা রাষ্ট্রীয় সম্মান রানার কপালে জুটবে না, কিন্তু মৌখিক প্রশংসার কোনো অভাব হবে না। শুধু নিকোলাই ডালচিমস্কিকে থামাতে পারাটাই যথেষ্ট কৃতিত্বের ব্যাপার, প্রায় অসাধ্যসাধন করেছে রানা। কিন্তু খাতা উদ্ধারের ব্যাপারটা তাকেও ছাড়িয়ে গেছে। মনে মনে ভাবলো রানা, রুশ মিলিটারী ইন্টেলিজেন্সও নিজেদের ভুল বুঝতে পারবে। খাতা নিয়ে মস্কোয় ওকে পৌঁছুতে দেখলে অপরাধ বোধে ভুগবে তারা। রানা অবশ্য ওদের কারো সাথে কথা বলবে না। ওকে খুন করার জন্যে যারা চার চারটে কমাণ্ডো টিম পাঠায় তাদের সাথে আবার কথা কি! কথা বলতে হলে ওর কাছে আগে মাফ চাইতে হবে ওদের।

কিন্তু কয়েকটা বিষয় এখনো রানার কাছে পরিষ্কার নয়। খুব ভালো করেই জানে ও, মঞ্চে এখনো যবনিকাপাত হয়নি। নাটকের শেষ দৃশ্য বাকি রয়েছে।

তবে মেয়েটা সত্যি ভালো। একটু হয়তো কাঁচা, তবে বয়সও তো বেশি নয়। ওর কাজ ও ঠিকমতোই করে গেছে—সাধ্যমতো চেষ্টা করেছে রানা যাতে উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তায় না ভোগে। অনুমতি না নিয়ে বেয়াড়া কোনো প্রশ্ন করেনি। ওর কাছ থেকে পাওয়া

আদরটুকু কোনোদিন ভুলবে না রানা—সেটা অভিনয় ছিলো না, অন্তর থেকে উৎসারিত ভালোবাসার ফসল।

কিন্তু এখন ঘরে ফেরার পালা। বিদায়ের বিষণ্ণ মুহূর্ত। আর কয়েক মিনিট পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে যোগাযোগ। হয়তো চির-কালের জন্যে। একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলো রানা। পেশাগত বিড়ম্বনা থেকে নিস্তার নেই কারো। এর আগেও এ ধরনের ঘটনা রানার জীবনে ঘটেছে—অভিনয় করতে করতে সত্যি সত্যি ভালো লেগে গেছে কোনো মেয়েকে, কিন্তু কর্তব্যের তাগিদে আবার ছিটকে পড়েছে দূরে। পরে আর কেউ কারো খবর নেয়ার সুযোগ পায়নি। এক মুহূর্তে অনেকগুলো মুখ ভেসে উঠলো চোখের সামনে। সব-গুলো চেহারাই কেমন যেন অস্পষ্ট হয়ে গেছে। এক সময় তারা ওর খুব কাছাকাছি ছিলো, আজ কে কোথায় জানা নেই। না পাওয়ার একটা গভীর ক্ষত হঠাৎ যেন ব্যথা করতে শুরু করলো।

অভিশপ্ত জীবন। অভিশপ্ত পেশা।

'কেমন অভ্যর্থনা দেয় তোমাকে ওরা দেখতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে,' বললো লিলি। 'হিরো হয়ে ফিরে যাচ্ছো দেশে। কতো প্রশংসা হবে তোমার। কতো ভক্ত জুটবে। পদক পাবে। প্রমোশন হবে। আচ্ছা, রবিন, তখন আমার কথা মনে পড়বে তোমার? সত্যি করে বলো তো, পড়বে মনে?'

'সত্যি কথা অপ্রিয় হয়, জানো না?' হাসতে চেষ্টা করলো রানা। 'আমার মনে যদি থাকতেই চাও, চলো না একসাথে দেশে ফিরি?'

'তা কি করে হয়, রবিন!' লিলিও জোর করে হাসলো। 'এখানে যে আরো কাজ আছে আমার। কি একটা চাকরি, কবে ছুটি পাবো

তাও আগাম জানার উপায় নেই। তাছাড়া, ছুটি পেলেই বা কি —মস্কোয় যাবার অনুমতি যদি না পাই ?'

এমনভাবে মাথা ঝাঁকালো রানা যেন সবই বুঝতে পারছে ও।

জাপান এয়ারলাইন্সের এগারো নম্বর ফ্লাইট ছেড়ে যাবে এবার, শেষ ঘোষণাটা প্রচার করা হচ্ছে স্পীকারে। লিলির দিকে তাকিয়ে কথা বলার চেষ্টা করলো রানা। গুডবাই বলতে এতো ইতস্তত করেনি কখনো। 'তোমার অভাব সহজে মিটবে না,' সত্যি কথাটাই বললো ও।

'আর আমার যে কী কষ্ট হবে, সে তুমি কোনোদিনও বুঝবে না। তোমার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি আমি, রবিন। এমন একটা মেয়েকে রেখে যাচ্ছো যে আগের চেয়ে অনেক ভালো জানে সত্যিকার পুরুষ কাকে বলে।'

অন্যান্য আরোহীরা ওদেরকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। কাছাকাছি অনেক মানুষ চলে আসায় ওদের নিরিবিলি পরিবেশটা নষ্ট হয়ে গেল।

'তোমার কাছ থেকে একটা জিনিস চাইতে বাকি আছে,' মৃদু কণ্ঠে বললো লিলি, গলায় যেন জোর পাচ্ছে না। 'ধরো, তোমাকে একটা চিহ্ন, একটা উপহার রেখে যেতে বলছি।'

'কি, লিলি ? তোমাকে দেয়ার মতো কি আছে আমার কাছে ?' আগ্রহের সাথে লিলির দিকে ঝুঁকে পড়লো রানা। 'আমার সাধ্যের মধ্যে হলে নিশ্চয়ই সেটা তোমাকে আমি··· ।'

'খাতাটা, রবিন। খাতাটা নেবো আমি।'

লিলি কথা বলছে, পাঁজরে পয়েন্ট থ্রি-এইট পিস্তলের খোঁচা অনুভব করলো রানা।

'প্লিজ, রবিন, প্লিজ ! কোনো রকম বোকামি করতে যেয়ো না। এক ইঞ্চি নড়লে তোমাকে ওরা মেরে ফেলবে।' দ্রুত, চাপা স্বরে কথা বললো লিলি। শুধু কণ্ঠস্বর নয়, তার চেহারাও এখন আর কোমল নয়।

'কি যা তা বকছো ! ওটা আমি মস্কোয় নিয়ে যাচ্ছি !'

'না, রবিন। ওটা ওয়াশিংটনে যাবে।'

'কে. জি. বি. রেসিডেন্টের কাছে ?'

মাথা নাড়লো লিলি, আর সেই সাথে ঘাড়ের পিছনে আরেকটা মাজলের চাপ অনুভব করলো রানা। কে পিস্তলটা ধরে আছে জানে না রানা, দেখলেও চেহারাটা চিনতে পারতো না। এই লোককে আগে কখনো দেখেনি ও, জানে না লিভেনওয়ার্থ আর্মি হসপিটালে টেলিফোন কোম্পানীর সিকিউরিটি অফিসার হিসেবে ছিলো লোকটা, মিথ্যে পরিচয়ে।

'রবিন ডিয়ার, ছোট্ট একটা স্বীকারোক্তি করছি আমি। সৈকতে যে মেয়েটার সাথে তোমার দেখা হওয়ার কথা ছিলো, বেচারা ছোটো একটা অ্যাক্সিডেন্ট করে আহত হয়। আদর-যত্নে রাখা হয়েছে তাকে, বিশ্রাম নিচ্ছে—ল্যাংলি, ভার্জিনিয়ায়।'

চমকে উঠলো রানা। অন্তত দেখে তাই মনে হলো।

'কিছু করতে চেয়ো না,' দ্রুত সাবধান করে দিলো লিলি। 'নয়টা পিস্তল তাকিয়ে রয়েছে তোমার দিকে। কিছু করার আগে ওরা তোমাকে ছাতু করে ফেলবে। প্লিজ, রবিন। বাস্তবতাকে মেনে নাও। বি প্র্যাকটিক্যাল।'

চারদিকে তাকালো রানা। কঠোর চেহারার 'আরোহীরা' ওদের ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে।

'ল্যাংলি, ভার্জিনিয়া? তারমানে তুমি ওদের দলে?'

'রবিন, ব্যাপারটাকে এভাবে দেখো। আমরাও একই জিনিসের পিছনে লেগে ছিলাম। আমরাও মানুষের প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টায় ছিলাম, চাইছিলাম যুদ্ধ যেন না বাধে। ম্যানিয়াকটাকে আমরাও খুঁজছিলাম। খুঁজছিলাম খাতাটা। এ-ধরনের একটা খাতার অস্তিত্ব যে আছে গত সাত বছর ধরে জানি আমরা। কিন্তু অনেক খুঁজেও পাচ্ছিলাম না। কারণ তোমার মতো প্রতিভাবান এজেন্ট নেই আমাদের··· ।'

তিক্ত, ঝাঁঝালো কণ্ঠে রানা বললো, 'ধন্যবাদ!'

'তবে আমাদের রয়েছে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এক মহিলা কমপিউটর অ্যানালিস্ট, নাম চ্যারিটি উডস্টক। তার কাছ থেকে অনেক প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাই আমরা, সে-ই আবিষ্কার করে ডালচিমস্কি আমেরিকায় তার নাম সই করছে।'

'সেজন্যেই বারবার তুমি আমাকে নতুন তালিকা তৈরি করার জন্যে চাপ দিচ্ছিলে?'

'হ্যাঁ, রবিন, তাই। তবে তোমার মন খারাপ করার কোনো কারণ নেই। চ্যারিটি উডস্টক বা আমার কোনো সাহায্য ছাড়াই তালিকাটা তৈরি করেছিলে তুমি। তোমার এই কৃতিত্বে কেউ ভাগ বসাতে পারবে না।'

আবার তিক্ত কণ্ঠে বললো রানা, 'ধন্যবাদ।'

'ডালচিমস্কির নামটা আমরা তোমার কাছ থেকে জানতে পারলেও, টার্গেটের তালিকা আর এজেন্টদের তালিকা আমাদের কাছে ছিলো না। সেটা ছিলো তোমার মাথায়।'

'ওহ্, গড! কি ছ্যাকটাই না দিলে!'

'দুনিয়ায় কেউ নিখুঁত নয়, হানি। এবার লক্ষ্মী ছেলের মতো শান্ত হয়ে থাকো দেখি, খাতাটা আমি বের করে নিই।' জ্যাকেটের ভেতর হাত গলিয়ে পকেট থেকে খাতাটা বের করে নিলো লিলি। কয়েক সেকেণ্ড উল্টেপাল্টে দেখলো সেটা, তারপর খুললো। একটা পাতা বাদ দিয়ে খাতার দ্বিতীয় পাতা থেকে ডীপ-কাভার টেলি-বম এজেন্টদের নাম-ঠিকানা লেখা রয়েছে। ধীরে ধীরে মধুর হাসি ফুটে উঠলো লিলির মুখে।

সুবেশী এক নিগ্রো লোক ভিড়ের মধ্যে থেকে হঠাৎ করে বেরিয়ে এলো, হাতে একটা মেটাল অ্যাটাচি কেস। আরো চার জন লোক ঘিরে রাখলো তাকে, প্রত্যেকের রাশভারি চেহারা, চোখে পাথুরে দৃষ্টি। অ্যাটাচি কেসে ভরা হলো খাতাটা, নিগ্রো লোকটাকে ঘেরাও করে নিয়ে সরে গেল চারজন—একটা ফোন বুদের দিকে।

'কোথায় যাচ্ছে ওরা?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'খাতাটা জেনুইন কিনা পরীক্ষা করে দেখবে,' মুচকি হেসে বললো লিলি। 'তুমি ওটা নিজের হাতে লিখে পকেটে রেখে দিয়েছিলে কিনা কিভাবে বুঝবো? তালিকা দেখে টেলি-বম এজেন্টদের কয়েকজনকে ফোন করবে ওরা—ঘাবড়াবার কোনো কারণ নেই, কোড সংকেত উচ্চারণ করবে না।'

ম্লান চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো রানা। অলস দৃষ্টিতে দেখলো ফোন বুদের ভেতর ঢুকে অ্যাটাচি কেস থেকে টেলি-বম বুকটা বের করছে নিগ্রো। একটু পর ডায়াল করতে শুরু করলো সে।

অপরপ্রান্তে নিশ্চয়ই কেউ ফোন ধরলো, মাত্র একটা কি দুটো কথা বলে যোগাযোগ কেটে দিলো নিগ্রো লোকটা। তারপর আবার ডায়াল করলো। এভাবে তিনবার।

একটু পর সন্তুষ্ট চেহারা নিয়ে বুদ থেকে বেরিয়ে এলো নিগ্রো, হাত তুলে ইশারা করলো লিলিকে। রানার দিকে ফিরলো লিলি, 'অবিশ্বাস করার জন্যে দুঃখিত, রবিন,' বললো সে। 'কিন্তু বুঝতেই পারছো, নিশ্চিত হবার আর কোনো উপায় ছিলো না। তুমি কোনো কারচুপি করোনি সেজন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'জুতো মেরে গরুদান, আমাদের দেশের একটা প্রবাদ,' বিষণ্ণ মুখে বললো রানা। 'এখন তাহলে কি হবে? ওয়াশিংটনের সেন্ট্রাল জেলে বিশ বছর পচবো? নাকি একেবারে ঝামেলা চুকিয়ে দেবে?'

'এমন কথা তুমি ভাবতে পারলে? আমাকে তুমি ভুল বুঝেছো, হানি। চমৎকার একটা কৃতিত্ব দেখিয়েছো তুমি—দু'দেশের জন্যেই। তবে একটা কথা ঠিক, আমেরিকায় আর কোনো কে. জি. বি. এজেন্টকে দেখতে চাই না আমরা। তোমাকে আমরা এই প্লেনেই যেতে দিচ্ছি। তারপর একশো ছাব্বিশ না কতো যেন ডীপ-কাভার এজেন্টকে আগামী কয়েক দিনের মধ্যে গ্রেফতার করা হবে....'

'পুওর বাস্টার্ডস!'

'ওদের আমরা খাতির-যত্নে রাখবো, রবিন। এ তো পরিষ্কার, ওরা আমাদের সাংঘাতিক কাজে লাগবে। বন্দী বিনিময়ের সময়। আরেকটা ব্যাপার, রবিন, টাকাগুলো ফেরত দাও।'

'টাকা!'

'পঞ্চাশ হাজার ডলার দিয়েছিলাম তোমাকে,' বললো লিলি। 'খরচ যা হবার হয়েছে, বাকি টাকা ফেরত দাও। ওগুলো তো আর কে. জি. বি. রেসিডেন্টের টাকা ছিলো না।'

'সব?' মুখ ভার করে জিজ্ঞেস করলো রানা। 'কিন্তু একেবারে

খালি হাতে বাড়ি ফিরি কিভাবে! অন্তত ট্যাক্সি ভাড়ার জন্যে এক হাজার ডলার দাও আমাকে।' পকেট থেকে ওয়ালেটটা বের করলো রানা।

ওয়ালেট থেকে সব টাকাই বের করে নিলো লিলি, তা থেকে এক হাজার ডলার ফেরত দিলো রানাকে। 'তোমার নার্ভ খুব শক্ত, রবিন। নিরাপদে বাড়ি ফিরে যাও, এবং আর ফিরে এসো না। প্লিজ আর কখনো ফিরে এসো না।'

রানা উপলব্ধি করলো, মেয়েটা ওকে পছন্দ করে। অদ্ভুত এক আনন্দে ছেয়ে গেল ওর মন। 'আচ্ছা, একটা প্রশ্ন। লিভেনওয়ার্থ হাসপাতালে লোকটাকে কে, কারা খুন করেছিল? তোমরা, নাকি আমাদেরই লোক?'

'তোমাদের লোক, রবিন।'

'টিম ম্যাকফারলন? এফ. বি. আই. এজেন্ট ছিলো?'

মাথা নাড়লো লিলি। সে-ও তোমাদের লোক। আমার ধারণা, গ্রুর এজেন্ট। আমি বা আমাদের লোকেরা তোমাকে একবারও বিরক্ত করেনি। খাতাটা না পেয়ে তোমাকে আমরা বিরক্ত করতে চাইনি।'

'কিন্তু তোমার কাছে যে ব্লিপার ছিলো সেগুলো সিগন্যাল পাঠাচ্ছিল—নিশ্চয়ই ল্যাংলিতে, তাই না? তাহলে আমাদের খুন করার চেষ্টা করলো কারা?'

'ভাবছিলাম কখন তুমি জিজ্ঞেস করবে,' বললো লিলি। 'ল্যাংলিতেই যাচ্ছিলো সিগন্যাল। ওখানে তোমাদের, মানে গ্রুর একজন চর ছিলো—চ্যাপেল। একটু দেরিতে হলেও, ধরা পড়ে গেছে সে। গ্রুর আততায়ীরা চ্যাপেলের কাছ থেকেই খবর পাচ্ছিলো কোথায়

আছি আমরা।'

আর কোনো প্রশ্ন মনে পড়লো না, কেমন উদাস চোখে লিলির দিকে তাকিয়ে থাকলো রানা। মস্কোয় ওর জন্যে কি অপেক্ষা করছে ওর জানা নেই। অ্যাসাইনমেন্ট পুরোপুরি সফল হলেও গ্রু র বিরুদ্ধে অনেকগুলো অ্যাকশন নিতে হয়েছে ওকে। রুশ মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স কোন্ দৃষ্টিতে দেখবে কে জানে।

'যাবার সময় হলো, রবিন। মনে কোনো রাগ নেই তো?'

মাথা নাড়লো রানা, ঘাড় ফিরিয়ে চওড়া দরজার দিকে তাকালো—দূরে, রানওয়ের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে ওর প্লেন। ঠোঁটে দুষ্টামির হাসি ফুটে উঠলো, বললো, 'যার সাথেই তোমার বিয়ে হোক, জানিয়ে দিয়ো, তাকে আমি ঈর্ষা করি।'

'সাহস থাকে তো তোমার বউকেও জানিয়ে দিয়ো, লিলি নামের এক ডাইনী তোমাকে ভালোবাসে। গুড বাই, রবিন।'

ঘুরে হাঁটা ধরলো রানা, একবারও পিছন দিকে না তাকিয়ে পৌঁছে গেল প্লেনের কাছে। সি. আই. এ. এজেন্টরা একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলো, রানওয়ে ধরে ছুটতে শুরু করলো প্লেন। বিকেলের আকাশে একটু পরই অদৃশ্য হয়ে গেল সেটা।

ভিড় ঠেলে লিলির দিকে এগিয়ে এলো দু'জন মানুষ—কর্নেল জিল ক্যাসেল আর চ্যারিটি উডস্টক। কাজিন লিলিকে জড়িয়ে ধরে চুমো খাবার ইচ্ছে ছিলো, কিন্তু চ্যারিটি উডস্টকের উপস্থিতি বাদ সাধলো ইচ্ছেটায়, কর্নেল বললো, 'এটা একটা ঐতিহাসিক মুহূর্ত। অত্যন্ত টাফ একটা কেস সল্‌ভ্ করেছি আমরা—লক্ষ-কোটি মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছি, এবং ইতিহাসের সেরা একদল ডীপ-কাভার এজেন্টকে গ্রেফতার করতে যাচ্ছি। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে ঐতিহাসিক

কিছু একটা বলা দরকার···। নিজের অজান্তে, বলতে গেলে ভুল করেই আড়চোখে চ্যারিটি উডস্টকের বুকের দিকে তাকালো সে। আজও মেয়েটা ব্রেসিয়ার পরেনি।

ইতস্তত না করে চ্যারিটি উডস্টক সাড়া দিলো তার প্রস্তাবে। 'আমার ইচ্ছে, ঐতিহাসিক কিছু বলার সুযোগটা আমাকে দেয়া হোক।'

'আবেদন গ্রহণ করা হলো,' ভারি গলায় ঘোষণা করলো কর্নেল

'যারা সরাসরি মেয়েদের বুকের দিকে তাকায় তারা অভদ্র, আর যারা আড়চোখে তাকায় তারা ইতর, কিন্তু যারা বারণ করা সত্ত্বেও তাকায় তারা মানসিক প্রতিবন্ধী!'

মনে মনে নিজের গালে চড় মারলো জিল ক্যাসেল।

পনেরো

'প্রিমিয়ার কি বলেছেন শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবে তুমি, আনাতোলি,' দু'দিন পর কর্নেল বিকারেনকে বললেন জেনারেল কায়কোভস্কি।

'তাই, কমরেড জেনারেল?'

'জিজ্ঞেস করবে না। কি বলেছেন ?'

'আপনি আমাকে বলবেনই, তাই না, কমরেড জেনারেল ?'

বাক্স থেকে হাভানা চুরুট বের করে আবার সেটা বাক্সে রেখে দিলেন জেনারেল কায়কোভস্কি, কি যেন তাঁর মনে পড়ে গেছে।

'ধন্যবাদ, কমরেড জেনারেল,' হাসি চেপে বললেন কর্নেল বিকারেন। 'আজ আপনি খুবই উৎফুল্ল বোধ করছেন।'

'করবো না-ই বা কেন! সহকর্মীকে এ-ধরনের একটা সুখবর দেয়ার সৌভাগ্য ক'জনেরই বা হয়, বলো ?'

'সুখবর, কমরেড জেনারেল ?'

'দারুণ সুখবর, আনাতোলি। প্রিমিয়ার টেলি-বম অ্যাসাইনমেন্টের পুরো রিপোর্টটা একবার নয়, দু'বার পড়েছেন। পড়ার পর প্রথমে তিনি মাসুদ রানাকে সাক্ষাৎ দান করেন। তারপর ডেকে পাঠান রেড আর্মি চীফ অভ স্টাফ মার্শাল ওনায়েভ আর মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স চীফ মেজর জেনারেল ইগর কুদরভকে। গুজব কি জানো ? কুদরভ নাকি লিখিতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।'

'দেখবেন, কমরেড জেনারেল, এরপরও তিনি কে. জি. বি.-কে একহাত দেখাবার সুযোগ পেলে ছাড়বেন না!'

'সেক্ষেত্রে তোমার কাজ হবে প্রিমিয়ারকে ঘটনাটা জানানো, জোঁকের মুখে লবণ পড়বে।'

'আমি ? আমি কেন জানাতে যাবো, কমরেড জেনারেল ? আমি কে ?'

হাসতে লাগলেন জেনারেল কায়কোভস্কি। 'সুখবরটা হলো, প্রিমিয়ার তোমাকে প্রমোশন দিয়েছেন। কাগজ-পত্র তৈরি হচ্ছে, একহপ্তার মধ্যে জেনারেল হয়ে যাচ্ছো তুমি। শুধু তাই নয়, কে.

জি. বি. ডিরেক্টরের পদটাও অলংকৃত করতে যাচ্ছো তুমি। আর দশদিন পর অবসর নিচ্ছি আমি! কংগ্রাচুলেশন্স, আনাতোলি।'

'ধন্যবাদ, কমরেড জেনারেল।'

'প্রিমিয়ার সবচেয়ে খুশি হয়েছেন খাতাটা ফিরে পেয়ে,' বললেন কায়কোভস্কি। 'তিনি নাকি কৌতুক করে মাসুদ রানাকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি খাতাটা থেকে আরেকটা খাতা তৈরি করে রাশিয়ার বাইরে কোথাও রেখে আসেননি তো?'

'উত্তরে মাসুদ রানা কি বলেছে তাকে?'

'উত্তরটা পারফেক্ট দিয়েছে সে। বলেছে, অবশ্যই আরেকটা খাতা আছে। ওটা নাকি তার বীমা। তাকে রাশিয়া থেকে বেরুতে না দিলে খাতাটা নাকি আমেরিকানদের হাতে চলে যাবে।'

'যোগ্য একজন এজেন্ট, সন্দেহ নেই,' রায় দিলেন কর্নেল বিকারেন। 'নিজের নিরাপত্তার কথাটা সবচেয়ে আগে ভাবে।'

'এবার, আনাতোলি, কাজের কথা বলি। নতুন একটা মিশনের কথা ভাবছি, বুঝলে। ঠিক মাসুদ রানার মতো একজন এজেন্টকে দরকার।'

'নতুন মিশন?'

'সাংঘাতিক কঠিন। টেলি-বমের চেয়েও রোমাঞ্চকর। শুধু বোধহয় মাসুদ রানার পক্ষেই…।'

'কিন্তু সে তো টোকিয়োতে ফিরে গেছে, কমরেড জেনারেল!'

'জানি,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন কায়কোভস্কি। 'যদি ওর মতো অন্তত একজন থাকতো আমাদের!'

পরদিন বিকেল বেলা সি. আই. এ. হেডকোয়ার্টার ল্যাংলিতে

ছোটোখাটো একটা আনন্দ উৎসবের আয়োজন করা হলো। ডিরেক্টর উপস্থিত হয়ে বললেন, 'এফ. বি. আই. এবং বিভিন্ন পেন্টাগন ইন্টেলিজেন্স শাখাগুলোকে যা বলার বলে দিয়েছি আমি। টেলি-বম ব্যাপারটা কেন শুধু আমরা একা ডিল করতে চেয়েছি, ব্যাখ্যা করার পর ওরা কেউ আর কোনো অভিযোগ তোলেনি। সবশেষে বলেছি, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত হোয়াইট হাউসের সমর্থন ছিলো আমাদের প্রতি। ব্যস, এতেই ঠাণ্ডা হয়ে গেছে সবাই।'

বেন সুইটল্যাণ্ড বললো, 'বিগ রড ভারি চমৎকার একটা সাফল্য! ফার্স্ট ক্লাস!'

জিল ক্যাসেলের ভয় হলো, বেনকে না চ্যারিটি চড় মেরে বসে। কারণ বেন তাদের কাজে শুধু বাধাই দিয়েছে, কোনো রকম সহ-যোগিতা করেনি। দ্রুত একবার চ্যারিটির দিকে তাকালো সে, দৃষ্টি বেয়াদপি করে বসার আগেই তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিলো।

এরপর শুরু হলো লিলির প্রশংসা। তার অবর্তমানে।

চ্যারিটি উডস্টক লিলির অনুপস্থিতির কারণ ব্যাখ্যা করলো, 'সবাই হয়তো ভাবছেন, রুশ এজেন্ট রবিন তাকে নকল টেলি-বম বুক দিয়ে গেছে, সেই দুঃখে অসুস্থ হয়ে পড়েছে লিলি। ব্যাপারটা তা নয়, বরং ঠিক তার উল্টো। লিলি দুঃখ পেয়েছে এ-কথা সত্যি, এক ধরনের রোগও তার মনে বাসা বেঁধেছে। রোগ না বলে দুর্ব-লতা বললে ভদ্রোচিত শোনাবে। আসল কথাটা বলেই ফেলি। লিলি আমাকে নিজে বলেছে। রুশ এজেন্ট রবিনকে সে ভুলতে পারছে না।'

'আমাদের উচিত ব্যাপারটাকে সহানুভূতির চোখে দেখা,' জিল ক্যাসেল মন্তব্য করলো। 'আমার মনে হয় লিলিকে লম্বা একটা

ছুটি দিয়ে কোনো সী-বীচে পাঠিয়ে দিলে মন্দ হয় না।

এরপর চ্যারিটি উডস্টকের প্রসঙ্গ তুললেন ডিরেক্টর। 'প্রায় সব-টুকু কৃতিত্ব আসলে চ্যারিটির। আজ সকালে একটা কাগজে সই করেছি, তাতে বলা হয়েছে চলতি মাস থেকে তোমার বেতন দু'-হাজার ডলার করে বাড়লো। এতে কিছু টেকনিক্যাল অসুবিধে দেখা দেবে, কেন না, তোমার বস জিল ক্যাসেলের বেতন আর তোমার বেতন প্রায় সমান সমান হয়ে গেল। এটা তেমন বড় কোনো সমস্যা নয়, তোমাকে একটা আলাদা বিভাগের প্রধান করে দিলে সব ঝামেলা চুকে যাবে।'

ডিরেক্টরের তরফ থেকে একটা মেডেলও দেয়া হলো চ্যারিটি উডস্টককে। সেটা তার ব্লাউজে পরিয়ে দিলো জিল ক্যাসেল। আশ্চর্য হয়ে চ্যারিটি লক্ষ্য করলো, এতো কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েও কর্নেল তার বুকের দিকে ভুলেও একবার তাকালো না। এই প্রথম লোকটার প্রতি কিছুটা দয়া এবং শ্রদ্ধা জাগলো তার মনে।

'কংগ্রাচুলেশন্স, চ্যারিটি,' আন্তরিক কণ্ঠে বললো কর্নেল ক্যাসেল। 'আমরা তোমাকে নিয়ে সত্যি গর্বিত!'

উৎসব শেষে নিজের অফিসে ফিরে এলো কর্নেল। একটু পর নক হলো দরজায়।

'কাম ইন।'

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো চ্যারিটি। দেখলো, মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে বস।

'কিছু বলবে, চ্যারিটি?'

'মেডেলটা দেখাতে এলাম, কর্নেল,' বললো চ্যারিটি। 'আপনি নিজের হাতে লাগিয়েছেন বটে, কিন্তু লক্ষ্য করলাম, একবারও চোখ

তুলে জিনিসটা ভালো করে দেখেননি।'

'দেখিনি, দেখতে চাইও না।'

'কিন্তু কেন?'

'নিজেই বুঝে দেখো,' বললো কর্নেল। 'এমন এক জায়গায় লটকে আছে, ওটার দিকে তাকালেই তুমি ভেবে বসবে আমি বোধহয়...'

'কিছুই ভাববো না, কিছুই মনে করবো না,' মিটিমিটি হেসে বললো চ্যারিটি। 'আপনি তাকান, কর্নেল, প্লিজ।'

কর্নেল জিল ক্যাসেল তাকালো।

টোকিওতে ফিরে এসে লং ডিসট্যান্স লাইনে মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের সাথে কথা বলছে রানা।

'কিন্তু খাতাটা?' জিজ্ঞেস করলেন রাহাত খান।

'ডালচিমস্কির খাতাটা মস্কোয় ফিরিয়ে দিয়ে এসেছি, স্যার,' বললো রানা। 'লিলিকে নকল একটা খাতা দিয়েছি—গগলের কাছ থেকে আগেই ওটা যোগাড় করেছিলাম। গগলের খাতায় আমিই এজেন্টদের রুশ অর আমেরিকান নাম, ফোন নম্বর, ঠিকানা, কোড সংকেত ইত্যাদি লিখি। সব ভুয়া।'

'খাতাটা ওরা পরীক্ষা করেনি?'

'জানতাম করবে,' বললো রানা। 'তাই তালিকার প্রথম ও শেষ বিশটা ফোন নম্বরে গগলের লোক বসিয়ে রেখেছিলাম। টেলিফোন রিসিভ করেই কেটে পড়েছে ওরা। কারও টিকিও স্পর্শ করতে পারবে না সি. আই. এ.। তালিকার আর সব নামও ভুয়া, ওই নামে ওই ঠিকানায় কেউ থাকে না।'

'খুব বড় একটা ঝুঁকি নিয়েছিলে,' বললেন রাহাত খান। 'ওরা

যদি তালিকার মাঝখানের কোনও নাম চেক করতো তাহলে তুমি ফেঁসে যেতে।' এক সেকেণ্ড পর আবার বললেন তিনি, 'এছাড়া অবশ্য আর কিছু করারও ছিলো না তোমার। যাক, ভালোয় ভালোয় উতরে গেছো সেটাই আসল কথা। খুশি হয়েছি আমি। এখন টেলি-বম এজেন্টদের নিয়ে কি করা হবে ভেবেছো কিছু?'

'খাতা একটা আমাদের হাতেও থেকে গেছে, স্যার,' বললো রানা। 'টেলি-বম ফাটিয়ে দেয়ার ভয় দেখিয়ে দুই সুপারপাওয়ারকেই নরম রাখতে পারি আমরা। কিন্তু সেটা ব্ল্যাকমেইলিঙের পর্যায়ে পড়ে। সিদ্ধান্ত নেয়ার মালিক আপনি, স্যার।'

'সিদ্ধান্ত একটাই হতে পারে,' বললেন রাহাত খান। 'একজন দু'জন করে আমেরিকা থেকে ওদেরকে রাশিয়ায় ফেরত পাঠানো। তোমার এজেন্সিকে দিয়ে কাজটা করাতে পারলে ভালো হয়। তবে তোমার জড়িয়ে পড়া চলবে না। তোমাকে ওরা ডেকেছে।'

'আমাকে ডেকেছে? কারা ডেকেছে, স্যার?'

'সে প্রসঙ্গে পরে আসছি,' বললেন রাহাত খান। 'আগে এই ব্যাপারটা শেষ করে নিই। গগল যাদের আটক করে রেখেছে তাদের কথা ভেবেছো কিছু?'

'গ্রুর লোকগুলোকে মেক্সিকোয় পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে—গগলকেই দিয়েছি কাজটা।'

'গুড। ভালো কথা, মেয়েটা যে কে. জি. বি. রেসিডেন্টের এজেন্ট নয়, তুমি টের পেলে কখন?'

'একেবারে প্রথম দিকেই,' বললো রানা। 'কে. জি. বি. রেসিডেন্টের এজেন্ট হলে তার জানার কথা আমি আপনার এজেন্ট, রুশ এজেন্ট নই। কিন্তু লিলি আমাকে দেখে হঠাৎ একটা প্রশ্ন করে

বসে—আমি কি তাসখেলুদের লোক ?'

'বুঝেছি। আচ্ছা, শোনো, তোমাকে কিন্তু ছুটি দেয়া যাচ্ছে না। অ্যান্টি টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশনের ডঃ এডওয়ার্ড ওয়ার্নার তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছে। ওরা নাকি একটা ট্রেনিং ক্যাম্পের আয়োজন করেছে, তোমাকে দরকার।'

চুপ করে থাকলো রানা।

'ঠিক আছে, লণ্ডনে যাবার আগে টোকিওতে আরো নাহয় তিন-চারদিন থাকো,' ভারি গলায় বললেন রাহাত খান, কল্পনার চোখে রানা দেখলো তাঁর কাঁচাপাকা ভুরু জোড়া কুঁচকে আছে। 'ভুলে গেলে চলবে কেন, ওদের সাথে আছো তুমি। ডাকলে তো যেতে হবেই।'

'জ্বী, স্যার। যাবো।'

'এদিকে এক ঝামেলা হয়েছে, বুঝলে,' অনেকটা অপরাধ স্বীকারের সুরে শুরু করলেন রাহাত খান। 'বিশ্রাম-টিশ্রাম কিছু না, আমি আসলে গগলের প্রস্তাবে রাজি হই শিকারের লোভে। ভেবেছিলাম শিকারও পাবো না, বেশিদিন থাকতেও হবে না। কিন্তু কি বিচ্ছিরী কাণ্ড বলো দেখি, দু'এক দিন পরপরই একটা করে ভালো শিকার পেয়ে যাচ্ছি! এমন অবস্থা হয়েছে কেউ আমাকে তাড়িয়ে দিলেও এখান থেকে যেতে চাইবো কিনা সন্দেহ···।'

কে কথা বলছেন ? রাহাত খান ? নিজের কানকেই রানা বিশ্বাস করতে চাইলো না। 'স্যার, আপনি···।'

'আমি কি ?'

'না, মানে বলছিলাম দেশে··· ?'

'কবে ফিরবো, তাই তো ? স্ট্রোকটায় যদি মারা যেতাম, তখন কি

হতো ?' ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করলেন বস। 'সবারই বোঝা উচিত যে একজন মানুষ চিরকাল বেঁচে থাকে না। অনেক তো গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়িয়েছো, এবার একটু একটু করে দায়িত্ব নিতেও শেখো।' লং ডিসট্যান্সে প্রচুর বিল উঠছে, সেদিকে কোনো খেয়াল নেই বুড়োর, ভাবলো রানা। ঝাড়া দুই মিনিট পর থামলেন তিনি। শেষ কথাগুলো ছিলো, 'ট্রেনিং ক্যাম্প থেকে সোজা দেশে ফিরবে তুমি। তোমার স্থিতি দরকার। সমস্ত ব্যাপারে আমাকে অনুকরণ করতে হবে না তোমার বিয়ে করা দরকার। অবিবাহিত কাউকে দায়িত্ব দিয়ে বিদায় নেয়ার ইচ্ছে আমার নেই।'

বোবা হয়ে গেছে রানা।

'লাইনে আছো ?'

'জী, স্যার।'

'সাবধানে থাকবে, শরীরের দিকে লক্ষ্য রেখো,' বলে লাইন কেটে দিলেন তিনি।

ভিজে চোখ নিয়ে ফোন বুদ থেকে বেরিয়ে এলো রানা। কেন যেন বিষাদে ছেয়ে গেছে মন। বুড়ো মানুষটার অনেক কিছুই বদলায়নি, কিন্তু সব কিছুই আগের মতো আছে তা বলা চলে না। কথায় কথায় আজকাল বিদায়ের প্রসঙ্গ তোলেন। কারণে অকারণে শিশুর মতো রেগে যান, অভিমান করেন। তবে ওর প্রতি দরদ, স্নেহ, আর ভালোবাসা আগের মতোই আছে। অদ্ভুত এই মানুষটা একদিন সত্যি সত্যি থাকবেন না, কথাটা ভাবতেই কেমন যেন অবিশ্বাস্য লাগে। ভাবতে গেলে গলার কাছে কি যেন একটা আটকে গিয়ে ভারি কষ্ট হয়। ভিজে আসে চোখ।

[সমাপ্ত]

আলোচনা

মোঃ রকিবুল আলম

৪ নং এস, ও ফ্ল্যাট, আদমজী, নারায়ণগঞ্জ।

আপনি এবং আপনার ছোট ভাই (কাজি মাহবুব হোসেন)-এর লেখা কোন বই আপনার আব্বা ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন পড়েছেন কি ? যদি না পড়ে থাকেন, তাহলে কেন পড়েন নি ?

শুনেছি, আপনার এবং আপনার ছোট ভাইয়ের বই লেখার ব্যাপারে আপনার বাবার অমত ছিল, এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি ?

"স্বর্ণসংকট" বইটা হুবহু নকল করার অপরাধে আপনার বিরুদ্ধে নাকি অভিযোগ করা হয়েছিল। কথাটা সত্য কি ?

* আমার লেখা অনেক বই-ই আমার আব্বা পড়েছেন, এবং দোষ-গুণ আলোচনা করে উৎসাহ দিয়েছেন। এমন কি একটি বইয়ের ভূমিকাও লিখে দিয়েছিলেন তিনি।···আমার ভাই যখন লিখতে শুরু করেন, তখন আব্বা প্রয়াত।···স্বর্ণসংকট সম্পর্কে যা শুনেছেন, মিথ্যা।

সৈয়দ ইমতিয়াজ আরেফিন

দিলালপুর, পাবনা।

সম্প্রতি পেপারে দেখলাম একটি মুভি সংস্থা মাসুদ রানা-২ (ভারত নাট্যম) অনুসারে একটি ছবি তৈরী করতে যাচ্ছেন। এ-ব্যাপারে আমার প্রথম অনুরোধ ছবি তৈরীর ব্যাপারে আপনি

অনুমতি দিবেন না। দিয়ে থাকলে তাহলে দয়া করে শর্ত দিয়ে দিন মাসুদ রানার শারীরিক ও চারিত্রিক সকল বৈশিষ্ট্য সহ তাকে চিত্রায়িত করতে হবে এবং ঘটনাটি যতখানি সম্ভব বইয়ের সাথে মিল রেখে চিত্রায়িত করতে হবে।

* মাসুদ রানা-২ বলতে এখানে 'ভারত নাট্যম' বোঝানো হয়নি—সিনেমার দ্বিতীয় মাসুদ রানা হিসেবেই ২ লেখা হয়েছে। ...আমার শর্ত দেয়া আছে, সিনেমার স্ক্রিপ্ট আমাকে আগে দেখাতে হবে—প্রযোজক শেষ পর্যন্ত কি করেন দেখা যাক।...ছবির প্রয়োজনে অনেক সময় কাহিনী বেশ অনেকখানি পরিবর্তন করতে হয়, এটা মেনে নিতে হবে।

শামীম কবীর

গ্রাম—টাইলা, পোঃ রজনীগঞ্জ, জিঃ সুনামগঞ্জ।

আমাদের একান্ত অনুরোধ স্পর্ধা, অপহরণ, বিপর্যয়-এর মত দুর্বল ও অবাস্তব বই লিখে আমাদেরকে বিরক্ত ও হতাশ না করে ভারত নাট্যম, রক্তের রং, সংকেতের মত সুন্দর, গতিময় ও বাস্তব-ধর্মী বই লিখে আমাদেরকে কৃতার্থ করুন।

* আমার সীমিত ক্ষমতা নিয়ে সাধ্যমতো চেষ্টা করছি, ভাই। দোষ-ত্রুটি নিজ গুণে ক্ষমা করে দেবেন।

আবদুল মোহাইমেন পল্লব

সেবা পাঠক সমিতি, সরিষাবাড়ী টাউন, জামালপুর-২০৫০

আমরা এখানে 'সেবা পাঠক সমিতি' গড়ে তুলেছি। আমাদের সমিতির নিয়ম হলো, আমরা প্রত্যেক সদস্য মাসে ১০ টাকা করে চাঁদা দেব। চাঁদার টাকা আপনার সেবা প্রকাশনীতে পাঠানো হবে এবং নতুন বই বের হওয়ার সাথে সাথে আপনি তা পাঠাবেন। বই

আসার পর প্রত্যেক সদস্য সেটা ক্রমান্বয়ে পড়বে এবং পরে তা সমিতির পাঠাগারে সংগৃহীত হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে সমিতির সদস্য সংখ্যা ১০। আজ মানি-অর্ডার যোগে ১০০ (একশত টাকা) পাঠালাম। ডিসেম্বর মাসে যে বইগুলো বের হয়েছে সেগুলো পাঠাবেন এবং এর পর থেকে নতুন বই বের হবার সাথে সাথে আমাদের ঠিকানায় পাঠাবেন (রহস্যপত্রিকা সহ)। অর্থাৎ 'সেবা পাঠক সমিতি, সরিষাবাড়ী' সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হলো। প্রতি বই-এ ভালো কমিশন দিলে খুশী হ'ব। কারণ আমরা সবাই ছাত্র (বয়স সীমা সর্বোচ্চ-১৮ বৎসর)। টাকা যোগাড় করতে খুব বেগ পেতে হয়। তাই একটু আমাদের দিকে নজর দেবেন। টাকা শেষ হলে আমাদের জানালে আমরা ১০০ টাকা করে পাঠাব। আমাদের এই 'সেবা পাঠক সমিতি'র ব্যাপারে আপনার সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি।

* নিশ্চয়ই সহযোগিতা করবো। সেলস্ ম্যানেজার সাহেবকে সর্বোচ্চ কমিশন দেয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিলাম।

রাজীবুস সামস্ পিজুস
চাটমহর ডিগ্রী কলেজ, পাবনা।

পিশাচ কাহিনী আমার কাছে খুব সুন্দর লাগে। এজন্য রানার পিশাচ দ্বীপ অনেক বার পড়েছি। এখনও একবার করে মাঝেমধ্যে রিভিশান দিচ্ছি।

শিক্‌দার এখনও পৃথিবীতে চলাফেরা করছে। আনুন না ওকে নামিয়ে রা-১৫৫-এ অথবা এর আগে বা পরে।

* ভাল পিশাচ কাহিনী পেলে শিক্‌দারকে ফেরত্‌ আনার ইচ্ছে আমারও আছে।

সুলতানা, চুমকি

৯২/এন. এস. রোড, থানা পাড়া, কুষ্টিয়া।

আমি অষ্টম শ্রেণীর একজন ছাত্রী, ছোটখাট গল্প লেখি। আপনার রহস্য পত্রিকাতে স্থান পাবে কিনা জানি না। একটু যাচাই করে দেখবেন কি? যদি দেখতে চান তবে পাঠাব, আপনার অনুমতি পেলে।

* নিশ্চয়ই। পাঠিয়ে দাও। তবে একটা অনুলিপি নিজের কাছে রেখে পাঠিও। পাণ্ডুলিপি ফেরত পাবে না।

লিটন

৫/জে. পলোগ্রাউণ্ড কলোনি, চট্টগ্রাম।

এস. এম. শফি পরিচালিত কাজী আনোয়ার হোসেনের মাসুদ রানা সিরিজ থেকে নেওয়া ছায়াছবি "মাসুদ রানা-২ এর বিজ্ঞাপন দেখলাম ২রা জানুয়ারীর ইত্তেফাকে। কাহিনীটি রানার কোন্ বই থেকে নেওয়া হয়েছে জানাবেন কি?

* বিষ নিঃশ্বাস।

মাসুদ রানা-১৫০

দুইখণ্ডে সমাপ্ত স্পাই-থ্রিলার

শান্তিদুত-২

কাজী আনোয়ার হোসেন

খুন হতে গিয়ে কোনমতে বেঁচে গেল রানা।
কিভাবে যেন বারবার
ওর ঠিকানা পেয়ে যাচ্ছে শত্রুপক্ষ।

শেষমেষ সন্ধান পাওয়া গেল
নিকোলাই ডালচিমস্কির। জানা গেল
কোথায় আঘাত হানবে সে এবার।

ফাঁদ পেতে অপেক্ষা করছে রানা।
কিন্তু ওর জন্যেও ফাঁদ পেতে
অপেক্ষা করছে শত্রুপক্ষের একজন।
দেখা যাক কি হয়।

সেবা প্রকাশনী

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রূম ঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

বিশ টাকা